জার্নালিস্টের জার্নাল

নিমাই ভট্টাচার্য

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
সুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯ ২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

পরম শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়'কে

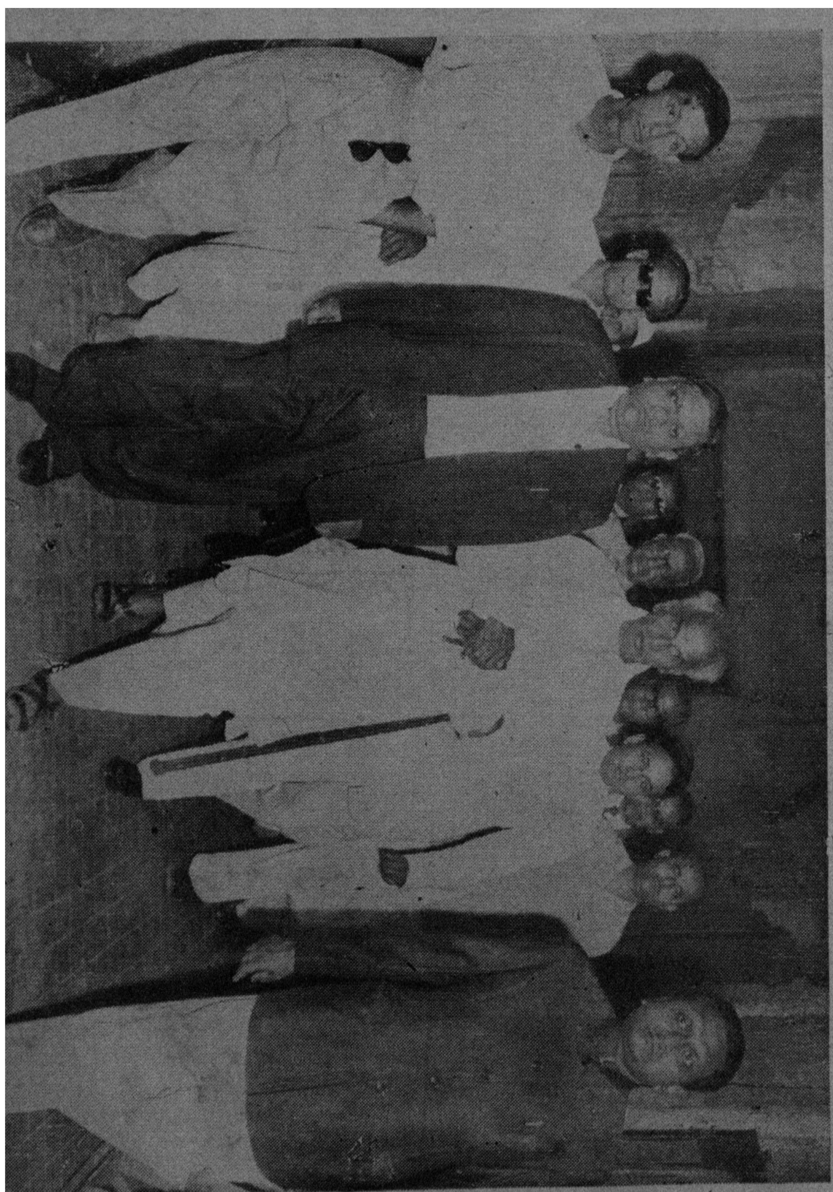
এই লেখকের অন্যান্য বই

মেমসাহেব
রাজধানীর নেপথ্যে
ভি-আই-পি
রিপোর্টার
পার্লামেন্ট স্ট্রীট
উইং কমাণ্ডার
যৌবন নিকুঞ্জে
তোমাকে
অনুরোধের আসর
হকার্স কর্ণার
ডিপ্লোম্যাট
এ-ডি-সি
ডিফেন্স কলোনী
প্রবেশ নিষেধ
গোধূলিয়া
লাস্ট কাউণ্টার
কেরানী
ব্যাচেলার
শেষ পারানির কড়ি
রাজধানী এক্সপ্রেস
নাচনী
ভায়া ডালহৌসী
কেয়ার অব ইণ্ডিয়ান এম্বাসী
সেলিম চিস্তি
রিটায়ার্ড
মনে মনে
বন্যা
প্রিয়বরেষু
শ্রেষ্ঠ গল্প
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান
অ্যালবাম
আকাশভরা সূর্য তারা
সোনালী
মোগলসরাই জংশন
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
ভালোবাসা
পেন ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড ক্লাশ ফ্রেণ্ড
ওয়ান আপ-টু ডাউন
ইওর অনার
পিকাডিলী সার্কাস
ককটেল
ডার্লিং
রবিবার
সাব-ইন্সপেক্টর
নিমন্ত্রণ
ম্যাডাম
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র
ইনকিলাব
বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত
ইমন কল্যাণ
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার
অন্যদিন
চিড়িয়াখানা
পথের শেষে
ভদ্দরলোক

কপিরাইট—শ্রীঅতীশ ভট্টাচার্য

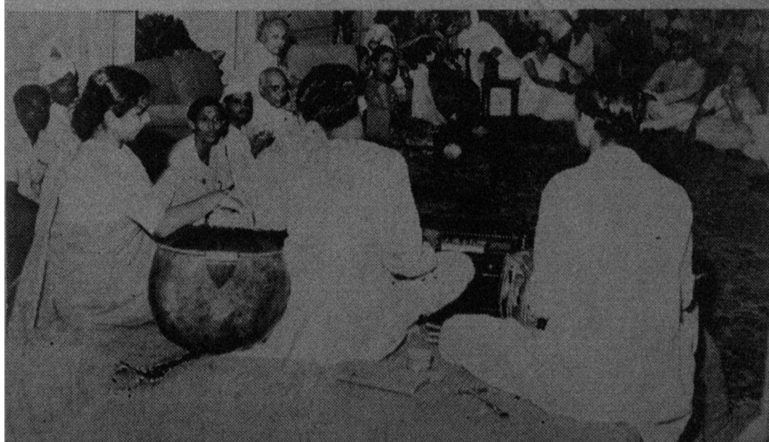
রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের সঙ্গে আমন্ত্রিতদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন লেখক।

দেশরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেনন, অভিনেত্রী মঞ্জু দে ও লেখক।





প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর (বাঁ দিক থেকে) লেখক, বিমলভূষণ, নেহরু, দীপ্তি ও সুবোধ ব্যানার্জী।



প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বিমলভূষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করছেন। সামনে বসে আছেন লেখক, শাস্ত্রীজি, নেহরু ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

রাষ্ট্রপতি ভবন ঃ লেখক, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্য একজন।



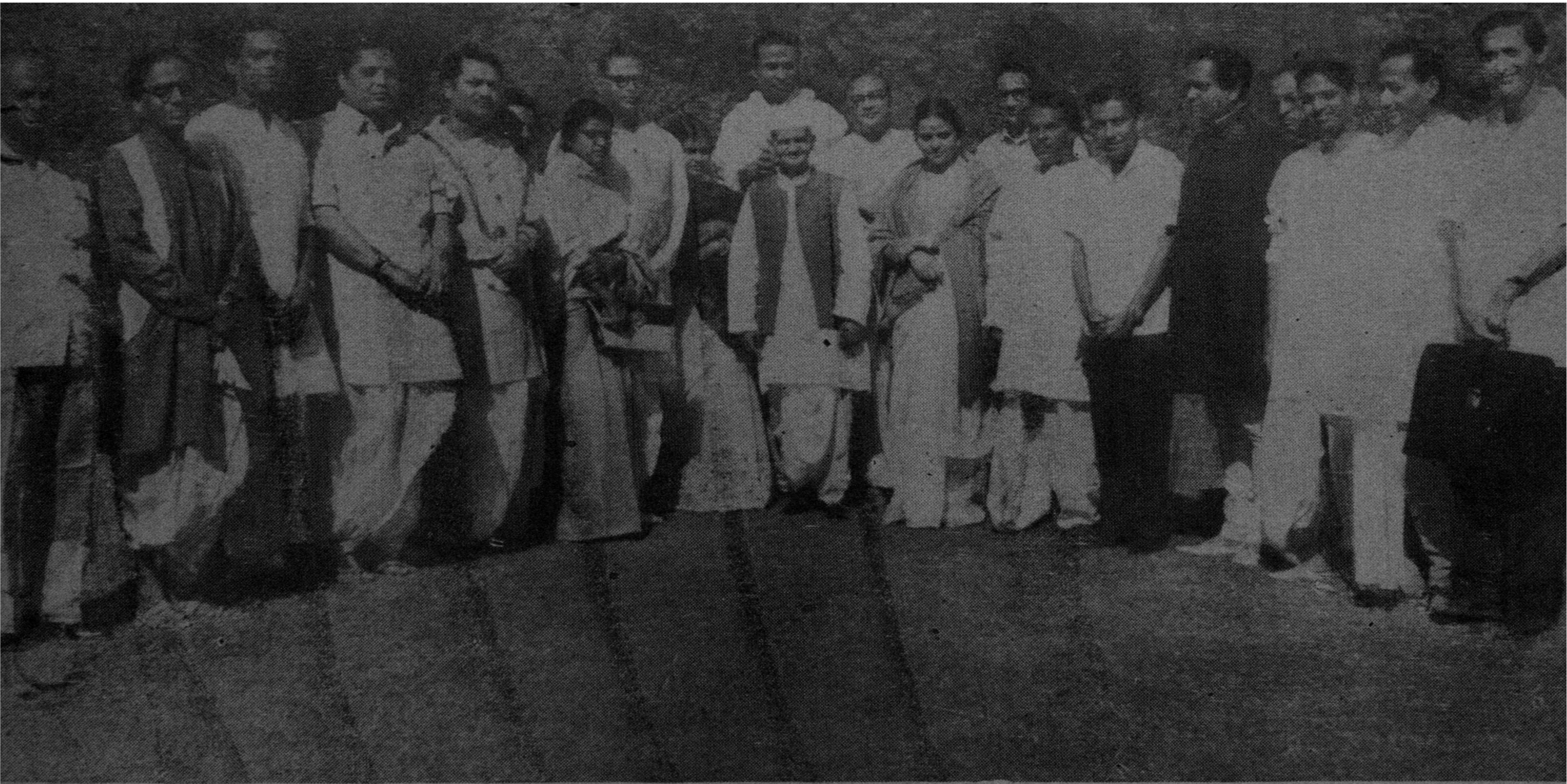
র জংপুরার বাঙ্গালী বাসিন্দাদের এক অনুষ্ঠানে মোরারজী দেশাই বক্তৃতা করছেন। তাঁর ডানদিকে লেখক ও সুবোধদা।



সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চভের সঙ্গে



ভারত সফরশেষে স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে দমদম বিমানবন্দরে কলকাতার রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের
সঙ্গে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও উপপ্রধানমন্ত্রী মার্শাল হো লুঙ।
প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আছেন লেখক।



প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বাংলা সঙ্গীত সম্মেলনের শিল্পীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজি। বাঁ দিক থেকে কালীবাবু, বিমলভূষণ, ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, শাস্ত্রীজি, পিছনে দ্বিজেন মুখার্জী, তরুণ ব্যানার্জী, ইলা বসু, রাধাকান্ত নন্দী, শ্যামল মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবিজয় ভগবতী ও সর্বদক্ষিণে লেখক।



দমদম বিমানবন্দর ঃ (বাঁ দিক থেকে) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না, উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে করমর্দনরত লেখক, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষচৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আছেন লেখক।

আমি কোন মহাপুরুষ নই যে আত্মজীবনী লিখব; যশস্বী বা কৃতি পুরুষদের মত স্মৃতিকথা লেখার অধিকারও আমার নেই। তবু সব মানুষের মতই জীবনের পথ চলতে চলতে কিছু দেখেছি, কিছু শুনেছি। কিছু কিছু উপলব্ধিও করেছি। অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছি। ছোটবেলায় শিয়ালদহ স্টেশনের আশেপাশের পেট মোটা কনস্টেবল দেখেই ঘাবড়ে যেতাম। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিতে না দিতেই খবরের কাগজের রিপোর্টার হলাম। রাইটার্স বিল্ডিংস—লালবাজার যাতায়াত তখন নিত্যকর্ম হল। মাঝে মাঝে রাজভবনে বা দমদম এয়ারপোর্টে বা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর দর্শনও জুটে যেত। তারপর হঠাৎ অনেক কিছু ঘটে গেল আমার জীবনে। যা কোন দিনই হবার কথা নয়, যা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি, তাই ঘটে গেল। একের পর এক। মাসের পর মাস বছরের পর বছর।

মাঝে মাঝে সেই সব ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে অনেক স্মৃতি, অনেক কাহিনী। কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, সেই সব টুকরো টুকরো স্মৃতি আর কাহিনী নিয়েই আমার 'জার্ণালিস্টের জার্ণাল'।

আমি তখন কলকাতার এক অখ্যাত দৈনিকে পনেরো—বিশ টাকা মাইনের রিপোর্টার। তা হোক। সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে আমার অদম্য উৎসাহ। নিত্যই রাইটার্সে কিছু মন্ত্রীর ঘরে হানা দিই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কলকাতায় এলেও তাদের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করি।

সে সময় 'উদ্বাস্তু সমস্যা' ছিল কলকাতার সংবাদপত্রগুলোর অন্যতম প্রধান খোরাক। তাই তো নেহরু মন্ত্রীসভার আইন ও

সংখ্যালঘু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস কলকাতায় এলেই অনেক রিপোর্টারই ওঁর কাছ থেকে কিছু সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠতেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু দপ্তরের একটা অফিসও ছিল কলকাতায়। তাই চারুবাবুকে প্রায়ই আসতে হত কলকাতায়।

সেবার অন্য কোন রিপোর্টার পৌঁছবার আগেই আমি চারুবাবুর কলকাতার বাড়িতে হাজির। খবরের কথা বলতেই উনি চমকে উঠলেন, না না, কিচ্ছু খবর দিতে পারব না।

সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন ?

উনি বললেন, আই এ্যাম আণ্ডার ওথ। আই কাণ্ট ডিসক্লোজ এনিথিং।

আমি ওঁর কথা শুনে অবাক। কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি মাননীয় সি. সি. বিশ্বাসের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, অন্যান্য মন্ত্রীরা মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিলেও তো রিপোর্টারদের খবর দেন।

জাস্টিস বিশ্বাস আবার বললেন, নো নো, আই এ্যাম আণ্ডার ওথ। আই কাণ্ট ডিসক্লোজ এনিথিং।

আমি বার বার ওঁকে অনুরোধ করলাম এবং প্রতিবারই উনি এক জবাব দেন, সরি, আই এ্যাম আণ্ডার ওথ। আমি কোন খবর ফাঁস করতে পারব না।

আমি খবর পাবার আশায় প্রায় জলাঞ্জলি দিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ উনি ওঁর পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্টকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি কালকের ডায়েরীর নোট দিয়েছি ?

পি. এ. বললেন, না স্যার।

জাস্টিস বিশ্বাস বললেন, নোট ডাউন।

পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সর্টহ্যাণ্ড নোটবই-পেন্সিল নিয়েই ঘরে এসেছিলেন। উনি আমার পাশের চেয়ারে বসতেই জাস্টিস বিশ্বাস

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে বলতে শুরু করলেন—আমি যথারীতি ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠি এবং বেড়াতেও গিয়েছিলাম। বাংলোয় ফিরে এসেই শুনি, মাননীয় ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার সর্দার প্যাটেল আমাকে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন। আমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সর্দার প্যাটেলের বাড়ি রওনা হলাম।...

জাস্টিস বিশ্বাস চোখ বুজে তাঁর আগের দিনের সবকিছু ঘটনা বলছেন। পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট এক মনে সর্টহ্যাণ্ডে নোট নিচ্ছেন। আর আমি? শুনছি আর মনে মনে হাসছি।

...সর্দার প্যাটেল আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের ক্যাবিনেটে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুন করে উদ্বাস্তু আগমন নিয়ে যে আলোচনা হবে, তার জন্য কোন নোট তৈরি করেছি কি? আমি মাননীয় ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারকে জানালাম, ড্রাফট তৈরি হয়েছে এবং এখনই বাড়ি গিয়ে ওটাকে ফাইন্যাল করব। ঐ ড্রাফট নোটস সম্পর্কে দু-চারটে প্রশ্ন করার পর সর্দার প্যাটেল বললেন, ঐটি ফাইন্যাল করে আমার কাছে নিয়ে আসুন।..

তারপর?

জাস্টিস বিশ্বাস বললেন, সর্দার প্যাটেল আমার তৈরি নোটটি পড়েই বললেন, না, এটা ঠিক হয়নি। তারপর উনি নিজেই পি. এ-কে ডেকে একটা নতুন নোট ডিক্টেট করলেন। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে পি. এ. ঐ নোটটি টাইপ করে আনতেই সর্দার প্যাটেলের নির্দেশ মত আমি তার নীচে সই করলাম। তারপর সর্দার প্যাটেল আমাকে বললেন, আমি যে এই নোট তৈরি করেছি, তা যেন ক্যাবিনেটের কেউ না জানেন।...

আমি জাস্টিস বিশ্বাসের কথা শুনতে শুনতে মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলেও পাথরের মত চুপ করে বসে আছি।

....ক্যাবিনেট মিটিং-এ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার নতুন করে হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসার প্রসঙ্গ উঠতেই আমি আমার নোটটি বের করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্দার প্যাটেল ঐটি আমার কাছ থেকে নিয়ে

সবাইকে পড়ে শোনালেন। অন্য কেউ কিছু বলার আগেই মাননীয় ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার মন্তব্য করলেন, জাস্টিস বিশ্বাসের নোটটিতে বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের-মনোভাব বেশ পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে। সুতরাং এই নোটের ভিত্তিতেই অবিলম্বে পাকিস্তান সরকারের কাছে একটা প্রতিবাদ-পত্র পাঠানো যেতে পারে। সামান্য আলোচনার পরই ক্যাবিনেট সর্দার প্যাটেলের প্রস্তাব মেনে নিলেন।...

চারুবাবু সারাদিনের সব ঘটনা বলতেই পি. এ. পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আমি ন্যাকামী করে বললাম, আমাকে যদি কিছু বলতেন তাহলে ··

আমাকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়েই চারুচন্দ্র বিশ্বাস আবার বললেন, আই এ্যাম আণ্ডার ওথ। আমি কিচ্ছু বলতে পারব না।

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে বললাম, তাহলে আমি যাই।

হ্যাঁ এসো।

আমি নমস্কার করে ওঁর ঘর থেকে বেরুতেই হেসে ফেললাম।

* * *

খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। আমিও হয়েছি কিন্তু নিঃসন্দেহে স্বীকার করব, অনেক ঘটনাই ভুলে গেছি। তবু কিছু মনে আছে। এই প্রসঙ্গে মাস্টার তারা সিং-এর কথা মনে পড়ছে।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী এটলি ঘোষণা করলেন, পনেরো মাসের মধ্যে (জুন, ১৯৪৮) ভারত-বর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবেই। লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে পৌঁছলেন ২২শে মার্চ। শপথ নিলেন ২৪শে মার্চ। মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে পৌঁছবার তিয়াত্তর দিনের মধ্যেই ঘোষণা করলেন, ভারত দ্বিখণ্ডিত হবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লান্ত ও বৃদ্ধ সেনাপতিরা

জীবনের শেষ অধ্যায়ে দিল্লীর তখ্‌ৎ-এ-তাউস দখলের নেশায় এমনই মশগুল হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁরাও ভারত দ্বিখণ্ডিকরণের প্রস্তাব মেনে নিলেন। মাউন্টব্যাটেনের এই সর্বনাশা ঘোষণার ঠিক বাহাত্তর দিন পরে ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হল।

মাউন্টব্যাটেনের এই তাড়াহুড়োর জন্যই র‍্যাডক্লিফ সাহেব কোন মতে কেটেকুটে দু' টুকরো করলেন পাঞ্জাব আর বাংলাকে। দেশ স্বাধীন হবার কয়েক বছরের মধ্যেই দাবী উঠল, পাঞ্জাবী সুবা চাই। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় এই দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বার বার বললেন, ঐ এক টুকরো রাজ্যকে আবার দু' টুকরো করার কোন যুক্তি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব যত কঠোর হয়েছে, মাস্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবী সুবার দাবীও তত তীব্র হয়েছে।

১৯৬০ সালের শেষের দিকে মাস্টার তারা সিং পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতির পটভূমিকায় শুরু হল ভবনগর কংগ্রেস অধিবেশন।

কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনের কথা। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর অপরাহ্ন-কালীন অধিবেশন শুরু হবার কয়েক মিনিট বাকি। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ভবনগরের মহারাজার রোল্‌স রয়েস এসে থামল। আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। সঙ্গে তাঁর পার্সোন্যাল সেক্রেটারি জানকীবাবু। আমাকে দেখেই পন্থজী জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি করছ?

হেসে বললাম, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

এবার পন্থজী একটু হেসে বললেন, ওদিকে যে অনেক কিছু ঘটে গেল।....

তার মানে?

পন্থজী একটু চাপা গলায় বললেন, প্রাইম মিনিস্টারের কাছে মাস্টার তারা সিং এসেছেন।

খবরটা শুনেই আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করলাম, মাস্টার তারা সিং কখন এলেন?

পন্থজী আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি যাও; তা নয়তো দেখা হবে না।

পন্থজী আর দাঁড়ালেন না। অধিবেশনে যোগ দিতে ভিতরে চলে গেলেন।

জানকীবাবুকে প্রশ্ন করতেই জানতে পারলাম, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনুরোধেই মাস্টারজী এসেছেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক বিশেষ বিমানে। বিমানটি ভবনগর এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে এবং মাস্টারজীকে নিয়ে বিমানটি একটু পরেই দিল্লী রওনা হবে।

এ তো দারুণ খবর! হেডলাইন স্টোরি!

জানকীবাবুর সাহায্যে কংগ্রেসের একটা জীপ পেলাম। জীপ স্টার্ট দিতেই হঠাৎ কোথা থেকে এসে লাফ দিয়ে উঠল হিন্দুস্তান টাইমস্-এর বিশেষ সংবাদদাতা সুদর্শন ভাটিয়া।

বিরাট এলাকা নিয়ে ভবনগরের রাজপ্রাসাদ। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি, চারপাশে অজস্র গাছপালা। কোথাও বা সুন্দর ফুলের বাগান, সবুজ মাঠ। অনেকগুলি ছোট-বড় প্রাসাদ। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর যখন আসল রাজপ্রাসাদের সামনে হাজির, তখন দেখি নেহরু মাস্টার তারা সিংকে বিদায় জানাতে বেরিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে আমরা দুজনে হাজির। অবিলম্বে কংগ্রেস অধিবেশনে যেতে হবে বলে নেহরু মাস্টারজীকে বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই চলে গেলেন কিন্তু যাবার আগে আমাদের দুজনকে দেখিয়ে ঠাট্টা করে বললেন, নাউ দে উইল লুক আফটার ইউ।

বৃদ্ধ ক্লান্ত মাস্টারজী একটা চেয়ারে বসলেন; পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন ওঁর সঙ্গী এক উকিলবাবু। আমি আর সুদর্শন ভাটিয়া প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করলাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কি কথা হল? অনশন

কি করবেন? নাকি…

মাস্টার তারা সিং বললেন, নেই বেটা, এখানে কিছু বলব না।….

উকিলবাবু বললেন, পালাম এয়ারপোর্টে ফরেন করসপণ্ডেণ্ট আর টি. ভি. ক্যামেরাম্যানরা অপেক্ষা করছে। যা বলার তা ওখানেই বলা হবে।

ভাটিয়া হঠাৎ মেঝেতে বসেই মাস্টারজীর পা টিপতে শুরু করল। ওই ইশারায় আমিও মাস্টারজীর পিঠ-ঘাড়-হাত টিপতে শুরু করলাম। মাস্টারজী চোখ বুজে আমাদের সেবা উপভোগ করছেন। ওদিকে সিকিউরিটির লোকজন মাস্টারজীকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ি আনতে গেছে। হাতে সময় অত্যন্ত কম। মাঝে মাঝে মাস্টারজী বলছেন, এদিকটা-ওদিকটা টিপে দাও।

এরই মধ্যে আমার আর ভাটিয়ার সকাতর প্রার্থনা, মাস্টারজী, শুধু বলুন কি কি বিষয়ে কথা হল? প্রাইম মিনিস্টারকে দেখে মনে হল, আপনার সঙ্গে কথা বলে উনি খুব খুশি। আপনিও কি খুশি?

উকিলবাবু বলেন, না না, এখানে কিছু বলা হবে না। মাস্টারজী উইল মেক এ স্টেটমেণ্ট ওনলি অন এ্যারাইভ্যাল এ্যাট পালাম।

ভাটিয়া মাস্টারজীর পদসেবা করতে করতেই আবার আবেদন জানায়, সব কথা তো জানতে চাইছি না! শুধু বলুন, প্রাইম মিনিস্টারের মনোভাব কেমন দেখলেন?

আমিও মাস্টারজীর সেবা করতে করতে কিঞ্চিৎ তৈলমর্দন করলাম কিন্তু উকিলবাবু ফোঁস করে উঠলেন, নো নো, উই কাণ্ট সে এনিথিং হিয়ার।

বোধহয় আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে হঠাৎ মাস্টারজী বললেন, ভকিলসাব, আমি পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথা বলে যে স্টেটমেণ্ট তৈরি করেছি, তার দুটো কপি এদের দিন।

উকিলবাবু টুঁ শব্দটি না করে আমাদের হাতে বিবৃতির দুটি কপি দিতেই আমরা মাস্টারজীকে ধন্যবাদ দিয়েই এক দৌড়।

সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনে সময় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

যে সাংবাদিক যত আগে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করতে পারেন, তার কৃতিত্ব তত বেশি। সেদিন আমি আর সুদর্শন ভাটিয়া প্রধানমন্ত্রী ও মাস্টার তারা সিং-এর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার খবর দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছবার ঘণ্টা চারেক আগে সংগ্রহ করে সত্যি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলাম।

* * *

এই সংবাদ সংগ্রহের কাহিনী লিখতে লিখতে আরো একটা কাহিনী মনে পড়ল। ১৯৫৯—১৯৬০। শান্ত স্নিগ্ধ হিমালয়ের এখানে-ওখানে কখনও কখনও বারুদের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই আর শোনা যাচ্ছে না। ছোটখাট ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পার্লামেন্টে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আকশাই-চিন এলাকায় চীনের রাস্তা তৈরি ও নেহরুর বিখ্যাত উক্তি 'নট এ ব্লেড অফ গ্রাস গ্রোজ দেয়ার' নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই।

এরই পটভূমিকায় লোকসভা-রাজ্যসভায় নিত্যই প্রশ্নোত্তর। বাদ-প্রতিবাদ। বিরোধীদের খুশি করার জন্য নেহরু বার বার ঘোষণা করছেন, না না, চীনের সঙ্গে কোন আলোচনা নয়।

সেদিন সকালেও লোকসভায় নেহরু বললেন, না, চীনের সঙ্গে কোন আলোচনার কথা আমরা ভাবছি না। পার্লামেন্টের খবর পার্লামেন্ট হাউস পোস্ট অফিস থেকে টেলিগ্রাম করে আমার সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দেবার পর সেন্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় চলে গেলাম। তারপর বিকেলের দিকে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম সাউথ ব্লকে দেশরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের কাছে। কফি খেতে খেতে আমরা কথা বলছিলাম। হঠাৎ মেনন হাসতে হাসতে বললেন, আমার এখানে আড্ডা দিয়ে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট না করে প্রাইম-মিনিস্টারের অফিসের ওদিকে গিয়ে ভাল খবর জোগাড় করার চেষ্টা কর।

পার্লামেন্টে অভূতপূর্ব উত্তেজনার পর কৃষ্ণ মেননকে ঐভাবে হাসতে ও ঠাট্টা করতে দেখে খটকা লাগল। সন্দেহ হল, তবে কি সত্যি কিছু ঘটতে চলেছে ?

আমি উঠে পড়লাম। মাঝখানের করিডর দিয়ে পশ্চিমের দিকে এগুতে এগুতে নানা কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, কি ঘটতে পারে? কি ঘটা সম্ভব? এমন কি ঘটতে চলেছে যা বর্তমান পরিস্থিতিতেও মেননকে খুশি করতে পারে? সীমান্ত-বিরোধ নিয়ে কিছু ঘটছে নাকি ?

সাউথ ব্লকের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছতেই দেখি, ফরেন সেক্রেটারি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দু-তিনজন জয়েণ্ট সেক্রেটারি নেহরুর ঘরে বারবার যাতায়াত করছেন। সবাই ব্যস্ত-ত্রস্ত ভাবে ছোটাছুটি করলেও কারুর মুখেই কোন উৎকণ্ঠার ছাপ দেখলাম না। তবে কি এমন কিছু ঘটল যার জন্য সবাই খুশি ?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেহরু হাসি মুখে ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়েও ওঁরা দু-এক মিনিট কথা বললেন। ফরেন সেক্রেটারি দু-একটা ফাইল হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে নিজের ঘরের দিকে এগুলেন। নেহরু নিচে নামার জন্য দু-এক পা এগুতেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তুমি এখানে কেন ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, শুনলাম খুব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবার সম্ভাবনা আছে তাই চলে এলাম।

নেহরু লিফট-এর পরিবর্তে সিঁড়ি দিয়েই নিচে নামতে নামতে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কে বললেন ?

সংবাদের সূত্র কি প্রকাশ করা উচিত ?

দ্যাট্‌স রাইট।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারও নিচে নামছিলেন। হাতে বিশেষ সময় ছিল না। তাই আমি আর সময় নষ্ট না করে বললাম, আজ আপনি এত খুশি কেন?

নেহরু পাশ ফিরে অফিসারদের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ আমাকে খুশি দেখাচ্ছে নাকি ?

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নে অফিসাররা শুধু হাসেন।

সিঁড়ির প্রায় নিচের ধাপে পৌঁছেছি। দু-চার পা এগিয়েই গাড়ির সামনে পৌঁছবেন। আমি আবার প্রশ্ন করি, নিশ্চয়ই কোন ভাল খবর পেয়েছেন ?

পেয়েছি বৈকি।

কি সেই ভাল খবর ?

তোমাকে বলব কেন ?

আপনার ভাল খবর মানে তো সারা দেশের ভাল খবর।

তারপর নেহরু গাড়ির মধ্যে ঢোকার আগে শুধু বললেন, হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু আসছেন বলে আমি খুশি।

কে সেই বন্ধু ?

নেহরু আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে ড্রাইভারকে বললেন, গাড়ি চালাও।

কৃষ্ণ মেননের ইঙ্গিত আর নেহরুর কথা শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এমন কেউ আসছেন, যাঁর আগমনের ফলে হয়তো কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হতে পারে। নেহরু চলে গেলেও আমি সাউথ ব্লক ছেড়ে এলাম না। আবার ওপরে উঠলাম। ভাবলাম, আবার কৃষ্ণ মেননের কাছে যাই। দোতলায় উঠতেই চায়না ডেস্কের ইন-চার্জ জয়েন্ট সেক্রেটারি আর চীফ অব প্রটোকলকে একসঙ্গে ফরেন সেক্রেটারির ঘরে ঢুকতে দেখেই হঠাৎ আমার মনে হল, তবে কি চীন থেকেই কেউ আসছেন ? নেহরু যে বন্ধুর কথা বললেন, তিনি কী চীনের প্রধানমন্ত্রী ?

ঢুকলাম আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী জয়েন্ট সেক্রেটারির ঘরে। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা, তাহলে চৌ-এন-লাই আসছেন ?

উনি অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি করে জানলে ?

কি করে জানলাম, তা আর বলে লাভ কি ? তবে চৌ-এন-লাই-

এর সফর সফল না হলে কি হবে ?

লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট !

আচ্ছা চলি দাদা।

আমি পাগলের মত ছুটে গেলাম সি-টি-ও-র প্রেস রুমে। সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করতে শুরু করলাম, চাইনীজ প্রিমিয়ার চৌ-এন-লাই ইজ সর্টলি কামিং টু ইণ্ডিয়া টু হ্যাভ টক্‌স উইথ প্রিমিয়ার নেহরু····

জাপানের Kyodo নিউজ এজেন্সীর বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ শিমীজু পাশের টেবিলে টাইপ করছিলেন। প্রেস রুমে আর কেউ ছিলেন না। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াত আর ইউ তাইপিং ?

আমি হেসে বললাম, দেখে যাও।

মিঃ শিমীজু টাইপরাইটারে আমার কপি দেখেই লাফ দিয়ে উঠলেন, নো নো, নট পস্‌সিবুল। এ হতেই পারে না, অসম্ভব। আজও পার্লামেণ্টে নেহরু বলেছেন, নো তক্‌স উইথ চায়না আর তুমি····

আমি মৃদু হেসে বললাম, আমার খবর ঠিক। তুমি ইচ্ছা করলে এই খবর পাঠাতে পারো ; তবে আর কাউকে বলবে না।

নো নো, আই কান্ত। এ খবর আমি পাঠাব না।

পরের দিন দুপুরে মিঃ শিমীজু জিজ্ঞাসা করল, তোমার খবর বেরিয়েছে ?

হ্যাঁ।

দু' একদিন পর ও আমাকে বলল, আমি যদি তোমার কাগজকে কোট করে এই খবরটা পাঠাই, তাতে কি তোমার সম্পাদক আপত্তি করবেন ?

না।

তাহলে আমি খবরটা পাঠাচ্ছি।

পাঠাও কিন্তু আর কাউকে বোলো না।

নো নো, নেভার।

ঠিক তার পরের দিন লোকসভার কোশ্চেন আওয়ার শেষ হবার পরই স্পীকার অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার ঘোষণা করলেন, প্রাইম মিনিস্টার টু মেক এ স্টেটমেণ্ট। নেহরু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, আই এ্যাম গ্ল্যাড টু ইনফর্ম দ্য হাউস দ্যাট প্রিমিয়ার চু-এন-লাই হ্যাজ কাইণ্ডলি এ্যাকসেপ্টেড মাই ইনভিটেশন....

আমি প্রেস গ্যালারীর এক কোণায় বসে ছিলাম। নেহরুর তিন-চার লাইনের বিবৃতি শেষ হতেই মিঃ শিমীজু ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত আমার সারা মুখে চুমু খেলেন।

আসল ব্যাপার হল এই যে Kyodo'র টোকিও অফিস থেকে খবরটি প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশ্বের কয়েকটি রেডিও স্টেশন থেকেও এই সংবাদ বলা হয়। এইভাবে খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর নানা রাজধানীতে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। Kyodo'র খবর দিল্লী ও চীনের রাজধানীতে পৌঁছতেই দুটি সরকার ঠিক করেন, এই ব্যাপারে অবিলম্বে সরকারী ঘোষণা করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

এই চাঞ্চল্যকর খবরটি আগে দিতে পেরেছিলাম বলে সম্পাদক আমার মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

* * *

সে সময় আমি একই সঙ্গে বাংলা হিন্দী গুজরাতি ও মারাঠী দৈনিকের রাজনৈতিক সংবাদদাতার কাজ করতাম রাজধানী দিল্লীতে। তাই ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হত। পার্লামেণ্ট চললে তো কথাই নেই। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সারাটা দিনই পার্লামেণ্টে কাটাতাম। শুক্রবার সকালে প্রশ্নোত্তরের সময় না গেলেও 'জিরো আওয়ার'-এর সময় নিশ্চয়ই প্রেস গ্যালারীতে হাজির হতাম।

শুক্রবারে ঐ 'জিরো আওয়ার' শেষ হতে না হতেই পার্লামেণ্টে

উইক-এণ্ডের হাওয়া বইতে শুরু। শুক্রবার পার্লামেণ্টের অর্ধেক সময় বেসরকারী প্রস্তাব ও বিল নিয়ে আলোচনা হয় বলে অনেকেই সে সময় উপস্থিত থাকেন না।

ঐ শুক্রবার বিকেল থেকে রবিবার রাত্রি বা সোমবার সকাল পর্যন্ত অনেক মন্ত্রীই দিল্লীর বাইরে যান। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় আমি কোন না কোন ভি. আই. পি'র সঙ্গে এয়ার ফোর্সের স্পেশাল প্লেনে ঘুরতাম ভারতবর্ষের এখানে-ওখানে। এর ওপর বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনার সংবাদ সংগ্রহের জন্যও আমাকে প্রচুর ঘুরতে হত। দেশে ও বিদেশে।

প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই কোন সম্পাদককে কিছু না জানিয়েই কলকাতা চলে এলাম, কিন্তু লাভ হল না। দু'দিন পরেই আমাকে বোম্বে মেলে চড়তে হল রায়পুর কংগ্রেস অধিবেশন কভার করার জন্য। আগেই ঠিক করেছিলাম প্রকাশ্য অধিবেশনে নেতাদের বক্তৃতা শুনব না। তাই প্রকাশ্য অধিবেশনের দিনের নাগপুরের স্পেশ্যাল ট্রেনেই রিজার্ভেশন করলাম।

স্টেশনে এসে ভারী মজার কাণ্ড হল। আমি রিজার্ভেশন চার্ট দেখে নির্দিষ্ট ফোর-বার্থ কামরার একটা লোয়ার বার্থ দখল করলাম। একটু পরেই এস. কে. পাতিল, কে. ডি. মালব্য ও আরো কয়েকজন নেতা আমারই বগীর অন্যান্য কামরায় উঠলেন। ওদের কাছেই শুনলাম, এই বগীটি জি. টি. এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে; অর্থাৎ সোজা দিল্লী। খবরটায় সত্যি খুশি হলাম।

খানিকক্ষণ পরে লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক আমার কামরায় এসে বললেন, হাউ কুড ইউ বী হিয়ার? দিস কম্পার্টমেণ্ট ইজ রিজার্ভড্ ফর ইউনিয়ন প্ল্যানিং মিনিস্টার গুলজারীলাল নন্দা।

আমি একটু অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম, ভুল কামরায় উঠেছি নাকি? বললাম, জাস্ট এ মিনিট! আই উইল চেক আপ ওয়ান্স এগেন।

আমি তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে নেমে আবার রিজার্ভেশন চার্ট

দেখলাম। আমার টিকিটের নম্বরের সঙ্গে খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখলাম, না, ভুল করিনি। নির্দিষ্ট বগীর ঠিক কামরাতেই উঠেছি। আমি আমার কামরায় ফিরে এসে ভদ্রলোককে বললাম, এখানেই আমার রিজার্ভেশন।

উনি আমার কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, আমি রেলওয়ে অফিসারদের বলেছি, আপনাকে অন্য কোন বগীতে একটা বার্থ দিতে। এই ফোর-বার্থ কম্পার্টমেণ্টে নন্দাজী যাবেন।

আমি জানি, এই বগী ছাড়লে আমি সোজা দিল্লী যেতে পারব না এবং ক'দিন যে আমাকে নাগপুরে পড়ে থাকতে হবে, তার ঠিক নেই। তাই ভদ্রলোককে স্পষ্ট বললাম, হৈ-হুল্লোড় করে লাভ নেই। আমি এই বগীর এই কামরার এই বার্থে শুয়ে-বসেই দিল্লী যাব।

ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, হ্যাট কাণ্ট বী। এই বগীতে আর কোন ফোর-বার্থ কম্পার্টমেণ্ট খালি নেই; সুতরাং এইটাতেই নন্দাজী যাবেন।

আমি হেসে বললাম, আমি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বা কোন বেনিয়া না যে নন্দাজীর নাম শুনেই ভয়ে এই কামরা ছেড়ে পালিয়ে যাব। এখানে তিনটে বার্থ খালি আছে। ইচ্ছা করলে শুধু নন্দাজী কেন, আপনিও এই কামরায় যেতে পারেন।

আমার কথায় ভদ্রলোক আহত ব্যাঘ্রের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বললেন, সেনট্রাল মিনিস্টাররা সব সময় ফোর-বার্থ কম্পার্টমেণ্টে ট্রাভেল করেন।

আমি বললাম, নন্দাজী তো সরকারী কাজে এখানে আসেননি; এসেছেন কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে। তাই এই কামরায় আমি থাকলে তাঁর মত সোস্যালিস্টের জাত যাবে না।

এই চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পাশের কামরার দু'-চারজন সহযাত্রী ছাড়াও অনেক রেল কর্মমারী এগিয়ে এলেন। এই কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য কলকাতা থেকে সাউথ ইস্টার্ণ রেলের অনেক

বাঙালী কর্মচারী রায়পুর গিয়েছিলেন। তারা আমার অনমনীয় মনোভাব দেখে মহা খুশি। কয়েকজন রেলওয়ে অফিসারও আমাকে অনুরোধ-উপরোধ করলেন কিন্তু তাদের আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, নগদ টাকায় টিকিট কেটেছি। রিজার্ভেশন চার্ট দেখে বসেছি। সুতরাং কোন কারণেই এ কামরা ছাড়ছি না। তাছাড়া এ বগী ছাড়লে আমি সোজা দিল্লী যেতে পারব না।

শেষ পর্যন্ত নন্দাজী দুই বার্থের একটা কূপেতে গেলেন এবং আমার কামরায় নন্দাজীর তিনজন ব্যক্তিগত কর্মচারী এলেন। মজার কথা, যার সঙ্গে আমার এত তর্ক-বিতর্ক হল, তিনি অবাঙালী হলেও বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছেন এবং দিল্লী যাবার পথেই তার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল।

*　　　*　　　*

এই তর্ক-বিতর্কের ফলে আরো একটা সুফল হল। আমাদের বগীতেই এস. কে. পাতিল, কে. ডি. মালব্য ও আরো কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের দু-তিনজন মন্ত্রীও সফর করছিলেন। ঐ তর্ক-বিতর্কের ফলে আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এবং দীর্ঘ যাত্রাপথে আমিও তাঁদের বন্ধু হয়ে গেলাম। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী জানতে পারলাম।

কিছুদিন আগেই ভূপালের নবাব দেহত্যাগ করেছেন। নবাবের দুই বেগম। বড় বেগমের দুই মেয়ে। বড় মেয়ে পতৌদীর বেগম। ছোট মেয়ে পাকিস্তান চলে গেছেন। ভূপালের নবাবের বড় বেগম খুবই ধর্মপ্রাণা। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি উদাসীন। সারাদিনই মালা জপ করেন। ছোট বেগম ঠিক এর বিপরীত। ছোট বেগমের কোন সন্তান নেই কিন্তু বড় বেগমের ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষ অন্তরঙ্গ।

ভূপালের নবাবের মৃত্যুর পর পরই ভূপাল নবাবের গদী ও সেই

সঙ্গে রাজন্য ভাতার দাবীদার হলেন ওর দুই মেয়ে। পতৌদীর বেগম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে বললেন, আমি শুধু নবাবের বড় মেয়ে নই, ভারতীয় নাগরিকও। সুতরাং ভূপালের গদী ও রাজন্য ভাতা যেন কেন্দ্রীয় সরকার আমাকেই দেন।

করাচী থেকে উড়ে এলেন নবাবের ছোট কন্যা। পন্থজীর ব্যস্ততার জন্য ওকে ক'দিন অপেক্ষা করেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হল।—আমি নবাবের ছোট মেয়ে ঠিকই কিন্তু নবাব আমাকেই বেশী ভালবাসতেন এবং তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর যেন আমিই ভূপালের গদী পাই।

পন্থজী অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বললেন, ভূপালের গদী বা রাজন্য ভাতা তো আমরা কেউ নেব না, আপনাদেরই কোন বোনকে দেওয়া হবে। আপনার দাবী যে যুক্তিযুক্ত তার যদি প্রমাণ থাকে, তা আমাদের দেবেন। আমরা দুজনের দাবীই পরীক্ষা করে যাকে উপযুক্ত মনে করব তাকেই রাজন্য ভাতা ও ভূপালের গদী দেওয়া হবে।

স্বর্গত নবাবের ছোট মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পন্থজীর হাতে কিছু কাগজ-পত্র দিয়ে বললেন, এইসব চিঠি ও কাগজপত্র দেখলেই বুঝবেন, আমার দিদির চাইতে আমার দাবী অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত।

পন্থজী অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বললেন, আপনার আপত্তি না থাকলে কাগজপত্র রেখে যান। আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

এবার নবাব-নন্দিনী বললেন, আমি করাচী থেকে সোজা দিল্লী এসেছি। আপনি ব্যস্ত ছিলেন বলে এখানেই ক'দিন কেটে গেল। ভাবছিলাম, ক'দিনের জন্য ভূপাল যেতাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবেন বৈকি।

আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা করব?

ভূপাল থেকে একটা টেলিফোন করেই চলে আসবেন। ব্যস্ত না থাকলে যখনই আসবেন, তখনই দেখা করব।

নবাব-নন্দিনী ভূপাল চলে গেলেন।

ভূপালের বড় বেগম এ সব ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও ছোট

বেগমও ছুটে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থজীর কাছে। তিনি বড় বেগমের ছোট মেয়ের দাবীকে সমর্থন করে বলেন, নবাবের শেষ জীবনে আমিই তাঁর ঘনিষ্ঠতম ছিলাম এবং নানা বিষয়ে তাঁর মনের কথা আমাকে বলতেন। আমি জোর করে বলতে পারি, নবাব তাঁর ছোট মেয়েকেই বেশী ভালবাসতেন এবং তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর ছোট মেয়েই ভূপালের গদীতে বসুক।

হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, জম্মু-কাশ্মীর বা বরোদার মত ভূপাল খুব বড় দেশীয় রাজ্য ছিল না। তবে মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ভূপালের গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট। মোগল সম্রাট বাহাদুর শা'র রাজত্বকালে দোস্ত মহম্মদ নামে অতিলোভী আফগান চাকরি-বাকরি জোগাড়ের চেষ্টায় দিল্লীতে আসেন ও পরবর্তীকালে ভূপাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ইনি মালবার বারসিয়া পরগণার ইজারা লাভ করেন এবং মালবার রাজার মৃত্যুর পর অরাজকতার সুযোগে ভূপাল ও তার সংলগ্ন কিছু এলাকায় নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পিণ্ডারীর যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভূপালের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং ভূপালের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও ভূপালের অখণ্ডতা রক্ষা করে। ১৮৪৪ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত তিন বেগম এই রাজ্য শাসন করেন। এরপর ভূপালের গদীতে বসেন স্যার হামিদুল্লা খান।

স্যার হামিদুল্লা এগারো লাখ টাকা রাজন্য ভাতা পেতেন। এই টাকার দশ লাখ পেতেন নবাব নিজে এবং এক লাখ পেতেন তাঁর বড় মেয়ে। এই বড় মেয়েই ছিলেন নবাবের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিনী। এই রাজন্য ভাতা ছাড়াও নবাবের বহু নিজস্ব সম্পত্তি ছিল নানা জায়গায়। অন্যান্য অনেক দেশীয় রাজাদের মত ভূপালের নবাবের বেশ কিছু ধনসম্পত্তি ছিল বিদেশী ব্যাঙ্কে। বোধ হয় বিদেশে বেশ কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল এবং ভারত সরকারকে না জানিয়েই এ সব ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল।

যাই হোক মৃত নবাবের দ্বিতীয় কন্যা ভূপালে গিয়ে হৈ চৈ শুরু

করে দিলেন। উনি অনেকের মনেই এমন ধারণা সৃষ্টি করলেন যে, ভূপালের গদী উনিই পাবেন এবং অনেকের কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে স্ফূর্তি শুরু করলেন। পন্থজীর কানে এ খবর পৌঁছাতেই উনি গোয়েন্দা দপ্তর ও মধ্যপ্রদেশ সরকারকে বললেন; নবাব-নন্দিনীর বন্ধুদের জানিয়ে দাও যে একজন পাকিস্তানীকে টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করলে ভারত সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন।

ভূপাল রাজকোষ থেকে টাকা নেবার অধিকার তাঁর ছিল না; সরকারী হুমকীতে ভয়ে বন্ধুরাও টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। মহা মুশকিলে পড়লেন নবাব-নন্দিনী। বার বার টেলিফোন করেন দিল্লী, কিন্তু পন্থজীর ব্যস্ততার জন্য কিছুতেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান না। এদিকে ভিসার মেয়াদ প্রায় শেষ। আবার ট্রাংকল করেন দিল্লীতে; না, পন্থজী এখন কথা বলতে পারবেন না। ক্যাবিনেট মিটিং চলছে।

নবাব-নন্দিনীর ভারতবাসের শেষ দিন উপস্থিত। মধ্য রাত্রেই ভিসার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আবার ট্রাংকল দিল্লীতে। হ্যাঁ, এবার পন্থজীকে পাওয়া গেল। নবাব-নন্দিনী কিছু বলার আগেই পন্থজী গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ক'দিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে আপনি বার বার টেলিফোন করা সত্ত্বেও আমি কথা বলতে পারিনি। যাই হোক, বলুন কেমন আছেন? ভূপালে কেমন দিন কাটাচ্ছেন? নিশ্চয়ই খুব আনন্দে। নবাব-নন্দিনী বললেন, দিনগুলো ভালই কাটছে কিন্তু আজ রাত্রেই যে আমার ভিসার মেয়াদ শেষ।

পন্থজী চমকে উঠে বলেন, সে কি! আগে বলেননি কেন! আপনার ভিসার মেয়াদ অনায়াসে বাড়িয়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু আপনার সঙ্গে যে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারলাম না।

আপনি দিল্লী চলে এলেন না কেন?

সেটা আমার ভুল হয়েছে।

কিন্তু এখন কি করবেন? ভুপাল থেকে তো করাচীর কোন

প্লেন নেই। আপনাকে তো বোম্বে বা দিল্লী হয়ে যেতে হবে।

ভিসার মেয়াদ বাড়ানো যায় না ?

যায়, কিন্তু আজ অফিস ছুটি হবার আগে কি আপনি দিল্লী পৌঁছতে পারবেম ?

না, সে অসম্ভব।

খুবই দুঃখের কথা যে আজ মাঝ রাত্তিরের মধ্যেই আপনাকে ইণ্ডিয়া ছাড়তে হবে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পন্থজী ওকে কয়েক ঘণ্টা বিলম্বে ভারত ত্যাগের বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করে দিলেন এবং নবাব-নন্দিনী পরের দিন বোম্বে থেকে করাচী চলে গেলেন।

নবাবের বড় মেয়ে পতৌদীর বেগম আবার তাঁর ছোট্ট সাদা গাড়িটা চড়ে ছ' নম্বর মৌলানা আজাদ রোডে এলেন। নিজের স্বপক্ষে পন্থজীকে অনেক কিছু বললেন।

পন্থজী বললেন, শুনেছি বিদেশের নানা ব্যাঙ্কে নবাবের বেশ কিছু টাকাকড়ি ও মূল্যবান গহনাপত্র আছে—এটা কি ঠিক ?

কিছু আছে বৈকি ?

কিন্তু সরকারের বিনা অনুমতিতে বিদেশী ব্যাঙ্কে কিছু রাখা তো বে-আইনী।

হ্যাঁ, তা তো জানি।

আপনি কি জানেন কোথায় কি আছে ? নবাবের সব সম্পত্তির সঠিক হিসাবনিকাশ৹ পেলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে আর সময় লাগবে না।

পন্থজীর কথার অর্থ বোঝেন পতৌদীর বেগম। উনি বললেন, হ্যাঁ, কিছু কিছু খবর জানি বৈকি এবং এ সব সম্পত্তির ওপর আমার কোন দাবী নেই। বেগমসাহেবা একটু ভেবে বললেন, তবে আমার ছেলে মনসুর আলি খান বিলেতে পড়ছে। তার পড়াশুনার জন্য····

পন্থজী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আপনার ছেলের পড়াশুনার খরচের জন্য যে ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার, তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হবে।

ঐ টাকা বাদ দিয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কের সব টাকা ও বিদেশের নানা কোম্পানিতে নবাব যে সব টাকা লগ্নী করেছিলেন, তার অধিকার ভারত সরকার গ্রহণ করার পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল, পরলোকগত নবাবের বড় মেয়ে পতৌদীর বেগমই ভূপালের গদী পাবেন।

এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন পন্থজী। দিল্লীতে এসেই টাইপরাইটার খট খট করে এক দীর্ঘ রিপোর্ট তৈরি করলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাগজের অফিসে পাঠালাম না। মনে মনে ভাবলাম, পন্থজী যখন আমাকে এত স্নেহ করেন, তখন এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর তাঁকে না জানিয়ে ছাপা উচিত নয়।

পন্থজীর পার্সোন্যাল সেক্রেটারি জানকীবাবুকে টেলিফোন করেই ছ'নম্বর মৌলানা আজাদ রোডে হাজির হলাম। পন্থজীর হাতে রিপোর্টটা দিলাম। উনি পড়েই বললেন, এ খবর তুমি কোথায় পেলে?

আমি বললাম, রায়পুর কংগ্রেস অধিবেশন থেকে ফেরার পথে কিভাবে খবরটা পেয়েছি।

পন্থজী হেসে বললেন, খবরটা ঠিকই পেয়েছ কিন্তু এ সময় এ খবর না বেরোনই ভাল।

এ প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা কিন্তু আজই প্রথম এ খবরের কথা লিখলাম।

*　　　　*　　　　*

বিজ্ঞান ভবন থেকে বেরিয়ে জনপথ ধরে দক্ষিণের দিকে একটু এগুলেই এক নম্বর ইয়র্ক প্লেস। নতুন নাম মতিলাল নেহরু প্লেস। ওদিকে গেলেই আধুনিক ভারতবর্ষের ফতেপুর সিক্রীর সামনে না দাঁড়িয়ে পারি না।

কোথাও কোন প্রাণচাঞ্চল্য নেই, নেই বিশেষ কোন মানুষের

আনাগোনা। ইয়র্ক প্লেসকে ঘুরে জনপথের উপর দিয়ে দিনরাত কত গাড়ি-ঘোড়া মানুষজনের ছোটাছুটি, কিন্তু না, তারাও কেউ মুহূর্তের জন্য এই ফতেপুর সিক্রীর সামনে দাঁড়ান না। সবাই ব্যস্ত? কারুরই সময় নেই? নাকি প্রয়োজন নেই?

একদিন এই এক নম্বর ইয়র্ক প্লেসই ফতেপুর সিক্রীর মত ভারত-ভাগ্য-বিধাতার আস্তানা ছিল। তখন কত সান্ত্রী চারপাশে ঘোরাঘুরি করত, ত্বরিত পদক্ষেপে আসা-যাওয়া করতেন আসমুদ্রহিমাচলের রথী-মহারথীরা। সরকারী আমলাদের কাছে তখন এ বাড়ি মক্কা-মদিনা, ক্ষমতালোভী স্বার্থপর রাজনীতিবিদদের কাছে এই ফতেপুর সিক্রীই ছিল কৈলাস-মানস সরোবর।

আজ? ফতেপুর সিক্রীর মত এক নম্বর ইয়র্ক প্লেসও অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়। আর লালবাহাদুর শাস্ত্রী? কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলার মত আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বজন উপেক্ষিত মহানায়ক।

অতীতের এক নম্বর ইয়র্ক প্লেস ও আজকের এক নম্বর মতিলাল নেহরু প্লেসে পা দিতেই কত কথা মনে পড়ছে! প্রথম দিনের আলাপেই চমকে গিয়েছিলাম।

দু-এক মাস আগেই দিল্লী এসেছি। দু-চারদিন পর পরই নেহরু সন্দর্শনে তিনমূর্তি ভবনে যাই। মাঝে মাঝে শাস্ত্রীজিকে দেখি কিন্তু কথা হয় না। তারপর হঠাৎ একদিন আমাকে দেখিয়ে উনি নেহরুকে বললেন, পণ্ডিতজী, এই ছেলেটার বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে।

আমি চমকে উঠলাম।

শাস্ত্রীজি হাসতে হাসতে বললেন, হি কাম্‌স টু ইউ এভরি নাউ এ্যাণ্ড দেন কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করে না।

পণ্ডিতজী সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নটি বয়! তুমি রোজ লালবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবে।

সত্যি এরপর থেকে রোজ শাস্ত্রীজির বাড়ি যেতাম। দিল্লীতে আছি অথচ ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, এমন দিনের কথা মনে পড়ে না। না গিয়ে পারতাম না। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এই মানুষটি আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতেন।

একবার আমি পণ্ডিতজীর তিনমূর্তির বাড়িতে কলকাতার এক যশস্বী রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করলাম। পণ্ডিতজীর ব্যক্তিগত ড্রইংরুমে অনুষ্ঠিত এই ঘরোয়া আসরে আমন্ত্রিত ছিলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শাস্ত্রীজি, শ্রীমতী উমা নেহরু, লেডী রামা রাও, এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী, শ্রীমতী সারদা মুখার্জী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তায়েবজী ও আরো ক'জন ছাড়া নেহরু পরিবারের কয়েকজন। আমি পণ্ডিতজী আর শাস্ত্রীজিকে গানের মোটামুটি অর্থ ইংরেজিতে বলে দিচ্ছিলাম। অনুষ্ঠানের শেষে শাস্ত্রীজি আমাকে বললেন, আমি রবিবাবুর সব বই পড়েছি। গীতাঞ্জলি, চোখের বালি, গোরা আর রাশিয়ার চিঠি যে কতবার পড়েছি তার ঠিক ঠিকানা নেই, কিন্তু লজ্জার কথা, রবিবাবুর গান বিশেষ শুনিনি। তাই বলছিলাম, যদি একদিন আমার বাড়িতে গানের আয়োজন কর তাহলে খুব খুশি হতাম।

পরের দিনই শিল্পীর কলকাতায় ফেরার কথা। রেলের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল। শাস্ত্রীজি ওকে বললেন, আমি আবার রিজার্ভেশন করে দেব। কলকাতায় খবরও দিয়ে দিচ্ছি। আপনি একদিন থেকে গেলে বাড়ির সবাইকে রবিবাবুর গান শোনাতে পারি।

এমন আন্তরিক খোলাখুলি কথা শুধু উনিই বলতে পারতেন।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ মারা যাবার পর শাস্ত্রীজি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বের সীমা ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা, আই-সি-এস / আই-এ-এস / আই-পি-এস প্রভৃতি সমস্ত সর্ব ভারতীয় সার্ভিসেস, সমগ্র গোয়েন্দা বিভাগ, বিশেষ পুলিশ সংস্থা, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয়, হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের

বিচারপতি নিয়োগ ও তাঁদের চাকরি-বাকরি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়, সি-বি-আই, ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যের রাজাদের রাজন্য ভাতা ও তাদের উত্তরাধিকারী, কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল, রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কর্মচারীদের চাকরি-বাকরি সংক্রান্ত বিষয়, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা এবং আরো অনেক কিছু বিষয় ও বিভাগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে ছিল। এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে শাস্ত্রীজিকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হত। সকালে সাড়ে আটটা-নটার আগে কাজ শুরু না করলেও প্রতি দিন রাত্রে দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত কাজ করতেন।

শাস্ত্রীজি সাধারণত রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত অফিসে কাজ করতেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ ওঁকে বাড়ি ফিরে যেতে দেখেই একটু খটকা লাগল। মনে হল, বোধ হয় পারিবারিক কোন অনুষ্ঠান আছে; কিন্তু না, পারিবারিক কারণে উনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেননি। পারিবারিক ভৃত্য-পুত্রের নিউমোনিয়া হয়েছে শুনেই উনি বাড়ি ফিরেছেন। সেদিন আর কোন কাজ নয়। ভৃত্য-পুত্রের চিকিৎসার বিধিব্যবস্থা ও সেবাযত্নের তদারকী করেই সারা রাত কাটিয়ে দিলেন।

উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন অসুস্থ হয়ে অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজি তাঁকে দেখতে গেলেন। সঙ্গে আমিও আছি। হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে সফ্‌দারজং রেলওয়ে লেভেল ক্রশিং বন্ধ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি থমকে দাঁড়াল। একটু দূরে একটা লোক আখের রস বিক্রী করছিল। ওকে দেখতে পেয়েই শাস্ত্রীজি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পয়সা আছে?

প্রশ্ন শুনে একটু বিস্মিত হলেও বললাম, আছে।

এবার একটু হেসে বললেন, হাজার হোক উত্তর প্রদেশের মানুষ। আখের রস খেতে ইচ্ছা করছে। খাওয়াবে?

কিন্তু আপনি কী এই আখের রস খাবেন ?

চিরকালই তো এই রকম রাস্তার ধারের দোকান থেকে আখের রস খেয়েছি। এখন খাব না কেন ?

রাস্তার ধারের একজন অতি সাধারণ দেহাতী লোকের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী আখের রস খাবেন শুনেই সঙ্গী নিরাপত্তা কর্মীরা চমকে উঠলেন। প্রধানমন্ত্রী হেসে বললেন, ভয় নেই। এর হাতের আখের রস খেয়ে আমি মরব না।

আজ এক নম্বর ইয়র্ক প্লেসের কথা বলতে গিয়ে আরো কত কথা মনে পড়ছে। শাস্ত্রীজির বড় ছেলে হরি এক বিখ্যাত বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কয়েক বছর শিক্ষানবীশ থাকার পর ওঁদেরই ভারতীয় সংস্থায় চাকরি পেল। বাড়ি, গাড়ি ও হাজার টাকার ওপর মাইনে। হরি ভেবেছিল, বাবা খুব খুশি হবেন কিন্তু নিয়োগপত্র দেখে উনি কিছুই বললেন না। পরের দিনই শাস্ত্রীজি ঐ সংস্থার সর্বময় কর্তাকে লিখলেন, ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন জেনে খুশি হলাম কিন্তু বাড়ি-গাড়ি ছাড়াও অত টাকা মাইনে পাবার মত যোগ্যতা তো আমার ছেলের নেই। সুতরাং অন্য পাঁচজনের মত যদি ওকে সাধারণ মাইনে দেন, তাহলে সে চাকরি করবে, অন্যথায় নয়।

এ ধরনের চিঠি কী আর কারুর কাছে আশা করা যায় ?

যাই হোক, এই চাকরির সূত্রে হরিকে প্রায়ই ভূপাল যেতে হত। শাস্ত্রীজি খবর পেলেন, রেল স্টেশনে ওঁর ছেলেকে অভ্যর্থনা করার জন্য কখনও মুখ্যমন্ত্রী, কখনও বা অন্য মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রীজি মুখ্যমন্ত্রী শঙ্করদয়াল শর্মাকে ফোন করে বললেন, আমি প্রধানমন্ত্রী, আমার ছেলে প্রধানমন্ত্রী না। সুতরাং আমার ছেলেকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কোন মন্ত্রীই যেন স্টেশনে না যান।

একবার শাস্ত্রীজি তাঁর এক অতি বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন ব্যক্তিগত কর্মচারীকে হঠাৎ নিজের দপ্তর থেকে সরিয়ে দেন। কেন ? উনি জনৈক ব্যবসায়ীকে একটু সাহায্য করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক

জয়েন্ট সেক্রেটরিকে টেলিফোন করেছিলেন। এই ভদ্রলোককে আর কোন দিন শাস্ত্রীজি বাড়িতে ঢুকতে দেননি।

আরো মজার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী একদিনের কলকাতা সফরে যাচ্ছেন। প্রথম বার কলকাতা দেখার জন্য ওঁর পরিবারের কয়েকজন সঙ্গে আছেন। এ ছাড়া তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রী ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী টি. এন. সিং, রেলমন্ত্রী শ্রী দাসাপ্পা, আইনমন্ত্রী শ্রী অশোক সেন ছাড়াও জেসপ কোম্পানির চেয়ারম্যান শ্রী অশোক চন্দ ও আমিও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কলকাতা যাচ্ছি। কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম কার্যসূচী জেসপ কোম্পানির ১৫০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসবে যোগদান। উৎসবটি এমন সময় হচ্ছিল যখন ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত শিল্পপতি আস্তে আস্তে জেসপ কোম্পানির শেয়ার কিনে নিজের কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছিলেন। অন্য দিকে সরকার ভাবছিলেন, যে কোম্পানিকে বহু সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং যার প্রায় সমগ্র উৎপাদনই সরকার কিনে নেন, সে কোম্পানির মালিকানা/ পরিচালনা সরকারের হাতে আসাই ঠিক হবে কিনা। কংগ্রেস সিণ্ডিকেটের কিছু নেতা ঐ শিল্পপতিকে বুঝিয়েছিলেন, আমরাই শাস্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী করেছি। সুতরাং আমরা বললে উনি নিশ্চয়ই জেসপ কোম্পানির সরকারী পরিচালনায় আনতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গের এক বিখ্যাত কংগ্রেস নেতাও ঐ শিল্পপতিকে খুব সাহায্য করছিলেন।

দিল্লীর পালাম বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান টেক-অফ্ করার পাঁচ-দশ মিনিট পরেই শাস্ত্রীজি শ্রীচন্দকে নিজের কেবিনে ডেকে পাঠালেন। দশ-পনেরো মিনিট পর শ্রীচন্দ আমাদের কেবিনে ফিরে আসতেই প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি, ওঁর হাতে জেসপ কোম্পানির ১৫০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক অনুষ্ঠানের নানা কাগজপত্র। মঞ্চে কে কোথায় বসবেন তার প্ল্যান আমাকে দেখিয়ে বললেন, আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট দিস জেণ্টলম্যান (ঐ

শিল্পপতি) টু বী সীটেড অন দ্য ডায়াস। ক্যান ইউ হেল্প মী ?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই পারব।

তাহলে যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

আমি প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসেই একটা সাদা কাগজ লিখলাম— আর্জেন্ট মেসেজ ফর মিস্টার পি. কে. বাসু ডি আই জি / আই বি— মিস্টার....সুড নট বি সিটেড অন দ্য ডায়াস। প্লিজ কনফার্ম। কাইণ্ডলি রিপ্লাই উইদিন্ ফিফ্‌টিন মিনিটস্। ককপিটে গিয়ে মেসেজটি কমাণ্ডার অব দ্য এয়ারক্রাফটকে দিয়ে বললাম, এক্ষুণি এই মেসেজটি দমদম কণ্ট্রোলে পাঠান এবং উত্তর এলেই আমাকে জানাবেন।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই প্রসাদবাবু আমাকে জবাব দিলেন— ব্যবস্থা করছি।

তারপর ? না, ঐ শিল্পপতি অনেক তর্ক-বিতর্ক করেও মঞ্চে বসার সুযোগ পাননি। সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা তাকে দর্শকদের একটি আসনেই বসিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই শিল্পপতির হাতে জেসপ কোম্পানিকে তুলে দেননি শাস্ত্রীজি। মজার কথা, এই মানুষটি সম্পর্কে একদল রাজনীতিবিদ প্রচার করতেন, আমাদের পরামর্শ ছাড়া ওঁর পক্ষে কোন কিছু করা অসম্ভব নয়।

কার্টুনিস্ট শংকর, কুট্টি, আর. কে. লক্ষ্মণ বা আমাদের চণ্ডী লাহিড়ী কংগ্রেস নেতাদের যে ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন, তা পুরোপুরি ঠিক না হলেও অনেকাংশে ঠিক। কংগ্রেসী নেতাদের মোটামুটি ঐ রূপ। মুখে কোন দুশ্চিন্তার ছাপ নেই, চেহারা দেখে মনে হয় না তিন পুরুষের মধ্যে কেউ কোন দিন কায়িক পরিশ্রম করেছেন। এরা চাকরি করেন না, ব্যবসা করেন না, কিন্তু তবু এদের সংসারে প্রাচুর্যের বন্যা। রেলগাড়ি চড়লে এদের কৌলীন্য যায়। মোটরগাড়ি ছেড়ে এক কিলোমিটার রাস্তা হাঁটলেই তা পদযাত্রার গৌরব লাভ করে খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়। আরো কত কি। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে এবং নিঃসন্দেহে লালবাহাদুর শাস্ত্রী তার সব চাইতে বড় নিদর্শন।

রাজনৈতিক দিক থেকে শাস্ত্রীজি নেহরুর একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, এ কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না, ইনি নেহরুজীর তিনমূর্তি ভবনের বিলাসবহুল বিধিব্যবস্থা মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনমূর্তি ভবনের সংসার চালাত সরকারী অতিথি সেবা বিভাগ (গভর্ণমেণ্ট হস্‌পিটালিটি অরগানাইজেসান) এবং যত দূর মনে পড়ছে নেহরু তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্য দৈনিক মাত্র সাড়ে সাত টাকা সরকারী অতিথি সেবা বিভাগকে দিতেন। গৌরী সেনের টাকায় সংসার চলত বলে তিনমূর্তি ভবনে প্রাচুর্যের বন্যা বইত। বেয়ারা, চাপরাশী, কেরানী, স্টেনোগ্রাফার, নিরাপত্তা কর্মী, প্রাইভেট সেক্রেটারি, অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়নের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। এর জন্য কত টাকা ব্যয় হত তা জানার উপায় নেই, কারণ সবকাবী অতিথি সেবা বিভাগ রাষ্ট্রপতি ভবনের অধীনে ছিল এবং রাষ্ট্রপতির বাজেটের মধ্যেই এ সব খরচ ধরা হত। শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, মোটরগাড়িরও ঢালাও ব্যবস্থা ছিল ; কারণ পণ্ডিতজীর নিজস্ব গাড়ি ছাড়া অন্য সব গাড়ি আসত রাষ্ট্রপতি ভবনের গ্যারেজ থেকে।

লালবাহাদুর কোন দিন মুখে কিছু বলেননি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি বুঝিয়ে দিলেন, না, গৌরী সেনের টাকায় সংসার চালাতে তিনি আগ্রহী নন। অতিথি সেবা বিভাগকে বলা হল, যাও, রাষ্ট্রপতি ভবনে ফিরে যাও। রাষ্ট্রপতি ভবনের গাড়িও চাই না, ও সব ব্যবহার হবে রাষ্ট্রপতি ও সরকারী অতিথিদের জন্য। বিশিষ্ট অতিথি আপ্যায়ন? নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু বাড়িতে কেন? তার জন্য তো রাষ্ট্রপতি ভবন, হায়দ্রাবাদ হাউস ও সরকারী ভাল ভাল হোটেল আছে! প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্য? টি-বোর্ডকে বলে দাও, ওরা চা খাওয়াবে। বাড়ি-ঘরদোর সাজানো-গোছানো? না, লাখ লাখ টাকার ফার্ণিচার আর কার্পেট দিয়ে বাড়ি সাজাতে হবে না। যা আছে, তাতেই চলবে। অফিসে? হ্যাঁ, ওখানে দুটো-একটা ঘর সুসজ্জিত থাকুক, কিন্তু আহা মরি করার

কোন প্রয়োজন নেই। ঘরে ঘরে এয়ার কণ্ডিশনার? নো, নেভার। দরজায় মোটা সিল্কের পর্দা? লাখ টাকা খরচ করে পর্দা তৈরি করতে হবে না। অল্প খরচেও ভাল পর্দা হয়।

দেশী-বিদেশী রাজা-মহারাজা আর বিলেত ফেরত সাহেবসুবাদের ভজনা করতে করতে আমরা সৎ, ভদ্র ও আদর্শবাদী ভারতীয়দের শ্রদ্ধা করতে ভুলে গেছি। তাই তো এক দল লোক শাস্ত্রীজিকে নিয়ে জঘন্য বিদ্রুপ করতেও দ্বিধা করেননি এবং এরা প্রচার করেন যে শাস্ত্রীজি কায়রোয় গিয়ে হোটেলে নিজের শোবার ঘরে রান্নাবান্না করার জন্য লাখ টাকা খেসারত দিতে হয়। নেহরুর একটা মন্তব্যের জন্য অতীতের ভারত-ভক্ত নেপাল ভারত-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। শাঁখা-সিঁদুর আর মাথায় ঘোমটা পরা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সহজ সরল অমায়িক ব্যবহার করেই শাস্ত্রীজি নেপালের পররাষ্ট্র নীতিতে মোড় ঘুরিয়ে দেন। এই ছোট্টখাট্ট মানুষটিই আমেরিকা যাত্রার ক'দিন আগে প্রেসিডেন্ট জনসনের একটা মন্তব্যের প্রতিবাদে আমেরিকা সফর বাতিল করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর না করেই পাকিস্তানকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করার অনুমতি দেন।

আজকের আসাম আন্দোলনের পটভূমিকায় একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সে সময় মাঝে মাঝেই অভিযোগ শোনা যেত, আসামের কয়েকজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী কংগ্রেস নেতার পৃষ্টপোষকতায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেশ কিছু লোকজন বে-আইনী ভাবে আসামে অনুপ্রবেশ করছে। এ নিয়ে পার্লামেন্টে ও আসাম-পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় তর্ক-বিতর্কও হত। কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অনুপ্রবেশ হত, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও সবাই জানতেন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী আসামের কিছু চা বাগানের মধ্যে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বেশ কিছু মানুষ বে-আইনী ভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসামে চলে আসতেন।

একদিন পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে আসামের কয়েকজন এম. পি'র কাছে শুনলাম, সীমান্তবর্তী একটা বিরাট চা বাগান সাহেবরা এক মাড়োয়ারী কোম্পানির কাছে বিক্রী করছে এবং পরদিনই গৌহাটিতে এই লেনদেন চূড়ান্ত হবে। ওরা আশঙ্কা করছিলেন, ঐ চা বাগানটি মাড়োয়ারীদের হাতে গেলে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের চাপে এই বাগান দিয়ে বে-আইনী অনুপ্রবেশ আরো বেড়ে যাবে। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাস্ত্রীজির কাছে খবরটা পৌঁছে গেল অপরাহ্নের দিকে। বিকেলের দিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সর্বাধিনায়ক ভোলানাথ মল্লিকের তলব পড়ল।

দিন দুই পরে ঐ সেন্ট্রাল হলের আড্ডাখানাতেই শুনলাম, সেদিন যে প্লেনে সাহেব ও মাড়োয়ারী কর্তাদের কলকাতা থেকে গৌহাটি যাবার কথা ছিল, সে প্লেনে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। ওরা বহুক্ষণ দমদম এয়ারপোর্টে বসে থাকার পর যখন দেখলেন গৌহাটির কোর্ট-কাছারি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বন্ধ হবার সময় হয়ে আসছে এবং সেদিন ঐ লেনদেন পাকাপাকি করায় সময় নেই, তখন ওরা ফিরে গেলেন। ওরা দমদম ছেড়ে চলে যাবার পর পরই প্লেনের যান্ত্রিক গোলযোগও ঠিক হয়ে গেল। আর ওরা যখন দমদমে বসে আছেন তখন কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমে একদল সরকারী অফিসার ঐ চা বাগানের কিছু আইন বহির্ভূত কাজকর্মের জন্য ওর পরিচালনার দায়িত্ব সাময়িক ভাবে নিয়ে নিলেন। কাক-পক্ষী জানল না কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সফল হল। এই হল লালবাহাদুর শাস্ত্রী!

কেন কাশ্মীরে কী করলেন? হজরতবল মসজিদ থেকে হজরতের পবিত্র কেশ চুরি হওয়ায় চারদিকে দারুণ হৈ-চৈ শুরু হল। গোয়েন্দাদের তৎপরতায় কেশ উদ্ধার হল কিন্তু কাশ্মীরের অধিকাংশ ধর্মীয় নেতারাই বললেন, না, ও কেশ, সে কেশ নয়। কাশ্মীরে তখন এমন উত্তপ্ত আবহাওয়া যে, যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটতে পারে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে লালবাহাদুর চলে গেলেন কাশ্মীর। একই সময়ে সব ধর্মীয় নেতাদের ডাকলেন সরকারী

অতিথিশালায় কিন্তু প্রত্যেককে আলাদা আলাদা গাড়িতে আনা হল এবং আলাদা আলাদা ঘরে বসানো হল। অর্থাৎ সবাই ভাবলেন, শাস্ত্রীজি শুধু তাঁর সঙ্গেই আলোচনা করতে চান এবং এ খবর আর কেউ জানেন না। এবার শাস্ত্রীজি নিজে প্রথম ঘরে গিয়ে একজন নেতার সঙ্গে আলাদা ভাবে আলোচনা করলেন এবং তিনি স্বীকার করলেন, এটাই পয়গম্বরের কেশ, কিন্তু অন্যেরা স্বীকার করছে না। শাস্ত্রীজি ওকে একটু অপেক্ষা করতে বলে দ্বিতীয় ঘরে এসে দ্বিতীয় নেতার সঙ্গে কথা বললেন। উনি বললেন, আমি তো জানি এটা পয়গম্বরের কেশ কিন্তু অন্যেরা স্বীকার করছে না। এভাবে শাস্ত্রীজি প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলে একই কথা শুনলেন। এবার সবাইকে বাইরে ডাকা হল। নেতারা একে অন্যকে দেখে অবাক! মাইক্রোফোন প্রস্তুত। দল পাকিয়ে গণ্ডগোল করার কোন অবকাশ নেই। শাস্ত্রীজির আমন্ত্রণে একে একে প্রত্যেক নেতা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, হ্যাঁ, এই সেই পয়গম্বরের পবিত্র কেশ। ধর্মীয় নেতাদের এই ভাষণ রেকর্ড করে সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হল কাশ্মীর রেডিওতে।

যে সমস্যা নিয়ে সারা কাশ্মীর উপত্যকায় প্রায় আগুন জ্বলে উঠেছিল, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে সমস্যার সমাধান করে লালবাহাদুর ফিরে এলেন দিল্লী।

গ্রামের ছেলে লালবাহাদুর। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বা ইটন-হ্যারো'তে নয়, গ্রামের পাঠশালা আর কাশী বিদ্যাপীঠে লেখাপড়া করেছেন। পরতেন সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি, কিন্তু তাই বলে সৌজন্যবোধের অভাব ছিল না শাস্ত্রীজির।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্স কভারে গেছি। মার্লবোরা হাউসে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রেস রিসেপসন। এই রিসেপসনেই দেশনায়কদের সঙ্গে সাংবাদিকদের মেলামেশা গল্পগুজব। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রত্যেক সাংবাদিককে ড্রিঙ্ক তুলে দেন প্রবেশ পথের মুখে। আমি ঢুকতে

গিয়েই দেখি, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রীজি খানার নক্সা সঙ্গে কথা বলছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর হাতে ড্রিঙ্ক কিন্তু সামনে শাস্ত্রীজিকে দেখে আমি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছি। শাস্ত্রীজি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে চোখের ইসারায় আমাকে ইঙ্গিত করলেন, নিয়ে নাও। আমি হাসতে হাসতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে ড্রিঙ্ক গ্রহণ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুবের কাছে এগিয়ে গেলাম।

শাস্ত্রীজির কথা লিখতে বসে কত কথা মনে পড়ছে। ভাবপ্রবণ জহরলাল কখনও কখনও এমন এক একটি মন্তব্য করতেন যে তার ফলে অনেক সময় বহু সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠত। যেমন ভারত-নেপাল সম্পর্ক।

ভারত নেপালের সম্পর্ক নানা কারণে খুবই নিবিড়। তাইতো রাণাদের আধিপত্য শেষ করার জন্য ভারত নেপালের পাশে এসে দাঁড়ায়। মুখ্যত জয়প্রকাশ-লোহিয়ার মত কিছু সোসালিস্ট নেতার উদ্যোগে ভারতবর্ষের মানুষ নেপালবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেও ভারত সরকারও পিছিয়ে থাকেনি। নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নেহরুর অবদান অনস্বীকার্য। নেপালের চরম দুর্দিনে রাজা ত্রিভুবনকে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন ভারত সরকার। তারপর রাজা ত্রিভুবন নেপালে ফিরে গেলে কৈরালার প্রধানমন্ত্রীত্ব-কালে ভারত নেপালের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। নেপালের রাজা ও নেপালের মানুষ এ সব কথা আজও ভোলেনি। যাই হোক, পরবর্তী কালে রাজা মহেন্দ্র রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে এমন সরকার গঠন করেন, যা গণতান্ত্রিক ভারতকে দুঃখ দেয়। পত্র-পত্রিকায় ও নানা রাজনৈতিক দলের সভা-সমিতিতে রাজা মহেন্দ্রর সমালোচনাও করা হয়।—নেপাল ভারতবর্ষের ব্যাপারে এত ওয়াকিবহাল যে এ সব সমালোচনায় খুশি না হলেও মেনে নিয়েছে কিন্তু যেদিন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরু রাজা মহেন্দ্রর এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন, সেদিন নেপাল সরকার তা নীরবে মেনে নিতে

পারেনি। স্বাধীন সার্বভৌম নেপাল সরকার বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিল, আমাদের দেশে কি ধরনের সরকার হবে, তা আমাদের বিচার্য, ভারত সরকারের নয়। নেহরুর ঐ একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারত-নেপাল সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে শুরু হল ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ। সংঘর্ষ। নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল রাতারাতি। ভারত-নেপাল সম্পর্কের অবনতি রোধই নয়, অবিলম্বে উন্নতির প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু কে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে? যে আই-সি-এস আই-এফ-এস কুলচূড়ামণিরা ভারতবর্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আলোকিত করে রাখেন তাদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া গেল না যিনি এ কাজ করতে পারেন। সর্দার স্বরণ সিং বহুবার পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিলেও তাঁকেও ঠিক উপযুক্ত মনে হল না। তবে কি নেহরু স্বয়ং? যাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জল এত ঘোলা হয়েছে তাঁর যাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া নেহরু নিজে এগিয়ে গেলে ভারত সরকারের মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকবে না। তবে কি কৃষ্ণ মেনন? না, দেশরক্ষামন্ত্রী নেপাল গেলে নানা দেশে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং নেপালও অস্বস্তিবোধ করবে। তবে কে?

অনেক ভেবেচিন্তে নেহরু শাস্ত্রীজিকে বললেন, লালবাহাদুর, তুমি নেপাল যাও।

শাস্ত্রীজি অবাক হয়ে বললেন, আমি!

হ্যাঁ, তুমি।

শাস্ত্রীজি হেসে বললেন, আমি তো কোন দিন দেশের বাইরে যাইনি। তাছাড়া ফরেন এ্যাফেয়ার্সের ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞও না।

পণ্ডিতজী সরাসরি বললেন, তাতে কি হল? তুমি তো ক্যাবিনেটের পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স কমিটির মেম্বার। তোমার আবার কি অজানা?

কয়েকদিন পরেই সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল, নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববন্ধু থাপার আমন্ত্রণে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর

শাস্ত্রী সস্ত্রীক নেপাল সফর করবেন।

নিত্যকার মত পরের দিন সকালে অফিস যাবার পথে শাস্ত্রীজির বাড়ি যেতেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নেপাল গিয়েছ ?

হ্যাঁ।

ওখানকার লোকজনের সঙ্গে পরিচয় আছে ?

আমি হেসে বললাম, নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডাঃ তুলসী গিরির সঙ্গে আমার খুবই মধুর সম্পর্ক।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কি ভাবে ?

অনেক কাল ধরেই পরিচয়। তাছাড়া বেলগ্রেডে নন-এ্যালাইণ্ড নেশনস্ কনফারেন্সের সময় আমি আর ডাঃ গিরি খুবই ঘনিষ্ঠ হই।

শুনে খুশি হলেন শাস্ত্রীজি। একটু হেসে বললেন, তাহলে আমি যখন নেপাল যাব, তুমি কি যেতে পারবে ?

আমি বললাম, সম্পাদকের সঙ্গে আজই টেলিফোনে কথা বলব।

রাত্রে সম্পাদকের সঙ্গে কথা বললাম। উনি মত দিলেন। দু-একদিনের মধ্যেই বিমানের টিকিট ও টাকা পাঠিয়ে দিলেন। শাস্ত্রীজি রওনা হবার একদিন আগেই আমি দিল্লী থেকে কাটমাণ্ডু রওনা হলাম।

কাটমাণ্ডু বিমানবন্দরে পৌঁছে দু-একজনের সঙ্গে কথা বলছি। হঠাৎ দেখি প্রধানমন্ত্রী ডাঃ গিরির স্ত্রী এয়ারপোর্টে ঘুরছেন। সঙ্গে বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার। মিসেস গিরির সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে যেতেই একজন পুলিশ অফিসার আমাকে বাধা দিলেন। অনুরোধ করলাম, ওঁকে আমার কথা বলতে, কিন্তু অফিসারটি এমন বিরক্তি প্রকাশ করলেন যে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। সন্দেহ হল, বোধ হয় ভারতীয় সাংবাদিক বলেই আমাকে এমন করে উপেক্ষা করা হল। বুঝলাম, ভারত-নেপাল সম্পর্ক কোথায় এসে পৌঁছেছে।

দুপুরে আমাদের এম্বাসীতে গেলাম। দু-একজন পূর্ব-পরিচিত অফিসারের সঙ্গে দেখা করার পর গেলাম প্রেস এ্যাটাশে মিঃ জুগরানের কাছে। কাজ-পাগল প্রাণবন্ত মানুষ। প্রাণ খুলে হাসতে পারেন, মিশতে পারেন মানুষের সঙ্গে। অনেক হাসিঠাট্টা, গল্পগুজব হল। কফি খেলাম পর পর। সিগারেট পোড়ালাম অনেকগুলো। তারপর হঠাৎ জুগরান চেয়ার ছেড়ে উঠেই বলল, চলুন, আপনার সঙ্গে এ্যাম্বাসেডরের পরিচয় করিয়ে দিই।

আমি হেসে বললাম, ওর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

কবে পরিচয় হল ? আজই ?

না, এর আগেই পরিচয় হয়েছে।

জুগরান এগিয়ে এসে বলল, তা থাক। চলুন, দেখা করে আসবেন।

আমি বললাম, না, ওর সঙ্গে আমি দেখা করব না।

কেন ?

আমি হেসে বললাম, শুনতে চাও ?

জুগরান অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই শুনতে চাই।

কুইন এলিজাবেথ যখন ভারত-পাকিস্তান-নেপাল সফরে আসেন, তখন সাংবাদিক হিসেবে আমিও তাঁর সঙ্গী হলাম। বহু অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার কুইন্স প্রেস পার্টির ভারতীয় সদস্যদের ভিসা মঞ্জুর করলেন না। নেপালে যাবার জন্যে ভিসার প্রয়োজন নেই কিন্তু রাণীর সফর কভার করার জন্য নেপাল সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই চাই। পর পর কয়েকটা চিঠি লিখেও নেপাল সরকারের কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না। ভারত-নেপাল সম্পর্কের তৎকালীন পরিবেশের জন্যই ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রতি নেপাল সরকার এই রকম ঔদাসীন্য দেখান। স্থির করলাম, নেপাল যাবই, তারপর যা হয় হবে। তবু সাবধানের মার নেই।

কৃষ্ণ মেননকে সব কথা জানাতেই উনি নেপালে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ হরেশ্বর দয়ালকে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখে আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে বললেন।

কাটমাণ্ডু পৌঁছে দেখি, নেপাল সরকার আমাদের চিঠিপত্রের জবাব না দিলেও বৃটিশ সাংবাদিকদের মত আমাদের জন্যও সব ব্যবস্থা করেছেন। কুইন্স পার্টির অন্যান্যদের মত আমরাও রাজকীয় নেপাল সরকারের অতিথি হয়ে রয়্যাল হোটেলে রইলাম। রাষ্ট্রদূত হরেশ্বর দয়ালের কাছে কোন সাহায্য চাইবার প্রয়োজন হল না। তবে ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম। উনি পরের দিন আমাকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানালেন।

বিরাট জায়গা নিয়ে কাটমাণ্ডুর ভারতীয় দূতাবাস। একদিকে চান্সেরী ও কিছু কোয়ার্টার্স। অন্য দিকে রাষ্ট্রদূতের নিবাস। পরের দিন যথা সময় আমি দূতাবাস থেকে রাষ্ট্রদূতের নিবাসে পৌঁছলাম রাস্তা আর বিরাট লন পার হয়ে। রাষ্ট্রদূতের ঘরের পাশ দিয়ে বারান্দার এক কোণায় পৌঁছতেই সশস্ত্র প্রহরী আমাকে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে বারান্দার অন্য কোণায় নিয়ে যেতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। সশস্ত্র প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, বারান্দার এ পাশ থেকে ও পাশে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পুরো বাড়িটা ঘুরিয়ে আনলে কেন ? সে জানাল, ডিপ্লোম্যাট ছাড়া অন্য কারুর এ্যাম্বাসেডর সাহেবের জানালার সামনে দিয়ে যাবার হুকুম নেই।

শুনে শুধু অবাক হলাম না, রাগে অপমানে সারা শরীর জ্বলে উঠল। এ্যাম্বাসেডরের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করলাম, এই কি আপনাদের নিয়ম ?

সে সবিনয়ে উত্তর দিল, হ্যাঁ স্যার।

প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখলাম, ডিয়ার মিঃ এ্যাম্বাসেডর, আপনি ঘরে আছেন বলে আপনার জানালার সামনে দিয়ে হাঁটার অধিকার আমার নেই। ছোট্ট বারান্দার এ কোণ থেকে ও কোণ আসার জন্য আমাকে আপনার

বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আসতে হল। এই ধরনের অপমান সহ্য করার অভ্যাস আমার নেই। তাই আপনার সঙ্গে আমার লাঞ্চ খাওয়া সম্ভব নয়। আপনার অসাধারণ সৌজন্যের কথা আমি মিঃ কৃষ্ণ মেননকে বলব।

আমার চিরকুট পড়ে প্রাইভেট সেক্রেটারির চোখ ছানাবড়া। সে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, স্যার, আপনি চলে যাচ্ছেন?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ।

লাঞ্চ খাবেন না?

আমি আবার হেসে বললাম, এত খাবার পরও কি লাঞ্চ খাবার দরকার আছে? আর বললাম, আমি আপনার এ্যাম্বাসেডরের জানালার সামনে দিয়েই চলে যাচ্ছি। যদি উনি অপমান বোধ করেন তাহলে যেন তার প্রতিবাদ করেন।

পরে হরেশ্বর দয়াল আমাকে টেলিফোন করে বললেন, আই এ্যাম সরি, বাট এটা অনেক দিনের নিয়ম।

আমি হেসে বললাম, নিয়মটা আপনার ভাল লাগে বলেই তো আপনি বদলাননি। আর বললাম, ভারতীয় সাংবাদিক হয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে আমি যে অপমান সহ্য করেছি তাতেই বুঝতে পারছি নেপালীদের কপালে কি জোটে।

কথাটা নিছক রাগ করে বলিনি। বহুকাল ভারতীয় দূতাবাসের সমগ্র এলাকার মধ্যে কোন নেপালী ছাতি মাথায় দিতে পারতেন না। কারণ? দূতাবাসের এলাকায় নেপালীরা ছাতি মাথায় দিলে গণতান্ত্রিক ভারত সরকারের হিজ একসেলেন্সী এ্যাম্বাসেডরের অপমান করা হয়। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে শুধু হায়দ্রাবাদে এই নিয়ম ছিল। নিজাম রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কেউ ছাতি মাথায় দিতে পারতেন না। কেন? ছাতি মাথায় দিলে নিজামকে অপমান করা হবে।

সব কিছু বলার পর আমি জুগরানকে জিজ্ঞেস করলাম, এই সব শোনার পরও কি আপনি আমাকে মিঃ দয়ালের কাছে নিয়ে যেতে চান?

জুগরান সে কথার জবাব না দিয়ে হেসে বলল, নাউ উই মাস্ট হ্যাভ ড্রিঙ্কস!

আমি হেসে বললাম, হ্যাটস্ বেটার এ্যাণ্ড মোর অনারেব্ল।

শাস্ত্রীজির কাটমাণ্ডু পৌঁছতে একদিন দেরী হল। হঠাৎ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মারা যাওয়ায় শাস্ত্রীজি তাঁর শেষকৃত্যে যোগদান করে পরের দিন কাটমাণ্ডু পৌঁছলেন। প্রটোকলের তোয়াক্কা না করে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ডাঃ তুলসী গিরি বিমানবন্দরে হাজির হয়ে সবাইকে বিস্মিত করলেন। নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববন্ধু থাপা তো ছিলেনই।

অনেক দিন পর ডাঃ গিরির সঙ্গে দেখা। মনে মনে ভয় ছিল হয়তো প্রধানমন্ত্রী হবার পর কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং আমাকে চিনতে পারবেন না। তাই শাস্ত্রীজির বিমান পৌঁছবার আগে ওকে দেখেও ওর কাছে যেতে দ্বিধা করছিলাম কিন্তু উনি নিজেই এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি কবে এলে?

পরশু।

আমাকে ফোন করনি কেন?

আমি হেসে বললাম, হাজার হোক আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনাকে বিরক্ত করা কি ঠিক?

ডাঃ গিরি হেসে বললেন, প্রধানমন্ত্রী হয়েছি বলে তোমাকে ভুলে যাব? যাই হোক, তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যেও না।

না না, নিশ্চয়ই দেখা করব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববন্ধু থাপার সঙ্গে উনিই আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। থাপাও সাদরে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন ওর বাড়ি।

পরিচয় হল আরো অনেকের সঙ্গে। কথাবার্তাও হল। কথা বললাম না শুধু ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হরেশ্বর দয়ালের সঙ্গে। প্রেস এ্যাটাশে জুগরানের সঙ্গে দিল্লী থেকেই পরিচয় ছিল। এই দু'দিনের আড্ডা-হাসিঠাট্টা আর বিশুদ্ধ স্কচের কৃপায় সে পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাই সে আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে,

তুমি শালা আমার এ্যাম্বাসেডরকে আর কত অপমান করবে ?

আমিও ফিস ফিস করে জবাব দিলাম, তোমার প্রাণের প্রিয় এ্যাম্বাসেডরকে টাইট দেবার লোক আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছচ্ছেন।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে এয়ারপোর্টে দেখে শাস্ত্রীজি মুগ্ধ হলেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন, আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনার কত কাজ। আমার মত একজনকে অভ্যর্থনা করার জন্য আপনি কেন এত কষ্ট করলেন ?

ডাঃ গিরি বললেন, শাস্ত্রীজি, আপনাকে শুধু আপনার দেশের লোকই শ্রদ্ধা করে না, আমরাও করি।

এয়ারপোর্ট থেকে শীতল নিবাস। রাজকীয় অতিথিশালা। শাস্ত্রীজি ও শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রী ঘরদোর-বিছানা দেখে অবাক। শাস্ত্রীজি হাসতে হাসতে বিছানা দেখিয়ে নেপাল সরকারের চীফ অব প্রটোকল ঠাকুরসাহেবকে বললেন, এত মোটা গদীর ওপরে শোওয়া অভ্যাস নেই। আপনি বরং আমাদের জন্য সাধারণ বিছানার ব্যবস্থা করুন। ঠাকুরসাহেব প্রথমে আপত্তি করলেও পরমুহূর্তে বুঝলেন, এই সহজ সরল মানুষটি রাজনীতির স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণের অন্যতম নায়ক হয়েও সত্যি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন এবং তিনি সত্যি সত্যি মোটা গদী সরিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। পরে ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন, এই শীতল নিবাসে আরো অনেক ভারতীয় নেতাই থেকেছেন। কিন্তু এই ধরনের অনুরোধ আর কেউ করেননি।

রাজা মহেন্দ্রর রাণী শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করতেই শাস্ত্রীজি সবিনয়ে বললেন, আমাদের সৌভাগ্য যে আপনি ওকে আমন্ত্রণ করছেন কিন্তু আমার স্ত্রী অত্যন্ত সাধারণ মহিলা। উনি ডাইনিং টেবিলেও খান না, ছুরি-কাঁটার ব্যবহারও জানেন না। শাস্ত্রীজির এই স্বীকৃতিতে ওর বা ওর স্ত্রীর মর্যাদা কমেনি, বরং বেড়েছিল। শ্রীমতী শাস্ত্রীর সম্মানে অয়োজিত সব ভোজসভাই

সাধারণ ভারতীয়/নেপালী প্রথার মত হয়েছিল। সবাই মেঝেয় আসন পেতে বসে হাত দিয়েই খেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রীজি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাণীকে, শ্রীমতী গিরি ও অন্যান্য সবাইকে বলেছিলেন, আমার স্ত্রী ইংরেজি জানেন না, শুধু হিন্দী জানেন। শাস্ত্রীজির কথা শুনে ওরা সবাই বলেছিলেন, ইংরেজির চাইতে হিন্দীতে কথাবার্তা বলতেই আমরা বেশী অভ্যস্ত। কূটনৈতিক চালে নয়, বড় দেশের নেতা বলে দম্ভ দেখিয়েও নয়, এই সরলতা আর নিছক সাধারণ ভারতীয়ের স্বাভাবিক আচরণেই শাস্ত্রীজি নেপালের নেতা ও মানুষের মন জয় করলেন।

ওদিকে দু'দিন ধরে শাস্ত্রীজির সঙ্গে রাজা, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চলার পর ডাঃ গিরি আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। বললেন, শাস্ত্রীজির সঙ্গে ছায়ার মত মিঃ দয়াল সব জায়গায় উপস্থিত থাকছেন বলে আমরা ঠিক মন খুলে কথা বলতে পারছি না কিন্তু আমরা তো বলতে পারি না এ্যাম্বাসেডরকে নিয়ে আসবেন না।

আমি বলি, আমি কি শাস্ত্রীজিকে বলব আপনার সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলতে ?

হ্যাঁ বল। তবে আমরা আলাদা ভাবে কথা বলার খুব বেশী সময় পাব না। তাই তুমি ওকে কয়েকটা কথা বলবে।

শাস্ত্রীজিকে জানাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী ডাঃ গিরি আমাকে অনেক কথা বললেন। কোন ভুল না হয়, সেজন্য আমি প্রতিটি পয়েন্ট নোট করে নিলাম। সে-সব কথা প্রকাশ করা উচিত নয় বলেই করব না। তবে এ কথা নিশ্চয়ই সবার জানা প্রয়োজন যে ডাঃ গিরি সেদিন আমাকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এত নিবিড় যে তার তুলনা হয় না। অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিত নেপালীই ভারতে পড়াশুনা করেছেন। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ভারতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা এত কাছাকাছি যে তা বলার নয়।

আমি বললাম, তা তো বটেই।

ডাঃ গিরি একটু হেসে বললেন, যে সব সভায় আমরা হিন্দীতে বক্তৃতা করি, সে সব সভাতেও তোমাদের এ্যাম্বাসেডর ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন।

কী আশ্চর্য।

আমি জানি ভারতবর্ষের সবাই হিন্দী বলতে পারে না কিন্তু মিঃ দয়ালের মাতৃভাষাই তো হিন্দী। উনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলে কি নেপালের মানুষ ওকে বেশী শ্রদ্ধা করবে? নাকি ওকে আপন মনে করবে?

আমি কি বলব—চুপ করে থাকি।

চা খেতে খেতে কথা হয়। ডাঃ গিরি বললেন, মিঃ দয়াল সব সময় আমাদের সবার সঙ্গে এমন ভাবে কথাবার্তা বলেন যেন আমরা কেউ কিছুই বুঝি না এবং উনি আমাদের সবার চাইতে বেশী বুদ্ধিমান। এই ধরনের কোন রাষ্ট্রদূত কি কখনও অতিথি-দেশে জনপ্রিয় হতে পারেন?

শুনে আমি লজ্জিত বোধ করি, অপরাধী মনে করি। আমি মনে মনে ভাবি, এই সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের জন্যই ভারত এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশে তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

যাই হোক, ডাঃ গিরি আরো অনেক কথা বলার পর আমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববন্ধু থাপার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। উনিও রাষ্ট্রদূত দয়ালের সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। শাস্ত্রীজির নির্দেশ মত আমি একটা রিপোর্ট টাইপ করে গোপনে ওকে দিলাম। এর পর শাস্ত্রীজি নিজেই উদ্যোগী হয়ে রাষ্ট্রদূত দয়ালকে সঙ্গে না নিয়ে নেপালের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

মনে পড়ছে শাস্ত্রীজির সম্মানে রাষ্ট্রদূত দয়ালের পার্টির কথা। শাস্ত্রীজিকে নিয়ে রাষ্ট্রদূত দয়াল তাঁর বাড়িঘর, ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট ইত্যাদি দেখালেন। তারপর শাস্ত্রীজি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে অনেকের সামনেই রাষ্ট্রদূতকে বললেন, আপনাদের সবকিছু দেখে

মনেই হয় না আপনারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি।

শাস্ত্রীজির এই সফরের পরই আবার নাটকীয় ভাবে ভারত-নেপাল সম্পর্ক মধুর ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

শাস্ত্রীজি প্রধানমন্ত্রী হবার পর নেপালে কোন আই-সি-এস/আই-এফ-এস'কে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান না। তিনি নেপালে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়েছিলেন ধুতি পাঞ্জাবি পরা গান্ধীবাদী নেতা শ্রীমন নারায়ণকে।

ভারতীয় রাজনীতিতে শাস্ত্রীজির মত অমায়িক নেতা আর দেখিনি। সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যেও তিনি ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম।

নেহরু মন্ত্রীসভা গঠনের সময় একটা সুন্দর চিঠি লিখে নির্বাচিত সহকর্মীদের মন্ত্রীসভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাতেন। সে সব চিঠি পৌঁছে দিত মিলিটারী মোটরসাইকেল রাইডাররা। মন্ত্রীসভা থেকে কাউকে বাদ দিলেও নেহরু ঠিক ঐ রকমই সুন্দর চিঠি লিখতেন। সে চিঠিও ভাগ্যহীনদের বাড়ি পৌঁছে দিত মিলিটারী মোটরসাইকেল রাইডাররা। মজার কথা, চিঠিগুলো পাঠানো হত একটু বেশী রাত্রে। মনে পড়ে কী উৎকণ্ঠা নিয়েই কিছু নেতা সন্ধ্যার পর থেকেই লনে পায়চারী করতেন! মোটরসাইকেলের আওয়াজ শুনলেই তাঁরা চমকে উঠতেন অজানা বার্তার আশঙ্কায়। শাস্ত্রীজি চিঠি লিখে কাউকে মন্ত্রীসভায় যোগ দেবার অনুরোধ করেননি। তিনি নিজে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করতেন মন্ত্রীসভায় যোগ দেবার জন্য। শুধু মন্ত্রী নয়, এমন কি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারি ক্ষেত্রেও উনি এই নিয়ম মেনে চলতেন।

মনে পড়ছে ওয়েস্টার্ণ কোর্টের এক দিনের ঘটনা। হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী হাজির হতেই সবাই অবাক। রিসেপসনিস্ট ছুটে এলেন। শাস্ত্রীজি তার কাছে ললিত সেনের ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে নিজেই সে ঘরের দরজায় হাজির। দরজায় তালা দেখেই ফিরে গেলেন। কয়েক ঘন্টা পরে আবার শাস্ত্রীজি এলেন ওয়েস্টার্ণ কোর্টে। না, এবারও ললিত সেনকে পেলেন না। চলে

গেলেন। একটু পরেই ললিত সেন ফিরে এসে শুনলেন প্রধানমন্ত্রী দু'বার এসে ঘুরে গেছেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি। ওকে দেখেই শাস্ত্রীজি বললেন, একটা অনুরোধ করার জন্য তোমার ওখানে গিয়েছিলাম।

ললিত সেন বললেন, আপনি আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন?

না ললিত, তা হয় না। আমার দরকারে তোমাকে কষ্ট দেব কেন?

তাতে কি হল? বলুন, কি দরকার।

আমার কাজে তোমাকে সাহায্য করতে হবে।

নিশ্চয়ই করব।

তোমায় আমার পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি হতে হবে।

বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের বংশধর ললিত সেন একটু হেসে বললেন, আপনি যদি আমাকে এ কাজের উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে আমার কি আপত্তি? তবে এ কথা বলার জন্য আপনি কেন কষ্ট করে দু'বার ওয়েস্টার্ণ কোর্ট গিয়েছিলেন?

শাস্ত্রীজি বললেন, ললিত, আমিও ভোটে জিতে এম. পি. হয়েছি, তুমিও তাই। আজ তোমরা আমাকে প্রধানমন্ত্রী করেছ বলে কি তোমাদের আমি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করতে পারি?

জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি এই ছিল শাস্ত্রীজির মনোভাব। এম. পি-দের প্রতি এমন শ্রদ্ধার মনোভাব সত্যি দুর্লভ। শ্রীমতী গান্ধী মন্ত্রীসভার সদস্যদের চিঠিও লেখেন না, নিজে অনুরোধও জানান না এভাবে। সাধারণত ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি ধরনের কোন কর্মচারী সংশ্লিষ্টদের টেলিফোনে জানিয়ে দেন, আপনি রাষ্ট্রপতি ভবনে আসুন, শপথ নিতে হবে। রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের অনুরোধেই শ্রীমতী গান্ধী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডক্টর ত্রিগুণা সেনকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী করেন, কিন্তু ডক্টর সেন এ খবর পান প্রাইম মিনিস্টারের

সেক্রেটারি যশপাল কাপুরের কাছ থেকে। যশপাল কাপুর ওকে বেনারসে টেলিফোন করে বলেন, ডক্টর সেন, আপনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। দিল্লী চলে আসুন। শপথ নিতে হবে। টেলিফোন পেয়ে ত্রিগুণাবাবু অবাক। ভাবেন, লোকটা বলে কি? একবার ভাবলেন, কেউ ঠাট্টা করছে না তো? এ সব কথা ভাবতে না ভাবতেই কাশীর লোকজন মালা নিয়ে হাজির। কী ব্যাপার? রেডিওতে বলল, আপনি সেন্ট্রাল মিনিস্টার হয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বারানসীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে সেলাম করে বাড়ির দরজায় সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করলেন। ত্রিগুণাবাবু স্বীকৃতি না জানালেও মালা, অভিনন্দন আর রাইফেলধারীদের সেলামের ঠেলায় পরদিনই দিল্লী ছুটতে বাধ্য হলেন। শ্রীমতী গান্ধী এই ভাবেই মন্ত্রী নিয়োগ করেন।

ললিত সেন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি হলেও শাস্ত্রীজি ওকে যেমন বিশ্বাস করতেন তেমনি ভালবাসতেন। প্রধানমন্ত্রীর বহু গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব বহন করতে হত ললিত সেনকে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা না লিখে পারছি না।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করা সত্ত্বেও শাস্ত্রীজি কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সারা দেশের কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুর পর শাস্ত্রীই একমাত্র শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন যার সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাই দেশের নানা প্রান্তের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভিতরের খবর ও কর্মীদের মনোভাব শাস্ত্রীজি খুব ভাল করেই জানতেন। তাইতো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলিকে কয়েকজন সুবেদারের নিজস্ব জমিদারীতে পরিণত করা হয়েছে এবং এই সব নেতাদের জমিদারী মনোবৃত্তি ও পরিচালনা পদ্ধতির জন্যই কংগ্রেস দিনে দিনে দুর্বল হয়ে উঠেছে।

নেহরু নিজেও এই সব প্রাদেশিক কংগ্রেসী সুবেদারদের দেখতে পারতেন না এবং নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে এই সব নেতাদের নিজের কাছে ঘেষতে দিতেন না। বেশ কয়েক বছর প্রতি দিন প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান তিনমূর্তি ভবনে গেছি কিন্তু মনে পড়ে না কামরাজ, বিজু পটনায়ক বা অন্য দু-একজন ছাড়া অন্য কোন প্রাদেশিক নেতাকে নেহরুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ বা ডিনার খেতে দেখেছি। নেহরুর বাড়িতে নানা ধরনের উৎসব হত কিন্তু সে-সব উৎসবে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও কৃষ্ণমেনন ছাড়া অন্য কোন কংগ্রেস নেতাকে আমন্ত্রিত হতে দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। কংগ্রেসের এই সব প্রাদেশিক সুবেদারদের নেহরু ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ না করলেও প্রাদেশিক কংগ্রেসের ওপর তাদের প্রভুত্ব ঠিকই বজায় ছিল। কারণ নেহরু এই সব নেতাদের থেকে এত ওপরের, এত জনপ্রিয় ও সর্বোপরি এত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন যে তিনি ওদের মত সুবেদারদের উপেক্ষা করেও স্বচ্ছন্দে প্রধানমন্ত্রী থাকতে পেরেছেন। শাস্ত্রীজি প্রধানমন্ত্রী হবার অনেক আগেই বুঝেছিলেন, এই সব প্রাদেশিক সুবেদারদের হঠাতে না পারলে আপামর সাধারণকে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে না। তাছাড়া এই সব সুবেদাররা নিজেদের গদী ঠিক রাখার জন্য বহু নিষ্ঠাবান কংগ্রেসীকে মণ্ডল বা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভ্য হবার সুযোগ দেন না এবং নতুন সদস্য করার ব্যাপারে এই সব সুবেদাররা বহু রকমের দুর্নীতির প্রশ্রয় নেন। সর্বোপরি শাস্ত্রীজি জানতেন এই সব প্রাদেশিক নেতারা কংগ্রেসের নামে অর্থ সংগ্রহ করে নিজের ও নিজের গোষ্ঠীর জন্য ব্যয় করেন। আর? আর জানতেন এই সব নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পপতি ও ব্যবসাদারদের অর্থে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য শাস্ত্রীজি উপযুক্ত সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পর শাস্ত্রীজি মনে করলেন, সে সুযোগ ও সময় সমাগত।

আজ ভাবলে অবাক লাগে যে অজয় মুখার্জীর বিদ্রোহের বহু

আগেই লালবাহাদুর শাস্ত্রী বুঝেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে এমন দুর্নীতি ঢুকেছে যে তার প্রতিকার না করলে কংগ্রেসকে বাঁচানো যাবে না। তাই তো তিনি ললিত সেনের মারফত অজয় মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও বিয়াল্লিশের আন্দোলনের অনন্য যোদ্ধা সতীশ সামন্ত এম. পি. কে খবর দিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে বলবন্তরাও মেটার রিপোর্ট বহু কাল ধামাচাপা পড়ে আছে। প্রাদেশিক নেতাদের বিরুদ্ধে আরো অনেক অভিযোগ আছে। আপনারা সে সব রিপোর্ট ও খবরের উল্লেখ করে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে স্মারকলিপি পেশ করুন। দু-চারজন ও তাদের কিছু মোসাহেবদের স্বার্থরক্ষার জন্য হাজার হাজার নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী কংগ্রেস থেকে দূরে চলে যাবেন, তা হতেই পারে না। অজয়বাবুর এক প্রতিনিধিকে শাস্ত্রীজি নিজেও বলে-ছিলেন, আনফরচুনেট্‌লি পণ্ডিতজী টলারেটেড দ্য ম্যানেজিং এজেণ্টস অব পি. সি. সি'স এ্যাজ হি ওয়াজ টু গ্রেট টু বী এ্যাফেকটেড্ বাই দেম—কিন্তু আমার কাছে কয়েকজন মুষ্টিমেয় নেতার গদীরক্ষার চাইতে লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কর্মীর স্বার্থরক্ষাই বড় কাজ।

নেপথ্যে যখন কাজকর্ম শুরু হল তার পর পরই ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব শুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীজি মারা গেলেন। সেদিনের এই নেপথ্য কাহিনীর খবর যারা রাখেন তারা নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন শাস্ত্রীজি বেঁচে থাকলে কংগ্রেসের ও ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রকম হত। কংগ্রেসের এই প্রাদেশিক সুবেদারদের খতম করার জন্যই শ্রীমতী গান্ধী নতুন কংগ্রেস গড়ে তোলেন। কংগ্রেসকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে অনেকের অনেক অভিযোগ। তাঁর কর্মধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায় যে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সুবেদারদের কৃপায় কংগ্রেস এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিল যে সার্জিক্যাল অপারেশন না করে শ্রীমতী গান্ধীর উপায় ছিল না।

* মিডমিডে পিদিম আর মিড়মিড়ে বউয়ের মত আদর্শহীন,

ব্যক্তিত্বহীন মানুষ আমি কোন কালেই পছন্দ করি না। হৃদয় ঐশ্বর্য সবার থাকে না, থাকতে পারে না, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্য কেন থাকবে না? যে দু'হাত বাড়িয়ে মানুষকে বুকে টেনে নিতে পারে না, যে হাসতে পারে না, খেলতে পারে না, বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারে না, দু'চোখ ভরে আকাশ দেখতে পারে না, তাদের আমি কোন কালেই ভালবাসতে পারি না। শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা।

অল্প বয়সে খবরের কাগজের রিপোর্টার হই। তখন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকেই কম-বেশি অসাধারণ মনে করতাম। অনভিজ্ঞ বলে শ্রদ্ধাও করতাম বহু জনকে। আস্তে আস্তে আমি উপলব্ধি করলাম, সব নেতাই বুদ্ধিমান না এবং নেতাদের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, হৃদয় ঐশ্বর্য প্রায় দুর্লভ। ছলে-বলে-কলে-কৌশলেই নেতৃত্বের আসন দখল করতে হয়।

বোধ হয় এটাই নিয়ম, কিন্তু ব্যতিক্রম হয় বৈকি। যেমন কৃষ্ণমেনন।

ছোটবেলায় বা কৈশোরে খবরের কাগজের পাতায় কোন দিন কৃষ্ণমেননের নাম দেখিনি। দেশ স্বাধীন হবার পর ব্রিটেনে প্রথম ভারতীয় হাই কমিশনার রূপে কৃষ্ণমেননের নাম কাগজের পাতায় ছাপা হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই 'জীপ স্ক্যাণ্ডাল'-এর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে পড়ে।

তখন মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত ছিল। নোট বই পেন্সিল নিয়ে হাজরা পার্ক, ওয়েলিংটন স্কোয়ার বা রাইটার্স—লালবাজার গিয়েই মনে করতাম সূর্যের চাইতে প্রদীপের আলো বেশি। তাই কৃষ্ণমেননের বিরুদ্ধে হঠাৎ এতগুলি মানুষ কেন সোচ্চার হয়ে উঠল বুঝতে পারিনি। অল্প বুদ্ধি ভয়ঙ্করী বলে মনে মনে ভেবে নিলাম, পশ্চিমবাংলার একদল অসৎ কংগ্রেসীর মত কৃষ্ণমেননও চোর, অসৎ।

পরে জেনেছি, বুঝেছি, যারা 'চোর চোর' বলে চিৎকার করেছিল, তারা অনেকেই অসৎ, কৃষ্ণমেনন না। আজ মনে পড়ছে ১৯৬২ সালের সেই সর্বনাশা দিনের কথা। চীনের হাতে ভারত নিদারুণ

ভাবে অপদস্থ। কংগ্রেসের সমস্ত দক্ষিণপন্থী নেতারা কৃষ্ণমেননকে চিরদিনের মত শেষ করে দেবার নেশায় মশগুল। দেশের মানুষও ক্ষেপে উঠেছে। নেহরু নিরুপায় হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কৃষ্ণমেননের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন। সমালোচকদের খুশি করার জন্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ইস্তাহার বেরুল। ভারতবর্ষের সেই মহাদুর্দিনে দক্ষিণপন্থী নেতারা মেতে উঠলেন বিজয়োৎসবে।

মন খুবই খারাপ। সারাদিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। ছোটাছুটিও করেছি অনেকবার পার্লামেন্ট হাউস আর সাউথ ব্লকের মধ্যে। খবর-টবর পাঠিয়ে দেবার পর বাড়ি ফেরার পথে গেলাম কৃষ্ণমেননের ওখানে।

সামনের অফিস ঘরে এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি মহাবীর কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত। আমি ওকে বললাম, খবর দাও, আমি এসেছি।

কৃষ্ণমেননের মানসিক অবস্থা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ছিল না। তাই মহাবীর টেলিফোনের বাজার বাজিয়ে তাঁকে আমার আসার কথা বলতে সাহস করল না। বলল, আজ আমাকে খবর দিতে বলবেন না। আপনি চলে যান।

জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে আর কেউ আছে ?

না না, কেউ নেই। মহাবীর একটু হেসে বলল, আজ আর কে আসবে ?

ভিতরের বারান্দায় মেননের কুক-কাম-ভ্যালেট-কাম-পার্সোন্যাল সেক্রেটারি-কাম পার্সোন্যাল ড্রাইভার রমজানকে বললাম, সাহেবকে বল, আমি এসেছি।

না, রমজানও সেদিন ভয়ে ওর ঘরে ঢুকতে সাহস করল না। কী করব ? কোন খবর না দিয়েই আমি ওর ঘরে ঢুকলাম।

আমি বসলাম। মেনন একবার মুখ তুলে আমাকে দেখলেন কিন্তু কিছু বললেন না। দশ-পনেরো মিনিট পরে উনি জিজ্ঞেস

করলেন, হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম ?

আমি বললাম, হোয়াই সুড আই নট কাম ?

দু-চার মিনিট চুপ করে থাকার পর উনি বললেন, উড ইউ ডু মী এ ফেভার ?

আমি কৃষ্ণমেননকে ফেভার করব ? অবাক হলেও বললাম. বলুন কি করতে হবে।

মেনন গম্ভীর হয়ে বললেন, বোম্বেতে একটা ট্রাংকল করব। ব্যাঙ্কে টাকা না থাকলে তুমি বিলটা পেমেণ্ট করে দেবে ?

আমি ওঁর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে বলি, নিশ্চয়ই দেব।

মেনন সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে মহাবীরকে বললেন, বোম্বের কলটা বুক কর। যদি ব্যাঙ্কে টাকা না থাকে তাহলে ভট্টাচারিয়া পেমেণ্ট করে দেবে।

সাতচল্লিশ থেকে বাষট্টি। দীর্ঘ পনেরো বছর। লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশার, রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতীয় দলের নেতা ও সব শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেই লোকের ব্যাঙ্কে একটা ট্রাংকলের বিল দেবার টাকা আছে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ ? তাছাড়া দু-এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত আমি সিগন্যালসের লাইনে বিনা পয়সায় মুহূর্তের মধ্যে প্রায় সর্বত্র টেলিফোন করতে পারতেন এবং হয়তো তখনও করতে পারতেন, সেই মেনন সাধারণ নাগরিকের মত ট্রাংকল বুক করবেন ?

এই সততা ক'জন নেতার আছে ? মন্ত্রিত্ব চলে যায়, নেতৃত্ব চলে যায়, তবু তাদের সংসার চলে রাজসিক চালে। তবু তারা গাড়ি চড়েন, প্লেনে ওড়েন। কিন্তু এর জন্য তাদের চাকরি করতে হয় না, ব্যবসা করতে হয় না। মাঠে-ময়দানের বক্তৃতা শুনে মনে হয়, এরা কোন শিল্পপতির দালালিও করেন না। তবে কী এরা ম্যাজিসিয়ান ? তা না হলে এরা টাকা পান কোথায় ? এককালে এই সব শা—রাই বলেছে কৃষ্ণমেনন চোর। চমৎকার !

সেদিন মেনন আমাকে যে দুটি কথা বলেছিলেন, তা আমি

জীবনেও ভুলব না। উনি বলেছিলেন, ভট্টাচারিয়া, তুমি আমার জন্য কিছুই করলে না কিন্তু ইচ্ছা করলে কিছু করতে পারতে। তবু বলব, তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমি খুশি। তোমাকে আমি ভালবাসি।

আমি চুপ করে ওঁর কথা শুনি। এবার উনি বললেন, তোমাকে দুটো কথা বলছি। মনে রেখো।

বলুন।

মেনন একটু হেসে বললেন, রিমেমবার, নোবডি এভার কিকস্ এ ডেড ডগ! এ্যাণ্ড? এ গ্রেট ম্যান ইজ নোন বাই দি নাম্বার অফ হিজ এনিমিজ!

এত বড় সত্যি কথা খুব কম লোকের মুখেই শুনেছি!

দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করলেও কোন একটা বিখ্যাত সংবাদপত্রে চাকরি করে ধাপে ধাপে ওপরে উঠে খ্যাতি-যশ-অর্থ লাভ করার সুযোগ আমার হয়নি। সাংবাদিক হিসেবে এটা আমার ব্যর্থতা, কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ নানা প্রদেশের নানা ভাষার নানা ধরণের পত্রিকায় কাজ করেও আমি এমন সৌভাগ্য লাভ করেছি, তা বহু বিখ্যাত পত্রিকার স্বনামখ্যাত সাংবাদিকদেরও স্বপ্নাতীত। এই সৌভাগ্যের একটা অংশ হল বহু যশস্বী ও অসামান্য ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ। এদেরই একজন হলেন বহু বিতর্কিত কৃষ্ণ মেনন।

কলকাতায় দশ বছর রিপোর্টারী করার পরও বহু রথী-মহারথী সাংবাদিককে তৈল মর্দন করা সত্ত্বেও একশো পঁচিশ টাকার চাকরি জুটল না। এক হিন্দী পত্রিকার শেঠজী সম্পাদক নিজের খ্যাতি দিল্লীর দরবারে পৌঁছে দেবার লোভে একটা ইংরেজি সাপ্তাহিক বের করলেন। ওর ঐ হিন্দী দৈনিক আর ইংরেজি সাপ্তাহিকের একশো টাকা মাইনের বিশেষ সংবাদদাতা হয়েই পাড়ি দিলাম দিল্লী ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করার দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে।

দিল্লীতে পৌঁছবার ছ'দিন পরেই শেঠজী সম্পাদক ফরমায়েস করলেন, তিনমূর্তি ভবন থেকে শুরু করে সব বিখ্যাত নেতাদের ফিচার ও ছবি চাই। এই ফরমায়েসের তাগিদেই ঐ ইংরেজি সাপ্তাহিকে ফিচার লিখলাম কৃষ্ণ মেননকে নিয়ে। ছাপা হবার পর দু'কপি কাগজও পাঠিয়ে দিলাম।

এর দু'এক মাস পরেই এ-আই-সি-সি'র অধিবেশন হল সপ্রু হাউসে। লাউঞ্জে হঠাৎ কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। আমি কিছু বলার আগেই উনি বললেন, আর ইউ দ্যাট হোপলেস বেঙ্গলী জার্ণালিষ্ট?

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, হোয়াট ডু ইউ মীন?

তুমিই তো আমাকে নিয়ে সেই নোংরা লেখাটা লিখেছিলে?

আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললাম, হ্যাঁ।

উনি সঙ্গে সঙ্গে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, এসো, চা খাই।

চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন, কে তোমাকে বলল আমি বুদ্ধিমতী সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্য পছন্দ করি?

আমি হাসতে হাসতে জবাব দিই, বুদ্ধিমতী সুন্দরীরাই বলেছেন।

আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই অবাক হয়ে ভাবি, এই মানুষটিরই ১৭ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুদ্ধাবসান হয় রক্তাক্ত কোরিয়ায় এবং এই প্রস্তাবের জন্যই চীন প্রথম আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। এই সেই কৃষ্ণমেনন, যাঁর সম্পর্কে স্যার এ্যান্থনি ইডেন হাউস অব কমন্সে বলেছিলেন, আই স্যুড এ্যাড এ ট্রিবিউট টু ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড কৃষ্ণ মেনন ইন পার্টিকুলার ফর দ্য স্টেট্সম্যান-শিপ। এই সেই মানুষ যাকে ইউনাইটেড নেশন্স-এর জেনারেল এ্যাসেমব্লীতে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিলেন আমেরিকান ডীন এচিসন? আরো কত কথা মনে পড়ে।

হঠাৎ কৃষ্ণ মেনন গম্ভীর হয়ে আমার কানে কানে বললেন, ডোণ্ট ইউ থিংক মোস্ট ডেলিগেট্স আর টকিং ননসেন্স?

ওর কথায় হাসি। অবাকও হই। বলি, আপনারাই তো

ডেলিগেট ঠিক করেন।

না না, কখনই না। প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষুদে মোগল সম্রাটরাই ওদের পাঠায়। মোস্ট অব দিজ ডেলিগেট্‌স আর এ্যাজ ইডিয়ট্‌স এ্যাজ দেয়ার মাস্টার্স।

আমাকে কোন কথা বলতে দেবার সুযোগ না দিয়েই আবার বলেন, এই ডেলিগেটদের মধ্যে ক'জন পণ্ডিতজীর কথা বোঝে তা আঙুলে গুণে বলা যায়। এরা পণ্ডিতজীর বক্তৃতার পর হাততালি দেবে কিন্তু সুযোগ পেলেই পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে ভোট দেবে।

বোম্বের রমেশ সঙ্গভিকে এগিয়ে আসতে দেখেই কৃষ্ণ মেনন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ কেন এত আপন ভেবে আমার সঙ্গে এত কথা বললেন, তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মানুষটাকে ভাল না বেসে পারলাম না। এ-আই-সি-সি অধিবেশনের পর দু'এক মাস কৃষ্ণমেননের সঙ্গে আমার দেখা হল না।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সাত সকালে উঠে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছি। খাবার জন্য তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেই দেখি, সামনেই পুলিশের একটা বেতার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অনুমান করলাম, কোন কাজে আশেপাশের বাড়িতে এসেছে। সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকতেই সুন্দরী বলল, ওয়ারলেস ভ্যানের ইন্সপেক্টর তোমাকে খুঁজছেন। আমাকে? শুনেই আমি অবাক। মনে মনে ভাবি, কী এমন গুরুতর অন্যায় করলাম যে পুলিশের বেতার গাড়ি নিয়ে পুলিশ আমার কাছে ছুটে এসেছে। এ সব কথা বেশীক্ষণ ভাবার অবকাশ পেলাম না। ইন্সপেক্টর আমার ঘরের সামনে হাজির হয়ে আমাকে একটা স্যালুট করে বললেন, স্যার, ডিফেন্স মিনিস্টার আপনার এখানে আসছেন বলে আমরা এসেছি।

ইন্সপেক্টরের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। বলি, কিন্তু আমি তো ওঁকে আসতে বলিনি।

ইন্সপেক্টর সবিনয়ে বললেন, স্যার তা তো আমি জানি না। তবে

উনি আসছেন বলেই আমাদের এখানে থাকতে বলা হয়েছে।

উনি কখন আসবেন ?

ঠিক কখন আসবেন, তা আমাদের জানানো হয়নি। বলা হয়েছে, উনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত এখানে থাকতে।

তখনও আমার টেলিফোন আসেনি। কাছের পোস্ট অফিস থেকে দু'আনা দিয়ে টেলিফোন করলাম ডিফেন্স মিনিস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারি রমেশ ভাণ্ডারীকে। (এই রমেশ ভাণ্ডারীই এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যতম সচিব।) পুলিশের বেতার গাড়ির কথা বলতেই উনি বললেন, হ্যাঁ, ডি. এম. তোমার বাড়ি যাবেন।

কিন্তু আমি তো ওকে নেমন্তন্ন করিনি ?

ছাট ইজ বিটুইন ইউ এ্যাণ্ড হিম। আমি শুধু বলতে পারি, মিঃ মেনন তোমার বাড়ি যাবেন।

কখন আসবেন ?

পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত ওর অফিসে থাকতেই হবে। পাঁচটা-সওয়া পাঁচটার আগে উনি তোমার ওখানে পৌঁছতে পারবেন না।

অপ্রত্যাশিত অতিথির আপ্যায়ণের জন্য সামান্য কিছু ব্যবস্থা করতে না করতেই কৃষ্ণ মেননের গাড়ি এসে থামল আমার বাড়ির সামনে। উনি একা না, সঙ্গে এসেছেন আরো তিনজনকে—শ্রীমতী রেণুকা রায়, এম. পি. শ্রীরামেশ্বর সাহু, এম. পি. ও বিখ্যাত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টটেন্ট শ্রীরামেশ্বর ঠাকুর।

(বিহার থেকে নির্বাচিত শ্রীসাহু পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী হন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও জয়প্রকাশ নারায়ণ শ্রীঠাকুরকে খুবই স্নেহ করতেন। জয়প্রকাশের PRISON DIARYতে বার বার এর কথা লেখা আছে।) পাঁচ-দশ মিনিট নয়, প্রায় ঘণ্টাখানেক আমাদের সবার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব করে কৃষ্ণ মেনন বিদায় নিলেন। গাড়িতে ওঠার আগে আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, দেখতে এলাম তুমি একশো টাকায় কী করে সংসার চালাও।

আমি অবাক বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকাতেই উনি আবার বললেন,

পণ্ডিতজীর কাছে শুনছিলাম তুমি নাকি একশো টাকা মাইনে পাও।

কৃষ্ণ মেনন গাড়িতে উঠতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। আমি নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কৃষ্ণ মেননকে শুধু আমার ভাল লাগল না, আমাকেও উনি ভালবাসলেন। গভীর ভাবে ভালবাসলেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করে নিলেন আমাকে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন কূটনীতিবিদ ও নেহরুর পরম আস্থাভাজন ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী হঠাৎ আমার মত একজন সাধারণ সাংবাদিককে এত ঘনিষ্ঠ করে নেবার জন্য আমি শুধু মুগ্ধ না, বিস্মিতও হই। একদিন কথায় কথায় ফিরোজ গান্ধীকে বললাম। শুনে উনি হাসলেন। বললেন, হি ইজ এ ম্যান অব এক্সট্রিম লাইক্স এ্যাণ্ড ডিসলাইক্স এবং তাও প্রথম দর্শনে, প্রথম পরিচয়ে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। এ্যানি বেসান্ত, হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও পণ্ডিতজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই মেনন ওদের শ্রদ্ধা করতে শুরু করেন। যাকে প্রথম পরিচয়ে ভাল লাগবে না, তার যত গুণই থাক, তাকে উনি সারা জীবনেও সহ্য করতে পারেন না।

আমি বলি, এই নীতি মেনে চলা কী কোন পলিটিসিয়ানের পক্ষে সম্ভব ?

কে বলল মেনন পলিটিসিয়ান ? হি ইজ এ ডিপ্লোম্যাট পার এক্সেলেন্স, এ ড্রিমার, এ ওয়ার্কার। সর্বোপরি মেনন একজন ইনটেলেকচুয়াল।

সত্যি মেনন সাধারণ অর্থে পলিটিসিয়ান ছিলেন না। পলিটিসিয়ান —বিশেষ করে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা দিবারাত্রি মিথ্যা কথা বলে মানুষকে নিজের দলে টানার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ মেননকে কোন দিন এ কাজ করতে দেখিনি। কিছু মানুষকে বা কোন দেশকে নিছক খুশি করবার জন্য মেননকে কোন দিনই কোন কথা বলতে শুনিনি। বরং নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করে বলার জন্য অপ্রিয় কথা বলতেও

উনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে।

কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে জেনেভা এয়ারপোর্টে নামতেই দেখি, সংবাদপত্র, রেডিও ও টি. ভি-র বহু সাংবাদিক ওর জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রথমে দুটো-একটা টিকা-টিপ্পনী, হাসি-ঠাট্টা। শেষ পর্যন্ত শুরু হল সাংবাদিক সম্মেলন। বহু বিষয়ে বহু প্রশ্ন। মুহূর্তের মধ্যে জবাব। আমি সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করছি না কিন্তু মেননের পিছনে বসে সবকিছু উপভোগ করছি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন শুধু কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নেরই আণবিক-পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। এশিয়ার একটা বিশেষ দেশের সাংবাদিক হঠাৎ মেননকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কী মনে করেন আণবিক বা পারমাণবিক অস্ত্র শুধু আমেরিকা ও ইউরোপের কিছু দেশের একচেটিয়া অধিকার?

মেনন জানতেন ঐ সাংবাদিকটির দেশও আণবিক অস্ত্র তৈরির ব্যাপারে গোপনে গোপনে কাজ করছে এবং ভারত কোন কারণেই আণবিক অস্ত্র বানাবে না। তাই মেনন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, No, never. Only American and European countries can't have monopoly over prostitution. There must be prostitutes from your country to break their monopoly.

হাসিতে ফেটে পড়লেন দুনিয়ার সাংবাদিকরা, মুখ চুন করে মাথা হেঁট করে বসে রইলেন ঐ সাংবাদিক।

কৃষ্ণ মেননের কথাবার্তার ধরণই ছিল এই রকম। যেমন বুদ্ধি, তেমনি পাণ্ডিত্য। সেই সঙ্গে বিতর্ক করার অসাধারণ ক্ষমতা। পেঙ্গুইনের অন্যতম প্রথম সম্পাদক, কোরিয়া ও ইন্দো-চায়না সমস্যা সমাধানের প্রধান ব্যক্তি, স্বাধীন সার্বভৌম সাইপ্রাসের স্রষ্টা কৃষ্ণ মেনন সত্যি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। সাইপ্রাসের কথা বলতেই মনে পড়ে কত কি।

সাইপ্রাস তখন সারা দুনিয়ার সংবাদপত্রের শিরোনাম। বিশ্বের

নানা রাজধানীতে সাইপ্রাসের ভবিষ্যত নিয়ে নিত্য আলোচনা। ইউনাইটেড নেশনস্-এ বিতর্ক হয় কিন্তু তুরস্ক ও গ্রীসের পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের জন্য সমস্যার সমাধান হয় না। গ্রীস বলে, যে দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রীক বংশোদ্ভুত, সে দেশে আমাদের অধিকার চাই। পাল্টা দাবী করে তুরস্ক—সাইপ্রাস তো আমাদেরই অটোম্যান সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। সুতরাং সাইপ্রাসে আমাদেরই আধিপত্য থাকতে হবে। সমাধান? দেশকে দু' টুকরো কর।

না, তা হতে পারে না। রাষ্ট্রপুঞ্জে গর্জে উঠলেন কৃষ্ণমেনন। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই দেশ গড়ে ওঠে, সে দেশের মানুষ অতীতে কোন্ দেশের লোক ছিল, তা কোন বিবেচনার বিষয় নয়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে যেখানে অন্য দেশের মানুষ এসে দীর্ঘকাল ধরে বাস করে না? দশ দেশের মানুষ নিয়েই প্রতিটি দেশ গড়ে উঠেছে কিন্তু তাই বলে কোন দেশকেই দশ ভাগে ভাগ করা হয় না। গ্রীক বা তুরস্ক—যে দেশের মানুষই হোক, যারা সাইপ্রাসে বাস করে তারাই সাইপ্রাসের অধিবাসী। নাগরিক। সাইপ্রাস দ্বিখণ্ডিত হতে পারে না—হবে না। স্বাধীন সার্বভৌম সাইপ্রাসের জন্মই সব সমস্যার সমাধান করবে।

ভারতের প্রতিনিধি ও নেহরুর দূত কৃষ্ণমেননের এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই জন্ম নিল সাইপ্রাস। ভূমধ্যসাগরের কোলে অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই দেশ প্রতিষ্ঠিত হল বিপ্লবী ম্যাকারিয়সের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম সাইপ্রাস সরকার। মনে পড়ছে প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিয়সের কথা। প্রথম গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মেলন কভার করার জন্য আমি চলেছি বেলগ্রেড। গভীর রাতে দিল্লী থেকে বেইরুট পৌঁছলাম বি-ও-এ-সি প্লেনে। এক দিন ওখানে কাটিয়ে ব্রিটিশ ইউরোপীয়ন এয়ারওয়েজের প্লেনে রওনা হলাম গ্রীসের রাজধানী এথেন্স। মাঝপথে বিমানটি অপ্রত্যাশিতভাবে নামল সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোশিয়ায়। আরো বেশি অবাক হলাম রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সকে আমাদের প্লেনেরই যাত্রী হতে দেখে।

নিকোশিয়া থেকে প্লেন টেক অফ করার পরই প্রথমে এয়ার-হোস্টেস, পরে ক্যাপ্টেনের মারফত প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারির কাছে আমার ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে অনুরোধ জানালাম, রাষ্ট্রপতির দর্শন চাই। কয়েক মিনিট পরেই তদানীন্তন বিদেশ মন্ত্রী ও বর্তমানের রাষ্ট্রপতি কিপ্রিয়ানউ এসে জানালেন, হাতের কাজ শেষ হলেই প্রেসিডেন্ট আপনাকে ডেকে পাঠাবেন।

হ্যাঁ, কয়েক মিনিট পরেই খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক ও বিপ্লবী বীরের দেখা পেলাম। পৃথিবীর বহু দেশের বহু নেতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ মাকারিয়সের কাছে যে সম্মান, যে ভালবাসা, যে আন্তরিকতা পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। কারণ? আমি ভারতীয়। আমি কৃষ্ণ মেনন ও নেহরুর দেশের মানুষ। ম্যাকারিয়স বারবার আমাকে বললেন, নেহরুর সদিচ্ছা আর রাষ্ট্রপুঞ্জে কৃষ্ণমেননের অবিস্মরণীয় বক্তৃতার জন্যই সাইপ্রাস আজ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। আমাদের দেশের দীনতম দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষও জানে নেহরু আর কৃষ্ণ মেননের জন্যই সাইপ্রাস দু' টুকরো হয়নি। তাইতো এই দুজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার ছবি আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে পাওয়া যাবে।

বেলগ্রেডে গিয়ে ম্যাকারিয়স নেহরুকে আমার কথা বলেছিলেন। কী দারুণ খুশি হয়েছিলেন নেহরু। আর কৃষ্ণ মেননকে আমিই বলেছিলাম ম্যাকারিয়সের কথা। উনি স্বভাবসিদ্ধভাবে একটু হেসে আমার কানে ফিস ফিস করে বলেছিলেন, বাট আই কুড নট ডু এনিথিং টু স্টপ দ্য পার্টিশান অব মাই ওন কাণ্ট্রি!

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। এ কথা আজ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত যে লর্ড মাউণ্টব্যাটনের চক্রান্ত, লেডি মাউণ্টব্যাটনের রূপ ও মাধুর্য এবং সর্বোপরি জিন্নার কূটনৈতিক বুদ্ধির কাছে সমস্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আত্মসমর্পণ করেন বা করতে বাধ্য হন বলেই ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়। যে মানুষটি কোরিয়া-ইন্দোচীন-সাইপ্রাস ইত্যাদি জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করেছেন,

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল হ্যামারশিল্ডের ব্যর্থতার পরও যিনি চীনে বন্দী আমেরিকান বৈমানিকদের মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেন, তিনি কী জিন্না বা মাউন্টব্যাটনের কূটনৈতিক চালে হেরে যেতেন? বোধ হয় না। যিনি ভিসিনেস্কি-মলোটভ, ডালেস, চু-এন-লাই, ম্যাকমিলন, এ্যান্থনি ইডেন, নাসের, সোয়েকর্ণ, নক্রমা, উ নূ প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য নেতাদের সঙ্গে সমান তালে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে অনন্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁকে কী পেট মোটা-মাথা মোটা কংগ্রেসীরা সহ্য করতে পারেন। না, কখনই না। তাইতো মেনন অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাদের কাছে এত অপ্রিয় ছিলেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমরা অত্যন্ত রক্ষণশীল জাতি। রান্নাঘর থেকে শুরু করে পার্লামেণ্ট পর্যন্ত এই রক্ষণশীলতার ছাপ। আমাদের চরিত্রে এই রক্ষণশীলতার সঙ্গে মিশে আছে ভণ্ডামী আর লোকভয়। শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, পারিবারিক সামাজিক গণ্ডী পেরিয়ে রাজনৈতিক দুনিয়ায়ও এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। কৃষ্ণমেনন ব্যতিক্রম ছিলেন বলেই তাঁকে নিয়ে বার বার ঝড় উঠেছে।

সত্যি কথা বলতে কৃষ্ণ মেননই প্রকৃত অর্থে প্রথম দেশরক্ষা মন্ত্রী। সর্দার বলদেব সিং যখন দেশরক্ষা মন্ত্রী তখনই প্রথম কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয় কিন্তু তখন দেশরক্ষার ব্যাপারে নেহরু ও প্যাটেল ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। কৈলাসনাথ কাটজু কোন মতে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে ছিলেন। মহাবীর ত্যাগী সৈন্যবাহিনীতে হিন্দী চালু করেন। এ ছাড়া ইনি একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রকল্প (HAL) গ্রহণ করেন। প্রকল্পটি খুবই জরুরী ছিল এবং পরবর্তীকালের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে যথেষ্ট সাহায্য করে। মহাবীর ত্যাগীর অবদান এখানেই শেষ।

এলেন কৃষ্ণ মেনন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে যে সব অস্ত্রশস্ত্র আছে তা আধুনিক দেশগুলির যাদুঘরের উপকরণ। সর্বাধুনিক অস্ত্র

চাই। কোথায়? পশ্চিমী দুনিয়ার গোটাকয়েক দেশের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে? না, কখনই না। আমরা কিনব নানা দেশ থেকে। আর? অবশ্য প্রয়োজনীয় সব কিছু আমরাই তৈরি করব। কৃষ্ণ মেননের এই সিদ্ধান্তে জ্বলে উঠল পশ্চিমী দুনিয়া, ঝড় উঠল স্বার্থবাদী ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে। ক্ষেপে উঠলেন গান্ধীবাদী কৃপালনীর দল।

কারণ ছিল অনেক। পশ্চিমী দুনিয়ার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর গোপনতম খবরও বিনা ক্লেশে পৌঁছে যেত ওদের কাছে। সেখান থেকে ভারত-বিরোধী দেশগুলিতে। তাছাড়া শত শত কোটি টাকার নিশ্চিত ব্যবসা হাতছাড়া হবার জন্যও পশ্চিমী দুনিয়া ক্ষেপে উঠল।

ভারতবর্ষে গান্ধীবাদীরা ক্ষেপে উঠলেন এই জন্য যে, গান্ধীর দেশ দেশরক্ষার জন্য কেন এত ব্যয় করবে? ভারত যখন কোন দেশকে আক্রমণ করতে চায় না। তখন এই গোলা-গুলি—ট্যাঙ্ক—যুদ্ধ বিমান তৈরির দরকার কী? মুখর হয়ে উঠলেন সৈন্যবাহিনীর কিছু প্রবীণ অফিসারও। স্যাণ্ডহার্স্ট'র এই সব ভূতপূর্ব ছাত্ররা সাহস করে বলতে পারলেন না, আমরা পশ্চিমের পূজারী। আমাদের জীবন-দর্শনের সঙ্গে ওরা এমন মিলেমিশে আছে যে নিজের দেশ বা অন্য কোন দেশের অস্ত্র ব্যবহার করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। ওরা বললেন, এতে ট্রেনিংয়ের অসুবিধা হবে। তাছাড়া পশ্চিমী দেশগুলির অস্ত্রশস্ত্রই সবচাইতে ভাল।

কৃষ্ণ মেনন বললেন, যুদ্ধের সময় পশ্চিমী দেশগুলি আমাদের সৈন্যবাহিনীর অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না দিলেই বিপদে পড়ব এবং সব সময় ওদের কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকলে ভারত স্বাধীনভাবে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে পারবে না। গান্ধীবাদী সমালোচকদের মেনন বললেন, আমরা কোন দেশ আক্রমণ করতে চাই না ঠিকই, কিন্তু অন্য দেশ যে আমাদের কোন কালেই আক্রমণ করবে না, এ কথা কে বলতে পারে? তাই পৃথিবীর বহু শান্তিকামী

দেশের মত ভারতেরও সৈন্যবাহিনী চাই এবং সে সৈন্যবাহিনী যাতে সঠিকভাবে কর্তব্য পালন করতে পারে তার সব ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি কেনাকাটার ব্যাপারে কৃষ্ণ মেননের বিকেন্দ্রীকরণের নীতিকে দক্ষিণপন্থীরা ব্যাখা করলেন, মেনন রাশিয়ার কাছে ভারতকে বিক্রী করছে। একদল স্বার্থপর বুদ্ধিহীন দক্ষিণপন্থী ভুলে গেলেন যে কোরীয় সঙ্কটের সময় রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়ার প্রতিনিধি ভিসিনিস্কি যে ভাবে মেননকে তিরস্কার করে-ছিলেন, তার তুলনা বিরল এবং মেনন তা কোন দিন ভুলতে পারেননি। মেনন দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীর ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিকার কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না এবং সেই জন্যই নেহরুর অনুপ্রেরণায় কৃষ্ণ মেননের অসাধারণ কূট-নৈতিক বুদ্ধির ফলে জন্ম নেয় বিশ্বের তৃতীয় শক্তি—একদিকে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন, অন্যদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জে এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্ঠী। কোন বৃহৎ শক্তিই বা তাদের সাগরেদরা এটাকে খুব সুনজরে দেখতে পারেননি। তাই তো কৃষ্ণ মেননের প্রতিটি কাজে মুখর হয়ে উঠতেন একদল পেশাদারী সমালোচক। মেনন হাসতে হাসতে বলতেন, I don't create controversy. controversy always chases me.

কৃষ্ণ মেনন এমন এক সময় ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে নেহরুর মুখ্য পরামর্শদাতা এবং সে নীতির রূপকার ছিলেন যে তখন সাদা-কালোর মত পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তাইতো তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে বিতর্কের ঝড় উঠত। দক্ষিণপন্থীরা যেমন তাঁর সমালোচনা করতেন, কমিউনিষ্টরা তেমনি সোচ্চারে তাঁকে সমর্থন করতেন। মজার কথা এর কোনটাই কৃষ্ণ মেনন পছন্দ করতেন না।

কৃষ্ণ মেনন ডালেসের নীতিকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করতেন কিন্তু তাই বলে তিনি ভারতবর্ষকে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাননি। কৃষ্ণ মেনন সোভিয়েট ইউনিয়নকে এইজন্য পছন্দ

করতেন যে ক্রুশ্চেভ-বুলগানিনের সোভিয়েট ইউনিয়ন গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনকে সমর্থন করতে দ্বিধা করেনি এবং এই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল কৃষ্ণ মেননের স্বপ্ন ও সাধনা। দক্ষিণপন্থীরা মনে করতেন, গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে কৃষ্ণ মেনন ভারতবর্ষকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। সোস্যালিষ্টরা সে সময় কমিউনিষ্টদের অস্পৃশ্য মনে করতেন বলে মেননকেও সহ্য করতে পারতেন না। (এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পঞ্চাশের দশকে যে কোন খ্যাতনামা সোস্যালিষ্ট নেতার চিরকুট নিয়ে গেলেই U S I S'এ চাকরি হত এবং হয়েছে।) ওদিকে কমিউনিষ্টরা মনে করতেন, কৃষ্ণ মেনন ও নেহরুকে সমর্থন করে যেটুকু কাজ এগুনো যায়, ততটুকুই ভাল। তাইতো শাঁখের করাতের মত অবস্থা ছিল মেননের।

হ্যারল্ড ল্যাস্কির প্রিয় ছাত্র মেনন অর্থনৈতিক ব্যাপারেও সুস্পষ্ট মতামত পোষণ করতেন। তিনি চাইতেন, অর্থনৈতিক মূল কাঠামো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর চাইতেন প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ব্যবসাদারদের দূরে রাখতে। কারণ তিনি মনে করতেন, দেশের সঙ্কটকালে ব্যবসাদাররা দেশরক্ষা সংক্রান্ত গোপন খবর অন্যত্র পাচার করতে পারেন এবং তাইতো তিনি দেশের নানা অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে শুধু গুলি-গোলা না, অনেক সাধারণ জিনিসপত্রও তৈরি করতে শুরু করান। এজন্য ওঁকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপের জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মনে পড়ে একদিন লোকসভায় সেনাবাহিনীর জুতো কেনার ব্যাপারে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে মেনন অনিচ্ছা প্রকাশ করায় একদল এম. পি গর্জে উঠলেন। এই ধরণের 'মামুলি' প্রশ্নের জবাব না দেওয়ার জন্য মেনন সংসদকে উপেক্ষা করছেন বলে স্পীকারের কাছে অভিযোগ করা হল নানা দিক থেকে। মেনন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে বললেন, না, বলব না। আমাদের মোট সৈন্য সংখ্যা সবার জানা আছে কিন্তু জুতোর ব্যাপারে বিশদ হিসেব দিলেই অন্যান্য দেশের সমর-বিশারদরা বুঝতে পারবেন,

কোথায় কত কী রকম সৈন্য আছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে এই সাদাসিধে প্রশ্নের জবাব দিতে আমি অপারগ। মেনন বৃশ্চিক রাশি বা লগ্নের মানুষ ছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই তবে তাঁর কথায় বৃশ্চিকের দংশন থাকতই। তাইতো তিনি সব শেষে বললেন, বাইরের কোন লোকের পরামর্শেই এই প্রশ্নটা করা হয়েছে বলে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু মেনন গ্রাহ্য করলেন না। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ মেননের একটা রসিকতার কথা মনে পড়ছে। সেন্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় তিনি হাসতে হাসতে বলতেন, এ দেশে শুধু মারোয়াড়ী ব্যবসাদাররাই সোভিয়েট ইউনিয়নের যন্ত্রপাতি বিক্রী করার এজেন্সী পায়। (শিল্পোন্নয়নের সেই প্রথম পর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের যন্ত্রপাতি নির্ধারিত মূল্যের চাইতে বেশি দামে বিক্রী হত এবং এই 'অতিরিক্ত' আয়ের টাকাটির এক অংশ কোন কোন রাজনৈতিক নেতা বা দল পেতেন বলেও অনেকে মনে করতেন।) মারোয়াড়ী ব্যবসাদারদের মেনন সহ্য করতে পারতেন না। তাইতো ওদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রকে উনি Jute Press বলে উপহাস করতেন।

কিছু কিছু সংবাদপত্র সত্যি যেন তাঁর রক্ত পান করার নেশায় মেতে উঠেছিল। মনে পড়ছে জেনারেল থিমায়ার পদত্যাগের কাহিনী।

দেশরক্ষা মন্ত্রী মেননকে না জানিয়ে জেনারেল থিমায়া একদিন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে দেখা করে জানালেন, সেনাবাহিনী সংক্রান্ত নানা প্রস্তাব অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে এমন আটকে পড়ছে যে তাতে ক্ষতি হচ্ছে। এই আলোচনার পর পরই নেহরু মেননকে সব কথা জানালেন। মেনন সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল থিমায়াকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, দেশরক্ষা মন্ত্রীকে ডিঙিয়ে দেশরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার অধিকার কোন সেনাপতির নেই। তাছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব কোন সেনাপতির নয়—দেশরক্ষা মন্ত্রীর। সর্বোপরি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভাল-মন্দ সব রকম সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

ও মন্ত্রীদের—সেনাপতিদের নয়।

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ জেনারেল থিমায়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝলেন ও স্বীকারও করলেন। তবে উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মনে হচ্ছে আমি আপনার আস্থা হারিয়েছি, সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আমার পদত্যাগ করা উচিত।

মেনন বললেন, ভুল বোঝাবুঝি যখন মিটে গেছে তখন পদত্যাগ করার কোন কথাই ওঠে না।

থিমায়া খুশি মনে কৃষ্ণ মেননের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও দুপুরের দিকে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন। বিকেলের দিকে নেহরু জেনারেল থিমায়াকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ভুল বোঝাবুঝি যখন মিটে গেছে তখন পদত্যাগ করা তাঁর উচিত হয়নি এবং আর কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে এখনই তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। জেনারেল থিমায়া বিনা প্রতিবাদে তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নিলেন।

সন্ধ্যার পর চাণক্যপুরীর এক দূতাবাসে ককটেল পার্টি বেশ জমে উঠেছে। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে জেনারেল থিমায়া ও তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছাড়াও বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আছেন। হঠাৎ জেনারেল থিমায়ার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্টেটসম্যান পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে এক কোণায় ডেকে নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, জেনারেল পদত্যাগ করেছেন। এ্যাডমিরাল কাটারী ও এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জীও পদত্যাগ করেছেন। ঐ সংবাদদাতা হাতের গেলাসের বাকি হুইস্কীটুকু গলায় ঢেলে দিয়েই অফিস চলে গেলেন। পরের দিন কাগজে মহাসমারোহে তিন সেনাপতির পদত্যাগের খবর ছাপা হল।

খবর পড়ে নেহরু বিস্মিত। ঝড় উঠল রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে। ঝড় উঠল পার্লামেন্টেও। হঠাৎ যেন অধিকাংশ এম. পি. থিমায়ার প্রতি অত্যন্ত সমবেদনশীল হয়ে উঠলেন। নেহরু দীর্ঘ বিবৃতিতে সবকিছু জানালেন এবং বললেন, যে খবর তিনি ক্যাবিনেটের কোন সদস্যকে

পর্যন্ত জানাননি সে খবর ফাঁস হল কিভাবে তা ভেবে দেখা দরকার। নেহরু মেননের সমালোচকদের বললেন, কেউ যেন ভুলে না যান এ দেশে রাজনৈতিক ও বেসামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং সেনাবাহিনী তাদেরই অধীন। সদস্যরা যখন উপলব্ধি করলেন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে সামরিক কর্তৃপক্ষকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে দেশের সর্বনাশের বীজ নিহিত থাকে, তখন তারা চুপ করে গেলেন।

আজ এত বছর পর এই ঘটনা লিখতে গিয়ে আরো কয়েকটা কথ না লিখে পারছি না। থিমায়া অত্যন্ত জনপ্রিয় সেনাপতি ছিলেন। কোরিয়ায় রিপ্যাট্রিয়েশন কমিশনের সভাপতি হয়ে তাঁর সম্মান আরো বেড়ে যায়। থিমায়ার সঙ্গে রাজনৈতিক দুনিয়ার বেশ কিছু লোকের যোগাযোগ ছিল, এ কথা সর্বজনবিদিত এবং মজার কথা এরা সবাই নেহরু ও মেননের সমালোচক ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বকে শ্রদ্ধার আসনে বসাবার উদ্দেশ্যেই যে থিমায়ার পদত্যাগের খবর ফাঁস ও ছাপানো হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক শক্তির চক্রান্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। থিমায়ার ঘটনার পশ্চাতে যে এমনি কোন অশুভ চক্রান্ত ছিল না, তা হলপ করে বলা যায় না। ভাবলে অবাক লাগে যে ভারতের আর কোন সেনাপতি না, শুধু থিমায়ারই বিরাট জীবনী প্রকাশিত হয়েছে পাশ্চাত্যের এক দেশে এবং এই বইতে তাঁকে প্রায় সর্বজনপ্রিয় মহাপুরুষ করে তোলা হয়েছে।

কথায় কথা বাড়ে। এক কথা লিখতে গিয়ে আরো কথা মনে পড়ে। থিমায়ার পদত্যাগের খবর প্রকাশ করে স্টেটসম্যান একদিকে যেমন সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হেয় করতে চায়। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দুটি কাজই অত্যন্ত নিন্দনীয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও

স্টেটসম্যান অনুরূপ নিন্দনীয় কাজ করে।

'আজাদ' কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি ভারতীয় সৈন্যদের দখলে। স্বপ্নের শহর লাহোরের উপকণ্ঠেও ভারতীয় সৈন্য। পাকিস্তানের শক্তিশালী প্যাটন ট্যাঙ্কের সমাধি রচিত হয়েছে ভারত ভূমিতে। আরো কত কি। সব মিলিয়ে আয়ুব টলটলায়মান।

যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ-উপরোধ আবেদন-নিবেদন এলো নানা দেশ থেকে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের অছি পরিষদের প্রস্তাব। নিশ্চিত সর্বনাশ বাঁচাবার জন্য আয়ুব সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব মেনে নিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন। ভারত? ভারত কী যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেবে? নাকি পাকিস্তানের বিষদাঁত চিরকালের জন্য ভেঙে দেবার জন্য এখনই যুদ্ধবিরতি করবে না?

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করলেন, অছি পরিষদের প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখছি। শাস্ত্রীজি লোকসভার কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসে ঢুকতেই আমরা পাঁচ-ছ'জন সাংবাদিক ওঁর ঘরে ঢুকলাম। সবার মুখেই একই প্রশ্ন: আমরা কী যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেব? শাস্ত্রীজি বললেন, হ্যাঁ, যুদ্ধবিরতি করব কিন্তু এখনই ঘোষণা করব না। আমাদের সেনাবাহিনী তাদের পজিশন কনসোলিডেট করে নেবার পরই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করব—তার আগে নয়।

শাস্ত্রীজি আমাদের বিশ্বাস করে এই আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ খবরটি দিলেও সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে এই খবরটি ছাপাবেন না। সরকারী ভাবে লোকসভায় এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পরই খবরটি ছাপাবেন। না, আমরা কেউ এ খবর প্রকাশ করিনি। বিশ্বাস ভঙ্গ করলেন স্টেটসম্যান পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা ইন্দর মালহোত্রা। দুর্ভাগ্যের কথা এরাই বিখ্যাত সাংবাদিক, শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক।

কৃষ্ণ মেনন সম্পর্কে যে যা-ই বলুন, তিনি যে একজন অসাধারণ

মানুষ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিলেতে থাকার সময় দু-একজন মহিলার সঙ্গে ভাব-ভালবাসা হলেও তাঁর কোন বন্ধন ছিল না। এমন কাজ পাগল মানুষ খুব কম দেখা যায়। কাজ না করে উপায়ও ছিল না। ঘুমুতেন মাত্র দু-এক ঘণ্টা। চা বিস্কুটই ছিল প্রধান খাদ্য। সুতরাং খাওয়া-দাওয়াতেও সময় নষ্ট হত না। কাজের ব্যাপারে দিন-রাত্রির কোন পার্থক্য ছিল না ওঁর কাছে।····

কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার পর প্রায়ই আমি বাড়ি ফেরার পথে কৃষ্ণ মেননের বাংলোয় যেতাম। বিরাট বাংলোর এক কোণার এক ছোট্ট ঘরে উনি থাকতেন। ঐ ঘরখানিই ছিল ড্রইং রুম-কাম-বেড রুম-কাম ডাইনিং রুম-কাম-লাইব্রেরী। কোন দিন একলা পেতাম, কোন দিন আবার দু-একজনকে ওঁর সঙ্গে গল্প করতে দেখতাম। অন্য ছোট-বড়-মাঝারি মন্ত্রিদের বাড়িতে সব সময় যেমন তাঁবেদার আর অনুগ্রহ-প্রার্থীর ভীড় দেখা যায়, কৃষ্ণ মেননের বাড়িতে সে দৃশ্য কখনই দেখা যেত না। যাই হোক, কোন কোন দিন আড্ডা চলত বেশ রাত পর্যন্ত। আবার কোন দিন রাত দশটা-সাড়ে দশটার সময় উঠতে গিয়েও বাধা পেয়েছি।

কী ব্যাপার ? উঠে দাঁড়ালে কেন ?

আমি হেসে বলি, দশটা বেজে গেছে। এবার বাড়ি যাই।

ডোণ্ট বী সিলি ! সীট ডাউন।

কী করব ? আমি আবার বসি। কৃষ্ণ মেনন সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের বাজার বাজিয়ে পার্সোন্যাল স্টাফকে বলেন, ভট্টাচারিয়ার বাড়িতে কানেকশান দাও। তারপর উনি টেলিফোনের কানেকশান পেতেই বলেন, তোমার অপদার্থ স্বামীকে আজ ছাড়ছি না। কাল ভোরেই বাড়ি ফিরবে। ঠিক আছে তো ?

ওদিক থেকে সুন্দরী কী বলল শুনতে পাই না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।

মেনন টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখতেই আমি হেসে জিজ্ঞেস করি, আজ কী সারারাত গল্প করবেন ?

কী করব তা বলব কেন ?

এবার ডাক পড়ে রমজানের। সে ঘরে ঢুকতেই হুকুম দেন, বাঙালীবাবুকে কিছু খেতে দাও।

খাবার মানে ডাল-ভাত বা ইডলি-দোসা বা ভাত-সাম্বার না। রমজান খেতে দেয় খানকয়েক স্যাণ্ডউইচ আর কাজু। তার সঙ্গে কফি। কফি শেষ করতে না করতেই কৃষ্ণ মেনন ছড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, চল চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আমি উঠে পড়ি। ওর পিছন পিছন গাড়িতে উঠি। ফাঁকা রাস্তা। পালাম এয়ারপোর্টে পৌঁছতে কয়েক মিনিট লাগে। গাড়ি গিয়ে থামে ভারতীয় বিমানবাহিনীর এক বিশেষ বিমানের সামনে। বিমান কর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করেই বিমানে ওঠেন। পিছন পিছন আমি। শুধু আমাদের দুজনকে নিয়ে বিমান আকাশের কোলে ভাসতে শুরু করে।

গল্পে গল্পে কখন যে ঘণ্টা দুয়েক সময় কেটে গেছে, তা টের পাইনি। হঠাৎ পাইলট এসে মেননকে বললেন, স্যার, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছব।

ব্যাঙ্গালোর! শুনে আমি তাজ্জব কিন্তু কোন কথা বলি না।

মেনন পাইলটকে বলেন, কণ্ট্রোলকে জানান বিশেষ কারণে ল্যাণ্ড করব। আর ওরা যেন HALকে বলে একটা গাড়ি পাঠাতে, কিন্তু কেউ যেন জানে না, আমি এই প্লেনে আছি।

HAL-এর এরোড্রোমে প্লেন ল্যাণ্ড করল। কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নয়, শুধু একজন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কৃষ্ণ মেননকে দেখে তার চক্ষু ছানাবড়া! সেলাম দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিতেই আমরা উঠলাম। গাড়ি ছুটল HAL-এর দিকে। ফটকে সান্ত্রী গাড়ি আটকাতেই ড্রাইভার ফিস ফিস করে বলল, ডি. এম. (ডিফেন্স মিনিস্টার) গাড়িতে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্রী সেলাম দিয়েই ফটক খুলে দিল।

তারপর নাইট শিফ্‌ট-এ বিমান তৈরির কাজ দেখতে শুরু

করলেন কৃষ্ণ মেনন। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে গভীর রাত্রে দেশরক্ষা মন্ত্রীকে দেখে তদারকী অফিসার ও কর্মীরা সমান ভাবে বিস্মিত ও হতভম্ব। মেনন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখেন ও প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের উৎসাহিতও করেন, শুধু ইউরোপ-আমেরিকাই বড় বড় কাজ করতে পারে, সেটা ঠিক নয়। সুযোগ পেলে আমাদের দেশের মানুষও অনেক বড় বড় কাজ করতে পারে এবং করছে। HAL-এর মত প্রতিষ্ঠান এশিয়া-আফ্রিকায় খুব বেশী নেই। আপনারা একটু ভাল ভাবে কাজ করলে এর সুনাম দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

হঠাৎ HAL-এর কর্ণধার এয়ার ভাইস মার্শাল রঞ্জন দত্ত এসে হাজির। কৃষ্ণ মেনন পিছন ফিরে আমার দিকে হাসতে হাসতে বলেন, দেখেছ ভট্টাচারিয়া, তুমি বাঙালী বলে রঞ্জন দত্ত বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে!

কৃষ্ণ মেননের কথায় সবাই হাসেন। তারপর ঐ কারখানার ফ্লোরে দাঁড়িয়েই কাজকর্ম নিয়ে কনফারেন্স শুরু করেন মেনন। তারপর এক রাউণ্ড কফি।

প্লেনে ওঠার আগে কৃষ্ণ মেনন এ ভি এম দত্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু চাপা গলায় বলেন, ঘুম ভেঙে গেল কেন? রাত্রে কী ভাল ভাবে ড্রিঙ্ক করার সময় হয়নি?

এয়ার ভাইস মার্শাল হাসতে হাসতে জবাব দেন, স্যার, আপনি তো জানেন নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যালকোহল পেটে না পড়লে আমি কখনই বিছানায় যাব না।

গুড।

এয়ার ভাইস মার্শাল রঞ্জন দত্তকে কৃষ্ণ মেনন খুব ভালবাসতেন। প্লেনে উঠেই মেনন আমাকে বললেন, তোমরা বাঙালীরা বড় অদ্ভুত জাত। অধিকাংশ বাঙালীই কুঁড়ে, বেশি কথা বলে, ঝগড়া করে কিন্তু হঠাৎ এমন এক একটা বাঙালীর আবির্ভাব হয় যা ইতিহাসের বিস্ময়।

আমি চুপ করে মেননের কথা শুনি।

এ দেশে কত লক্ষ-কোটি সাধু জন্মেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই বাট ওয়ান বিবেকানন্দ ইজ এনাফ টু চেঞ্জ দ্য কোর্স অব হিস্ট্রী। বলতে পারো শঙ্করাচার্য আর বিবেকানন্দ ছাড়া আর কে এভাবে এই অশিক্ষা-কুশিক্ষা-দরিদ্র জর্জরিত উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের চিন্তাধারায় বিপ্লব এনেছেন? মেনন এক নিশ্বাসে বলে যান, থিংক অব আচারিয়া পি. সি. রে। এই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালী অধ্যাপক প্ল্যানিং কমিশনের একশো বছরের কাজ এগিয়ে দিয়ে গেছেন। সমগ্র জাতির গর্ব করার জন্য একজন টেগোরই যথেষ্ট।

এবার কৃষ্ণ মেনন হঠাৎ একটু হেসে বলেন, নান বাট সুভাষবাবু, এগেন এ বেঙ্গলী, হ্যাড দ্য কারেজ টু রিভোল্ট এগেনষ্ট গান্ধীজি।

এবার আমি হাসি।

হাসেন কৃষ্ণ মেননও। বলেন, এই এক একটা বাঙালী লক্ষ-কোটি অপদার্থ বাঙালীর কলঙ্ক ঘুচিয়েছেন। হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে মেনন বলেন, টেক দ্য কেস অব আওয়ার এয়ারফোর্স। রঞ্জন দত্ত একটাই আছে। দত্ত না থাকলে HAL এত ভাল কাজ করতে পারত না।

আমরা পালামের মাটিতে যখন নামলাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজে।

এইভাবে আরো কতবার কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোর আর কানপুর গেছি।

বিচিত্র মানুষ ছিলেন কৃষ্ণ মেনন। একদিন বিকেলের দিকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সেবানগর চেনো?

চিনি বৈকি।

হাতের কাজ সেরেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল, সেবানগর যাই।

নিঃশব্দে গাড়িতে উঠলাম। মনে মনে ভাবলাম, বোধ হয় কোন অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু না, কোন অনুষ্ঠান নয়। ওঁর ড্রাইভার অসুস্থ। তাই তাকে দেখে এলেন।

কোথায় ডিফেন্স মিনিস্টার আর কোথায় একজন সামান্য

ড্রাইভার! কিন্তু কৃষ্ণ মেননের কাছে এই সামান্য ড্রাইভারও যে সহকর্মী ছিলেন। আশেপাশের সাধারণ মানুষের জন্য সমবেদনা ও ভালবাসা ছিল নেহরুর, রাজেন্দ্রপ্রসাদের, লালবাহাত্বর ও জাকির হোসেনের। আর আছে চ্যবনের।

ফকরুদ্দীন আলি আমেদ যখন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁর কাছে এক একটা ফাইল পড়ে থাকত তিন-চার মাস। মেনন ছিলেন ঠিক এর বিপরীত। ফাইল আসার আধ-ঘণ্টা-এক ঘণ্টার মধ্যেই তা ফেরৎ চলে যেত। উনি আশা করতেন, সবাই এই ভাবে কাজ করবে।

একদিন মেননের অফিসে বসে আছি। পাঁচটা বাজার পাঁচ-সাত মিনিট আগে আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের QMG লেঃ জেনারেল কোচার এলেন একটা ফাইল নিয়ে। সামান্য সময় আলোচনার পরই দেশরক্ষা মন্ত্রী ফাইলে সই করে বললেন, তাড়াতাড়ি অর্ডারটা ইস্যু করার ব্যবস্থা করুন।

লেঃ জেনারেল কোচার বললেন, হ্যাঁ স্যার, কাল সকালে অফিসে এসেই অর্ডারটা ইস্যু করে দেব।

কৃষ্ণ মেনন চট করে ঘড়ি দেখেই বললেন, হোয়াই টু-মরো? এখান থেকে আপনার ঘরে যেতে লাগবে পনেরো সেকেণ্ড। চেয়ারে বসতে লাগবে আরো পনেরো সেকেণ্ড। সই করতে লাগবে পাঁচ সেকেণ্ড। এবার হেসে বললেন, এ সব করেও আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে দু'এক মিনিট আগেই পৌঁছতে পারবেন।

লেঃ জেনারেল কোচার হাসতে হাসতে বললেন, স্যার, আই এ্যাম ইস্যুয়িং দ্য অর্ডার রাইট নাউ।

থ্যাঙ্ক ইউ!

কোচার এক পা পিছিয়ে স্যালুট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই ছিলেন কৃষ্ণ মেনন। ওঁর এই কাজের নেশা ও গতির জন্যও উনি বহুজনের কাছে অপ্রিয় ছিলেন।

নিত্য নতুন বই ও আধুনিক খেলনা মেনন নিয়মিত কিনতেন।

সব সময় নিজে বইয়ের দোকানে গিয়ে বই দেখেই পছন্দ মত বই কিনতেন। অধিকাংশ বইই কিনতেন সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টের বইয়ের দোকানে। ঝড়ের বেগে দোকানে ঢুকে দু-এক মিনিটের মধ্যে দশ-পনেরোখানা বই শেলফ্ থেকে নামিয়ে নিয়েই দৌড়ে প্লেনে উঠতেন।

দাম? দাম দেবার সময় কোথায়? সঙ্গে যে পার্সোন্যাল স্টাফ থাকতেন তিনি প্লেন থেকে বইগুলি নামিয়েই নাম আর দাম লিখে রাখতেন এবং পরের দিনই চেক চলে যেত ঐ দোকানে।

কৃষ্ণ মেননের ঘর ভর্তি বই আর সুন্দর সুন্দর খেলনা ছিল। ঐসব খেলনা নিয়ে খেলা করেই মেনন তাঁর অবসর বিনোদন করতেন। বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের বাচ্চারা এলে শেলফ্ থেকে সব খেলনা নামিয়ে তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতেন। এবং নিজের রোজগারের সিকিভাগ বাচ্চাদের চকোলেট ও খেলনা কিনে দিতেই খরচ করতেন।

ছোটখাট ও মজার দু-একটি ঘটনা লিখেই কৃষ্ণ মেননের ওপর যবনিকা টানব।

কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে কলকাতা এসেছি। অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে উনি আমার কাগজের অফিসেও যাবেন। সকালবেলার এক অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিরা চা খাচ্ছেন। হঠাৎ একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার কৃষ্ণ মেননের সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার, আপনি কী বিকেলে— পত্রিকার অফিসে যাবেন?

ইয়েস আই উইল গো দেয়ার।

কিন্তু স্যার, মনে হয় ওখানে না যাওয়াই ভাল।

দপ করে জ্বলে উঠলেন কৃষ্ণ মেনন, ডু ইউ থিংক ডিফেন্স মিনিস্টার অব ইণ্ডিয়া স্যুড এ্যাক্ট অন ইওর এ্যাডভাইস?

*　　*　　*

ঠিক এই রকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল লালবাহাদুরের সঙ্গে। শাস্ত্রীজি তখন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হলেও দেশের লোক বুঝতে পেরেছেন, ইনিই আগামী প্রধানমন্ত্রী। শাস্ত্রীজি কলকাতা এলেন। সঙ্গে আমিও আছি। বিকেলের দিকে আমার পত্রিকার অফিসে যাবেন ঠিক আছে।

দমদমে প্রায় প্রধানমন্ত্রীর মতই অভ্যর্থনা জানানো হল শাস্ত্রীজিকে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তুষারকান্তি ঘোষের বারাসতের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজ। বহু গণ্যমান্য লোকই নিমন্ত্রিত। তার মধ্যে কয়েকজন অতি উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারও আছেন।

বুফে লাঞ্চ। খেতে খেতেই ঘুরে ফিরে কথাবার্তা চলছে। আমি আর শাস্ত্রীজি কথা বলছিলাম। এমন সময় কলকাতা পুলিশের এক অতি বিখ্যাত ও কুখ্যাত অফিসার পাশে এসে শাস্ত্রীজিকে বললেন, স্যার, আপনি কী সত্যি সত্যিই—পত্রিকার অফিসে যাবেন ?

অল্প কথার মানুষ শাস্ত্রীজি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, যাব।

স্যার, আমার মনে হয় ঐসব ছোটখাট আজেবাজে কাগজের অফিসে আপনার মত মানুষের যাবার কী দরকার ?

শাস্ত্রীজি আমাকে দেখিয়ে বললেন, একে চেনেন ?

হ্যাঁ, ইনি একজন রিপোর্টার।

শাস্ত্রীজি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ্যাণ্ড এ ফ্রেণ্ড অব মাইন। আমি এরই আমন্ত্রণে যাচ্ছি। তাছাড়া আমি যখন আপনার পরামর্শ চাইব, তখন শুধু আপনি আপনার পরামর্শ দেবেন।

অফিসারটি মুখ চুন করে গণ্যমান্যদের ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

* * *

আর একটি ঘটনা বলব। দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কৃষ্ণ মেননের অধীনে রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন রঘুরামাইয়া। এক ছুটির দিনের সকালে মেননের বাড়িতে মেননের সঙ্গে গল্প করছিলাম আমি আর ব্লিৎস-এর বৈদেশিক সম্পাদক রমেশ সঙ্ঘভি। হঠাৎ রঘুরামাইয়া ঘরে ঢুকেই মেননকে বললেন, স্যার, খুব জরুরী কথা ছিল।

মেনন প্রশ্ন করলেন, জরুরী মানে?

মানে ব্যক্তিগত। রঘুরামাইয়া আমাদের দিকে দেখে বললেন, একটু প্রাইভেটলি····

মেনন এবার প্রশ্ন করলেন, এনিথিং কনসার্নিং গভর্ণমেণ্ট?

নো স্যার!

তাহলে এদের সামনেই বল।

আমরা বাইরে যেতে চাইলাম। কিন্তু কৃষ্ণ মেনন কিছুতেই যেতে দিলেন না। শেষে কোন গত্যন্তর না দেখে রঘুরামাইয়া অত্যন্ত দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, স্যার, এবার ইউরোপে গিয়ে হঠাৎ আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়। তারপর আমরা দুজনে একসঙ্গে কয়েক জায়গা ঘুরেছি····

কৃষ্ণ মেনন হাসতে হাসতে বললেন, তা ঐ বান্ধবীর সঙ্গে কী আমার বিয়ে দিতে চাও?

রঘুরামাইয়ার মুখে হাসি নেই। মুখ নীচু করে তিনি কোন মতে বললেন, স্যার, মেয়েটা বলছে সে আমার স্ত্রী হয়ে আমার বাড়িতেই থাকবে, কিন্তু স্যার আমার তো স্ত্রী আছেন।

কৃষ্ণ মেনন এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, শোন রঘুরামাইয়া, পণ্ডিতজী আমাকে ডিফেন্স মিনিস্টার করেছেন ডিফেন্স প্রবলেম সমাধানের জন্য। তুমি তোমার বান্ধবীর দাবী মেনে নেবে কি নেবে না, সে বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। ইফ ইউ প্লীজ, জাস্ট ক্রশ দ্য রোড এ্যাণ্ড মিট পণ্ডিতজী····

রঘুরামাইয়া মাথা নীচু করে দরজার দিকে পা বাড়াতেই মেনন বললেন, আই এ্যাম নট হিয়ার টু সলভ দ্য প্রবলেমস্ অব প্লে-বয়েজ অব ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স।

তখন আমার জীবনে অমাবস্যার অন্ধকার। ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজের খাতায় নাম লেখাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকাল-বিকেল-সন্ধ্যায় তিনটি টিউশানি শুরু। বিনা পারিশ্রমিকে লোকসেবক-এর রিপোর্টার হলাম বছর খানেক পর।

তখন আমার দিন শুরু হয় ভোর পাঁচটায়। সওয়া পাঁচটার মধ্যে ঠনঠনিয়ায় এসে ছ'নম্বর বাস ধরি। ছ'টা নাগাদ পৌঁছাই ভবানী-পুরের গিরীশ মুখার্জী রোডের গিরীশ ভবনে। আটটা-সওয়া আটটায় বেরিয়ে ন'টা-সওয়া ন'টায় ফিরে আসি বাসায়। বাবা চাল-আলু ধুয়ে কয়লার উনুন সাজিয়ে রেখে ভোরবেলায় বেরিয়ে যেতেন। আমি বাসায় এসে উনুন ধরিয়ে ভাত চাপিয়ে দিয়েই স্নান করি। তারপর সিদ্ধ ভাত খেয়েই মাইল দেড়েক দৌড়ে কলেজে যাই।

দুপুরের পর কলেজ থেকে বেরিয়েই সোজা জনক রোড। দিদির বিয়ের ঋণ শোধ করার জন্য মল্লিক মশায়ের ম্যাট্রিক ক্লাশের ছেলেকে পড়াই। সেখান থেকে হাজরা পার্ক বা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জনসভা আর মেট্রোপল হোটেলের প্রেস কনফারেন্স শেষ করেই সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে দুজন ছাত্রকে পড়াতে যাই একখানি টালির ঘরে বিনা ভাড়ায় থাকার জন্য। লোকসেবকে পৌঁছাই রাত আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ। অধিকাংশ দিনই আমি আর অজিতদা (বসু মল্লিক) বারোটা নাগাদ পদব্রজে বাসার দিকে রওনা দিই। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে মোটামুটি একটা-দেড়টা। এরপর ডিনার এক আনার ছাতু আর দু'পয়সার ভেলিগুড়।

বছরখানেক পর লোকসেবক-এর উদার সমাজতন্ত্রী কর্তৃপক্ষ আমাকে মাসিক দশ টাকা 'মাইনে' মঞ্জুর করলেন এবং তাও পাই পাঁচ-সাত কিস্তিতে। চার বছর পর লোকসেবক থেকে 'রিটায়ার' করলাম পঁচিশ টাকায়।

ঢুকলাম এক দেশপ্রেমিকের নিউজ এজেন্সীতে। সেখানকার প্রবীণ রিপোর্টাররা দার্জিলিং গেলে স্কচ হুইস্কী খাবার জন্য দৈনিক পঞ্চাশ টাকা ভাতা পেলেও আমার মত কিছু ছেলেকে বেগার খাটিয়ে নিতে খদ্দর-ধারী দেশপ্রেমিক কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। এক বছর পর পঞ্চাশ টাকা ভাতা পেতে শুরু করলেও জানলাম কর্তৃপক্ষের সম্ভাব্য ও ভাবী জামাইদেরই এ প্রতিষ্ঠানে সুযোগ আছে, অন্যদের নয়।

ছাড়লাম নিউজ এজেন্সী। চার বছর ধরে খ্যাত ও অখ্যাত পত্রিকায় রিপোর্টারী করলাম দিনমজুরের মত। প্রকাশিত রিপোর্টের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পাই কোন মাসে পঞ্চাশ, কোন মাসে একশো। উপরি আয়ের জন্য নিউজ এডিটরের বাড়িতে নিত্য হাঁটাহাঁটি করে দশ টাকায় ফিচার বা প্রবন্ধ লিখি।

সেসব দিনের কথা মনে পড়লেও চোখে জল আসে। বছরে এমন দু-একটা রিপোর্ট লিখতাম যা নিয়ে হৈচৈ পড়ে যেত। কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে পঞ্চাশ-একশো টাকা প্রাইজ দিতেন কিন্তু আমি স্থায়ী কর্মচারী না বলে অন্য রিপোর্টারের নামে টাকাটা দেওয়া হত। পুরো টাকাটা আমি পেতাম না। চীফ রিপোর্টার মদ্যপানের জন্য অর্ধেক টাকা রেখে বাকি অর্ধেক আমাকে দিতেন। বিধাতা পুরুষের এমনই বিচার যে অর্থের অভাবে আমি অনেক সময় আমার সন্তানকে বার্লি পর্যন্ত দিতে পারতাম না কিন্তু আমারই পরিশ্রমের পয়সায় আরেকজন সাংবাদিক নির্বিবাদে মদ্যপান করতেন।

কলকাতার দশ বছরের সাংবাদিক জীবনে কত অপমান, কত অবিচার সহ্য করেছি, তা লিখলে মহাভারত হয়ে যাবে। সে ইতিহাস আর লিখতে চাই না। আজ মনে হয়, এই অপমান, অবিচার, অত্যাচারের জন্যই আমার মনের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং সর্বনাশের মুখোমুখি হয়েও অদৃষ্টের সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াইয়ের জন্য মাত্র একশো টাকা মাইনের প্রতিশ্রুতিকে অবলম্বন করে আমি একদিন দিল্লী রওনা হলাম।

প্রথম আশ্রয় স্টেশন, তারপর বিড়লা ধর্মশালা। দু-তিন দিন পর ঐ বিড়লা ধর্মশালার পাবলিক টেলিফোন থেকে দু'আনা দিয়ে টেলিফোন করলাম প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন তিনমূর্তি ভবনে। মনে মনে জানতাম, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে আমার দেখা করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই বললাম, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আপনি কাল ন'টার পর ফোন করবেন।

পরের দিন সকালে আবার বিড়লা ধর্মশালার কয়েন-বক্স থেকে দু'আনা দিয়ে টেলিফোন করলাম তিনমূর্তি ভবনে।

আপনি কাল সকাল সাড়ে ন'টায় আসুন।

অখ্যাত হিন্দী দৈনিকের একশো টাকার বিশেষ সংবাদদাতাকে শ্রীমতী গান্ধী এত সমাদর করবেন, তা ভাবতে পারিনি। মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওঁর ব্যবহারে। চলে আসার আগে বললাম, আমাদের ইংরেজি সাপ্তাহিকের জন্য ইন্টারভিউ চাই।

একটু হেসে শ্রীমতী গান্ধী বললেন, দু-তিন দিন পর এসো।

দু-তিন দিন পর আবার তিনমূর্তি ভবনে গেলাম। ঘন্টাখানেক ধরে ওঁর সঙ্গে কথা বললাম। চলে আসার আগে বললাম, আরেকদিন এসে আপনার কয়েকটা ছবি তুলতে চাই।

আবার সেই স্নিগ্ধ হাসি হেসে শ্রীমতী গান্ধী বললেন, ঠিক আছে, একদিন টেলিফোন করে চলে এসো।

কয়েক দিন পর আমাদের ফটোগ্রাফার সুদর্শনকে নিয়ে গেলাম তিনমূর্তি ভবনে। ঘরে-বাইরে নানাভাবে অনেকগুলি ছবি তোলা হল। অনেকগুলি ছবির সঙ্গে ইন্টারভিউ ছাপা হল পরের সপ্তাহেই।

একদিন সকালে তিনমূর্তি ভবনে গিয়ে দু'কপি কাগজও দিয়ে এলাম। সেদিন শ্রীমতী গান্ধী নিজেই বললেন, আবার এসো।

বিনা কাজে তিনমূর্তি ভবনে যেতে সাহস হয় না। মাস তিনেক পর আবার একদিন সকালে তিনমূর্তি ভবনে হাজির হলাম। একতলার ড্রইংরুমের বাঁ দিকের সোফায় বসে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি, সিঁড়ি দিয়ে নেহরু সিগারেট টানতে টানতে নামছেন। উঠে দাঁড়ালাম। নেহরু ইন্দিরার কাছে এগিয়ে আমাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, হু ইজ দিস বয়, ইন্দু?

শ্রীমতী গান্ধী বললেন, এ জার্নালিস্ট ফ্রম ক্যালকাটা।

তারপর নেহরু আমার কাঁধে হাত দিয়ে অফিস ঘরের দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন, কী নাম তোমার?

তখন কায়দা করে ভট্টাচারিয়া বলা শিখিনি। তাই বিশুদ্ধ

বাংলার উচ্চারণ করে বললাম, নিমাই ভট্টাচার্য।

অফিস ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কাগজে কাজ কর?

আমি আমার অখ্যাত হিন্দী দৈনিকের নাম করলাম।

মুখ বিকৃত করে বললেন, হুইচ পেপার?

আমি আবার সেই অখ্যাত হিন্দী দৈনিকের নাম বললাম।

স্পষ্ট বুঝলাম, উনি জীবনেও সে পত্রিকার নাম শোনেননি। তাই ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন, ডু দে পে?

হ্যাঁ, স্যার, আমি একশো টাকা মাইনে পাই।

আমার উত্তর শুনে নেহরু দপ করে জ্বলে উঠলেন, হাউ মাচ?

স্যার, একশো টাকা।

রাগে লাল হয়ে নেহরু আপন মনে বললেন, ননসেন্স! কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর উনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি কী ব্যাচেলার?

না স্যার।

তুমি বিবাহিত?

হ্যাঁ স্যার।

ছেলেপুলে হয়েছে?

হ্যাঁ স্যার।

আমার কথা শুনে আরো রেগে গেলেন, তুমি বিবাহিত, তোমার ছেলেমেয়ে আছে আর তুমি তোমার কাগজ থেকে মাত্র একশো টাকা মাইনে পাও?

হ্যাঁ স্যার।

কফি খাবে?

হ্যাঁ খাব।

বেল বাজিয়ে অর্ডালীকে ডেকে হুকুম করলেন, কফি আনো।

অর্ডালী বেরিয়ে যেতে উনি একবার আমার দিকে তাকালেন। আমার চোখ-মুখের চেহারা দেখেই বুঝলেন, আমি পেটভরে খেতে পাই না। সত্যি, তখন আমি পেটভরে খাবার মত রোজগার করি

না। একশো টাকা মাইনের আশী টাকা কলকাতা পাঠাই। তখন জনপথের অন্নপূর্ণা ক্যাফেটেরিয়ায় আট আনায় জনতা লাঞ্চ পাওয়া যেত। আমি বেয়ারাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বেলা তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় সেই লাঞ্চ খাই। এতে খরচ হয় পনেরো টাকা। হাতে থাকে পাঁচ টাকা। তার থেকে খাম কিনে অফিসে খবর পাঠাই একদিন অন্তর। বাড়িতেও চিঠিপত্র লিখি। এ সব খরচ করে হাতে থাকে এক টাকা-দেড় টাকা। সে পয়সা দিয়ে রোজ সকালে এক কাপ চা পর্যন্ত হত না। সকালে জলখাবার বা রাত্রে কিছু খাওয়া তো স্বপ্নাতীত ছিল। সুতরাং আমার চেহারা দেখেই নেহরুর বুঝতে কষ্ট হল না, আমি ক্ষুধার্ত। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, স্যাণ্ডউইচ খাবে?

আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললাম, হ্যাঁ খাব। তাছাড়া দ্বিধা করব কেন? মনে মনে ভাবলাম, ষাট কোটি মানুষের যিনি ভাগ্যবিধাতা, তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলব কেন?

নেহরু সঙ্গে সঙ্গে আবার বেল বাজালেন। অর্ডারলী আসতেই বললেন, কফির সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ কাজু-টাজুও এনো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্যাণ্ডউইচ, কাজু, পেস্ট্রি আর কফি এলো। আমি ক্ষিদের জ্বালায় এক নিশ্বাসে সবকিছু খেয়ে নিলাম।

নেহরু উঠে দাঁড়ালেন। আবার আমার কাঁধে হাত দিয়ে বাইরে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, সময় পেলেই চলে এসো।

হাজার হোক বহুকাল পরে সকালে পেটে কিছু পড়েছে। তাই হাসতে হাসতে বললাম, আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে কী যখন তখন আপনার কাছে আসা সম্ভব? আমাকে তো ঢুকতেই দেবে না।

নেহরু কোন কথা না বলে আমাকে নিয়ে রিসেপসনে গিয়ে সামনের একজন অফিসারকে বললেন, এই ছেলেটিকে আসতে যেন কেউ বাধা না দেয়। আর হ্যাঁ, এ এলে চা-কফি-টফি খেতে দিও। বলে নেহরু হাসি মুখে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন। তখন আমার মুখেও হাসি।

নেহরু ভিতরে চলে যেতেই এ অফিসারটি আমার নাম-ধাম টুকে নিয়ে বললেন, যখন ইচ্ছে আসবেন। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

একশো টাকা মাইনের সংবাদদাতা হলেও সেদিন আমি হঠাৎ জয় করার আনন্দ নিয়ে তিনমূর্তি ভবন থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর থেকে আমি মাঝে মাঝেই সকাল বা বিকেলের দিকে তিনমূর্তি ভবনে যাই। কোন দিন নেহরুর সঙ্গে দেখা হয়, কোন দিন হয় না, কিন্তু তিনমূর্তি ভবনে গিয়ে যেটা নিয়মিত উপভোগ করি তা হচ্ছে মৌজ করে চা-কফি স্যাণ্ডউইচ-কাজু খাওয়া। কিছুদিন যাতায়াত করার পর সিগারেটও পেতাম। তারপর একদিন নেহরু হঠাৎ কালীবাবুকে সামনে দেখে আমাকে দেখিয়ে বললেন, লুক আফটার দিস নটি বেঙ্গলী জার্নালিষ্ট!

চুড়িদার-শেরওয়ানী পরা এই বেঁটে-খাটো মানুষটিকে তিনমূর্তি ভবনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে দেখতাম কিন্তু জানতাম না উনি বাঙালী। আর জানতাম না তিনমূর্তি ভবনের স্থায়ী বাসিন্দা ও সমস্ত অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব ওর। কালীবাবুর সঙ্গে ভাব হবার পর আমাকে দেখে কে! ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে তিনমূর্তি ভবনে পৌঁছেই কালীবাবুকে স্মরণ করি। আমি কিছু বলার আগেই কালীবাবু বলেন, আজ আপনাকে চিকেন রোস্ট খাওয়াব। কোন দিন আবার আসার আগে আমার পকেটে কিছু সিগারেট দিয়ে দেন।

কয়েকটা মাস বেশ কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার পত্রিকার বেনিয়া মালিক আমার কাজে খুশি হয়ে তিরিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। খুশি না হবার কারণ ছিল না। একশো টাকা মাইনের বিনিময়ে আমি নিয়মিত শুধু এক্সক্লুসিভ খবরই দিতাম না, দিল্লীর নিদারুণ শীত-গ্রীষ্মের মধ্যেও পায়ে হেঁটে হেঁটে একশো কপি ইংরেজি সাপ্তাহিক ভি-আই-পিদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতাম। মাইনে বাড়ার কিছু দিনের মধ্যেই প্রেস কার্ডও পেলাম। টেম্পোরারি কার্ডের দৌলতে পার্লামেন্ট যাতায়াত আগে থেকেই চলছিল। প্রেস

কার্ড পাবার পর নানা মন্ত্রণালয়েও যাতায়াত শুরু করলাম।

পার্লামেণ্ট হাউস আর সাউথ ব্লকে যাতায়াত শুরু করার পর তিনমূর্তি ভবনে যাতায়াত কমে গেল। কখনও পার্লামেণ্ট হাউসে, কখনও সাউথ ব্লকে নেহরুর সঙ্গে দেখা হয়। সব সময়ই উনি হেসে কথা বলেন, আমার খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। আমি অনুপ্রাণিত বোধ করি।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। পার্লামেণ্ট হাউসের প্রেস গ্যালারী থেকে বেরিয়ে এসে প্রেস রুমের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। আরো অনেক সাংবাদিক ওখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলেন। দু-চারজন অবাঙালী সাংবাদিক ছাড়া কেউই আমার সঙ্গে কথা বলতেন না। নগণ্য পত্রিকার তুচ্ছ সাংবাদিকের সঙ্গে কী খ্যাতনামা পত্রিকার সাংবাদিকরা কথা বলতে পারেন? তখন দিল্লীতে যে দু-একজন বাঙালী সাংবাদিক ছিলেন, তারা কখনও ভুল করেও আমার সঙ্গে কথা বলতেন না।

সেদিন কয়েকটি পার্লামেণ্টারী কমিটির ইলেকশন ছিল। মন্ত্রী এম. পি-রা প্রেস রুমের পাশের কমিটি রুমে ভোট দিতে এলে তাঁদের অনেকেই সাংবাদিকদের সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। আমার পরিচিত মন্ত্রী এম. পি-রা আমার সঙ্গেও কথা বলছিলেন। সারাদিনই এইভাবে চলেছে। দুটো-আড়াইটের মধ্যে প্রায় সব এম. পি. ভোট দিয়ে চলে গেছেন। বারান্দায় সাংবাদিকদের ভীড়ও কমে এসেছে। এমন সময় হঠাৎ নেহরু ভোট দিতে এলেন।

কমিটি রুমে ভোট দিয়ে নেহরু বেরিয়ে আসতেই এম. পি ও সাংবাদিকরা সসম্ভ্রমে পাশে সরে দাঁড়ালেন। নেহরু ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। ওরাও হাসলেন। অনেকে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। তারপর আমি দু-এক পা এগুতেই উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?

আমি হেসে বললাম, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

নেহরু লিফট্-এর দিকে না গিয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে কথা

বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে নিজের ঘরে ঢুকলেন। আমি ওঁর ঘরের দরজা থেকে আবার ওপরে আসতেই সবার আগে বাঙালী সাংবাদিকরা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে প্রথম কথা বললেন। অন্য সাংবাদিকরাও এগিয়ে এলেন। অনেকেই প্রশ্ন করলেন, পণ্ডিতজী তোমাকে চিনলেন কী করে? অনেকে প্রশ্ন করলেন, কী বললেন প্রাইম মিনিস্টার? ওদের সবাইকেই আমি বললাম, উনি আমাকে স্নেহ করেন। তাই আমাকে আমার খবরাখবর জিজ্ঞেস করছিলেন। কথাটা বিশ্বাস করতে কারুরই ইচ্ছা করছিল না কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলেন তাকে অবিশ্বাস করাও সম্ভব ছিল না। দিল্লীর সাংবাদিকরা সেদিনই আমাকে প্রথম সহকর্মীর মর্যাদা দিলেন।

ঐ কয়েক মিনিটের জন্য নেহরু আমার কাঁধে হাত রেখে কথা বলার জন্য দিল্লীর রাজনৈতিক শেয়ার মার্কেটে আমার দাম চড়চড় করে বেড়ে গেল। পার্লামেন্টের সেণ্টাল হলের আড্ডাখানায় আমি আর উপেক্ষিত না। অনেক এম. পি ও সাংবাদিকরা প্রায় জোর করে কফি খাওয়ান, হাসিঠাট্টা-গল্পগুজব করেন। এখানে ওখানে যাবার সময় অনেক সাংবাদিকই আমাকে তাদের গাড়িতে লিফট্ দেন। ঐ পরশপাথর নেহরুর ছোঁয়ায় আমার জীবন কেমন বদলে গেল।

আমরা ছোটবেলায় গান্ধীজি, পণ্ডিতজী (নেহরু), সুভাষচন্দ্র, প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, জিন্না, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, খান আবদুল গফুর খান (সীমান্ত গান্ধী) প্রভৃতি নেতার নাম নিত্য শুনতাম। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময়ই জয়প্রকাশ, লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, আচার্য নরেন্দ্র দেব, অরুণা আসফ আলী প্রভৃতির নাম আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হক, নাজিমুদ্দীন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ছাড়াও স্বমহিমায় শ্যামাপ্রসাদ নেতা ছিলেন। মোটামুটি এদের নামই সত্যি খবরের কাগজে বেরুত।

খুব ছোটবেলায় যে নেতাদের সান্নিধ্যে আসি তারা হলেন সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ ও ফজলুল হক। তখন আমরা থাকি রিপন স্কুল-কলেজের পাশের গলি অখিল মিস্ত্রী লেনে। বিকেলবেলায় নিত্য খেলাধূলা করতে যাই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। হঠাৎ এক একদিন দেখতাম, লরী থেকে মঞ্চ তৈরির সাজসরঞ্জাম নামল। দেখতে দেখতে চোখের সামনে আধঘণ্টার মধ্যে দশ-বিশটা পার্টস জোড়া দিয়ে সুন্দর মঞ্চ তৈরি হল। মঞ্চে ওঠার সুন্দর ঘোরানো সিঁড়ি, মঞ্চের চারপাশে রেলিং। তবে মঞ্চ বড় হত না। একজন বা বড়জোর তুজনের বসার জায়গা হত মঞ্চের উপরে। তখন একজন বা তুজনের বক্তৃতার জন্যই সভা হত। আজকাল বক্তা ও নেতার সংখ্যা অসংখ্য বলে মঞ্চের চেহারাও বদলে গেছে। সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব জনসভাই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হত। আমরা বাচ্চারা মঞ্চের পাশেই থাকতাম। তারপর হঠাৎ জ্যোতিষ্কের মত হাজির হতেন সুভাষচন্দ্র! পিছন পিছন পিতৃবন্ধু ও আমাদের গ্রামের প্রতিবেশী অমূল্যদা— সুভাষবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি। অমূল্যদা ও রিপন কলেজের কয়েকজন সুভাষভক্তের কল্যাণে ঐসব মিটিং-এ আমিই সুভাষবাবুকে মালা পরাতাম। আহা! সে কী গর্বের ও আনন্দের কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত!

কেন জানি না, বাবা মাঝে মাঝেই সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়িতে যেতেন। আমি তখন এত ছোট যে বাসায় আমাকে একলা রেখে যাওয়া সম্ভব নয় বলে বাবা সব সময়ই আমাকে সঙ্গে নিতেন অমূল্যদার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর বাবা কখনও কখনও সুভাষবাবু সঙ্গেও দেখা করতেন। এই সুযোগে আমিও সুভাষবাবুর এক আদর খেতাম। এ ছাড়াও বাবা আমাকে কখনও কখনও সারা দিনের জন্য বেলাদির (সুভাষচন্দ্রের প্রিয় ভাইঝি ও বাবার ছাত্র হরিদাস মিত্রের স্ত্রী) কাছে রেখে যেতেন বলে ছোটবেলায় বিস্ময়ভরা তুটি চোখ দিয়ে খুব কাছ থেকেই সুভাষচন্দ্রকে দেখতাম।

বাবার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের কাছেও গেছি বহুবার। ওঁরই পরামর্শে

আমি বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে মাসিক তিনটাকা বৃত্তি পাওয়ায় উনি খুবই খুশি হন এবং আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। খবরের কাগজের রিপোর্টার হওয়ায় উনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

এ ছাড়া ছোটবেলায় অন্য যে রাজনীতিবিদের কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছি তিনি গরীব বাঙালীর অকৃত্রিম বন্ধু ফজলুল হক। হকসাহেব সুভাষচন্দ্র বা শ্যামাপ্রসাদের মত অত সুপুরুষ ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু যেমন দীর্ঘকায় ছিল তাঁর দেহ, তেমনই সীমাহীন ছিল তাঁর ঔদার্য। ফজলুল হক সাহেবকে প্রথম দেখি স্কুলের ঈদ উৎসবে। তখন সেকুলার স্টেটের জন্ম হয়নি বলে আমরা ছোটবেলায় সমান আনন্দে স্কুলের সরস্বতী পূজায় প্রসাদ আর ঈদের মিষ্টি খেতাম। এর পর কোন আবেদন-নিবেদন করার ব্যাপারেই বাবার সঙ্গে হকসাহেবের বাড়ি যাই।

হকসাহেবের কথা আজকের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভুলে গেছে বলেই দু-একটা কথা না লিখে পারছি না। বাবা অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুসলমান-খৃস্টানদের পছন্দ না করলেও ফজলুল হক সাহেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও পছন্দ করতেন। ঐ ছোটবেলাতেই হকসাহেবের প্রতি বাবার এই মনোভাব দেখেই বুঝতাম, মানুষটি কত মহৎ ছিলেন।

পি-টি-আই-এর ভূতপূর্ব ম্যানেজার নৃপেনদার কাছে অনেক নেতা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনলেও মনে আছে শুধু একটি। নৃপেনদা তখন রিপোর্টার, হকসাহেব তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। একদিন সকালে নৃপেনদা হকসাহেবের পার্ক সার্কাসের বাড়ি গেছেন। যথারীতি বহুজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এবং হকসাহেব নৃপেনদার সামনেই সবার সঙ্গে কথা বলছেন। সব শেষে এলেন সাদা থান পরা এক বিধবা। হকসাহেবের বন্ধুর স্ত্রী। এসেছেন মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু সাহায্যের আশায়। হকসাহেবের কাছে কোন টাকা না থাকায় অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন কিন্তু অসহায়া বিধবাকে ফিরিয়ে দিলেন না। কাবুলিওয়ালাকে ডেকে তার কাছ থেকে ধার করে

হকসাহেব ঐ বিধবাকে সাহায্য করলেন। শ্যামাপ্রসাদ আর ফজলুল হকের মত আর কেউ এমন ভাবে বাঙালীকে ভালবেসেছেন ও নির্বিচারে বাঙালীকে সাহায্য করেছেন বলে শুনিনি এবং বিশ্বাসও করি না।

তখন দেশে এত বড় বড় নেতা ছিলেন কিন্তু নেহরু আর সুভাষচন্দ্রের মত এমন গ্ল্যামার ও জনপ্রিয়তা আর কারুর ছিল না। দেশ যখন স্বাধীন হল তখন সুভাষচন্দ্র নেতাজী হয়ে কোথায়, তা কেউ জানে না। নেহরু হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাইতো রিপোর্টারদের কাছে তিনি অস্বাভাবিক আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু কলকাতায় এলে তাঁর জনসভা বা সাংবাদিক সম্মেলনে কখনই আমার মত তরুণ রিপোর্টারদের যেতে দেওয়া হত না। দমদম এয়ারপোর্টে প্রধানমন্ত্রীর পৌঁছানো বা অনুরূপ ছোটখাট অনুষ্ঠানেই নেহরুকে দেখতাম এবং তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করতাম। নেহরুকে প্রথম খুব কাছ থেকে কয়েক দিনের জন্য দেখার সুযোগ পেলাম ১৯৫২ সালের নভেম্বরে।

নানা অনুষ্ঠানের জন্য মাঝে মাঝেই কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি সোসাইটিতে যাই। পরিচয় ছিল সেক্রেটারি দেবপ্রিয় বলীসিংহের সঙ্গে। ওর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জীনরত্নও ভাল ভাবেই চিনতেন। ওদের কাছেই শুনলাম, মহাবোধি সোসাইটির হীরক জয়ন্তী হবে সাঁচীতে এবং ঐ উপলক্ষে বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে ভগবান বুদ্ধের দুই পরম প্রিয় শিষ্য সারিপুত্তা ও মোগল্লানের পূতাস্থি ভারতে ফিরে আসছে। শুধু তাই নয়, এই অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু যোগদান করবেন। বড় লোভ হল সাঁচী যাবার—কিন্তু উপায় ?

স্থির জানতাম, সাঁচী উৎসব কভার করার জন্য ব্যর্থ সোস্যালিষ্ট ও মেরুদণ্ডবিহীন ভূতপূর্ব কংগ্রেসীদের দ্বারা পরিচালিত লোকসেবক থেকে এক পয়সাও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া নেহরু ও শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে ওদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। টিউশানির পয়সা কিছু অগ্রিম

নেওয়া যায় কিন্তু তা দিয়ে কী সাঁচী যাওয়া যায় ?

অসম্ভব।

শ্যামাপ্রসাদ তখন মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি। একদিন সকালে চলে গেলাম ওঁর ভবানীপুরের বাড়িতে। প্রণাম করতেই জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছিস ?

ভাল।

বাবা কেমন আছেন ?

ভাল।

এখনও লোকসেবকেই আছিস ?

হ্যাঁ।

কোন খবর-টবরের জন্য এসেছিস ?

না।

তাহলে ? অন্য কিছু দরকার আছে ?

আমি সোজাসুজি বললাম, মহাবোধি সোসাইটির সাঁচী উৎসবে যাবার খুব ইচ্ছে কিন্তু লোকসেবক তো কিছু দেবে না, তাই····

শ্যামাপ্রসাদ বললেন, অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা তো হবেই, তাছাড়া ওখানে থাকা-খাওয়ার জন্যও কিছু খরচ করতে হবে না। তাহলে হবে তো ?

আমি একগাল হেসে বললাম, তাহলে যেতে পারব।

শ্যামাপ্রসাদ তখনই মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারি দেবপ্রিয় বলীসিংহকে টেলিফোনে আমার বিষয়ে বলে দিলেন।

তখন আমার কী আনন্দ ও উত্তেজনা! ম্যাপ আর রেলের টাইম টেবিল দেখলাম বার বার। ধানবাদ, গয়া, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, জব্বলপুর হয়ে ইটারসী যেতে হবে বোম্বে মেলে। সেখান থেকে ভূপাল হয়ে সাঁচী। বাপরে বাপ! সে কী এখানে ? ঐ অত দূরে যাব আমি ?

তখন বোধ হয় কলকাতা থেকে সাঁচীর ভাড়া ছিল গোটা পঁচিশেক টাকা। তাই এদিক-ওদিক থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে গোটা পঞ্চাশেক টাকা জোগাড় করলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া প্রেস কার্ড তো

ছিলই, তাছাড়া লোকসেবক থেকে চিঠিপত্রও নিলাম। এত কম খরচে সাঁচী যাওয়া যাবে শুনে দুজন বন্ধুও জুটে গেল। তাদের একজন প্রেস ফটোগ্রাফার হবার লোভে ক্যামেরা নিয়ে লোকসেবকে আসা-যাওয়া করত। সাঁচীর অনুষ্ঠানে প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করার জন্য সেও লোকসেবক থেকে চিঠিপত্র পেয়ে গেল।

এখানে বলা দরকার সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশে যেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশী চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগে। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে ১৯৫০ সালের এপ্রিলে শ্যামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশ নিয়োগী পদত্যাগ করায় সারা দেশ চমকে গিয়েছিল এবং পদত্যাগের পর ওঁরা দুজনে হাওড়া স্টেশনে যে জন-সম্বর্ধনা ওঁরা পান, তার তুলনা হয় না। শ্যামাপ্রসাদ সে বছরই জন-সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে নেহরু নীতির নির্ভীক সমালোচক হিসেবে এক ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টি করেন। ১৯৫০-এর ডিসেম্বরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মারা যাবার পর মৌলানা আজাদ বেঁচে থাকলেও ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অন্যতম নায়ক শ্যামাপ্রসাদই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁকে নেহরু শুধু সমীহ না, ভয়ই করতেন। শ্যামাপ্রসাদ তখন কংগ্রেস সরকারের বিভীষিকা। সাম্প্রদায়িকতাবাদীর নিন্দা ও গ্লানি মাথায় করেও শ্যামাপ্রসাদ সারা-দেশেই অস্বাভাবিক জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

আমি যেদিন সাঁচী রওনা হব, তার আগের দিন বিকেলে পার্ক সার্কাস ময়দানে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা দেবার কথা। সরকারের এমন সাহস ছিল না যে ১৪৪ ধারা জারী করে শ্যামাপ্রসাদের সভা বন্ধ করে দেবেন অথচ দুশ্চিন্তারও শেষ নেই। রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার ও কলকাতার রাজনৈতিক মহলে ফিস ফিস করে বলাবলি হচ্ছে, পার্ক সার্কাস ময়দানে শ্যামাপ্রসাদ বক্তৃতা দেবার পর পরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। আমার ভয়, শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতার পর পরই যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়, ফলে যদি উনি সাঁচী যেতে না

পারেন, তবে আমার সাঁচী যাওয়া হবে না।

মিটিং শুরু হবার অনেক আগেই পার্ক সার্কাস পৌঁছে আমি অবাক। যেমন অভূতপূর্ব জনসমাগম, সেই রকম পুলিশী ব্যবস্থা। চারদিকে থমথমে ভাব। আতঙ্কিত মন নিয়েই রিপোর্টারদের টেবিলে বসলাম। শ্যামাপ্রসাদ এলেন। অনন্য বাগ্মীতার সঙ্গে বক্তৃতা দিলেন নেহরুর পাকিস্তান নীতি, কাশ্মীর নীতির তীব্র সমালোচনা করে। শান্তিপূর্ণ ভাবেই সভা শেষ হল। শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ থেকে নেমে গাড়িতে ওঠার জন্য গেটের দিকে যাচ্ছেন দেখেই আমিও দৌড়ে গেলাম। শ্যামাপ্রসাদকে ঘিরে বহু মানুষের ভীড়। তার মধ্যে আমিও আছি। গাড়িতে ওঠার আগে উনি পিছন ফিরে তাকালেন। ভাগ্যক্রমে আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, তুই কাল রওনা হচ্ছিস তো ?

হ্যাঁ।

আমি দিল্লী হয়ে সাঁচী যাব। ওখানে পৌঁছেই আমার সঙ্গে দেখা করিস।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

তারপর একদিন সত্যি সত্যি বোম্বে মেলে চেপে অনেক ছোট-বড় স্টেশন পার হয়ে ইটারসী পৌঁছলাম। সেখান থেকে ভূপাল হয়ে সাঁচী। প্রেস ক্যাম্পে পৌঁছেই জানতে পারলাম, কয়েক ঘণ্টা আগেই শ্যামাপ্রসাদ এসে গেছেন। একটু পরেই ওঁর ক্যাম্পে গেলাম। প্রণাম করতেই জিজ্ঞেস করলেন, প্রেস ক্যাম্পে জায়গা পেয়েছিস তো ?

হ্যাঁ।

ওখানে অসুবিধে হলে আমার তাঁবুতে চলে আসতে পারিস। এখানে অনেক জায়গা আছে।

না না, ওখানে কোন অসুবিধে হবে না।

গণিতশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ পাশেই বসেছিলেন। উনি বললেন, অফিসে গেলেই খাবারের কুপন দিয়ে দেবে। নিয়ে নিস।

হ্যাঁ নেব।

এবার শ্যামাপ্রসাদ বললেন, কলকাতায় টেলিফোন করতে হলে আমার এখানে চলে আসিস।

হ্যাঁ, আসব।

প্রেসে টেলিগ্রাম না করে শ্যামাপ্রসাদের তাঁবু থেকেই টেলিফোন করে রোজ লোকসেবকে খবর পাঠাতাম।

পরের দিন সকালে নেহরু আর রাধাকৃষ্ণণ এলেন। শ্যামাপ্রসাদ রাধাকৃষ্ণণকে নিয়ে সাঁচীর ঐতিহাসিক স্তূপ দেখতে যাবার সময় আমাকেও সঙ্গে নিলেন এবং তিনিই রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তী কালে আমি রাধাকৃষ্ণণের পরম স্নেহভাজন হই এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত আমার সঙ্গে নিয়মিত দেখাশুনা ও যোগাযোগ ছিল।

শ্যামাপ্রসাদ আর রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাঁচীর স্তূপ দেখলাম।

ভগবান বুদ্ধ নিজে সাঁচী না এলেও সম্রাট অশোকের জন্য সাঁচী বৌদ্ধ সভ্যতা ও শিল্পের অনন্য নিদর্শন হয়ে আছে। সাঁচীর স্তূপ নির্মাণের আগেই সম্রাট অশোকের স্ত্রী এর কাছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য মঠ তৈরি করেছিলেন এবং সে জন্যই বোধ হয় অশোক এখানে এই স্তূপগুলি নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এখান থেকেই সিংহল যাত্রা করেন।

মোগল সম্রাট আউরঙ্গজেব অনেক সৌধ, অনেক মঠ-মন্দির ধ্বংস করলেও সাঁচীর স্তূপগুলি ধ্বংস করেননি। ভূপাল থেকে মাইল তিরিশেক দূরে হওয়ায় বোধ হয় তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। যাই হোক মোগল আমলে ও তার পরবর্তী কালের দীর্ঘ অবহেলায় সাঁচীর এই অনন্য ও ঐতিহাসিক স্তূপগুলো মাটির তলায় হারিয়ে যায়। ১৮১৮'তে এগুলির সন্ধান পাওয়া গেলেও এর প্রায় একশো বছর পরে উদ্ধারকার্য শুরু হয়। ইতিমধ্যে বহু বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিক দু'হাতে চুরি করেন সাঁচীর অসাধারণ শিল্পকার্যের বহুকিছু। সম্রাট অশোক সারা দেশে

প্রায় ৮৪ হাজার স্তূপ নির্মাণ করেন এবং তার মাত্র আটটি এই সাঁচীতে হলেও এগুলি বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। অনেক কিছু হারিয়ে যাবার পরও আজো যা আছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। মুগ্ধ হতে হয় তোরণগুলি দেখে। (দিল্লীতে ইউনেস্কো—UNESCO সম্মেলনের জন্য যখন বিজ্ঞান ভবন তৈরি হয় তখন নেহরু ও রাধাকৃষ্ণণের পরামর্শ অনুযায়ী এর প্রধান প্রবেশ-পথ সাঁচীর তোরণের মত করে তৈরি করা হয়।)

মহাবোধি সোসাইটির প্রধান অনুষ্ঠান শেষ হবার কিছু পরে শ্যামাপ্রসাদের তাঁবুতে যেতেই উনি বললেন, কাল আমরা বিদিশা আর উদয়গিরি যাব। তুই যাবি নাকি ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

প্রায় রামভক্ত হনুমানের মত হাত জোড় করে তাঁবুর এক কোণায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ভূপালের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা। (ইনিই পরবর্তী কালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতি হন।) ওর দিকে তাকিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বললেন, শঙ্করদয়াল, কাল আমার আর নেহরুর সঙ্গে নিমাই-এর যাবারও ব্যবস্থা করো।

ডাঃ শর্মা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে বললেন, হ্যাঁ স্যার, সব ব্যবস্থা করে দেব।

নেহরু আর শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে বিদিশা ও উদয়গিরি যাব শুনে আমি যেন মনে মনে হাতে স্বর্গের ছোঁয়া পেলাম।

সাঁচীর উৎসবের পর রাধাকৃষ্ণণ দিল্লী ফিরে গেলেন জরুরী কাজে। পরের দিন সকালে নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ ও লেডী পেথিক লরেন্সের সঙ্গে অন্যান্য অনেকের মত আমিও উদয়গিরিতে হিন্দু ও জৈনদের কীর্তি দেখলাম, সম্রাট অশোকের অমর সৃষ্টি বিদিশা মহানগরীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও আজো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কত কী! ভগবান যীশুর জন্মের নব্বই বছর আগে এই শহরেই তো রাষ্ট্রদূত হেলিওডোরাস আসেন এবং পরবর্তী কালে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই স্বর্ণযুগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ঘুরলাম

নেহরু আর শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে। মনে পড়ছে কয়েকটা টুকরো টুকরো ঘটনা—

উদয়গিরির পাহাড়ের সামনে গাড়ি থামল। নেহরু চটপট এগিয়ে গেলেও পিছিয়ে পড়লেন শ্যামাপ্রসাদ। একে ভারী শরীর, তার ওপর হাই ব্লাড প্রেসারের রুগী। মহা বিপদে পড়লেন চীফ কমিশনার ভগবান সহায় (পরবর্তী কালে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ও রাজ্যপাল), মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শর্মা ও অন্যান্য সঙ্গীরা। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পাশে পাশে থাকা উচিত মনে হলেও শ্যামাপ্রসাদকে উপেক্ষা করার সাহস নেই। তাই তাঁরা একবার নেহরুর কাছে গিয়েই আবার দৌড়ে ফিরে আসেন শ্যামাপ্রসাদের পাশে। শ্যামাপ্রসাদ নিজেই উদ্যোগী হয়ে ওদের বললেন, আমার জন্য এত দৌড়াদৌড়ি করছ কেন ? যাও যাও, প্রাইম মিনিস্টারকে দেখ।

শ্যামাপ্রসাদ বললেই কী ওরা তাঁকে ফেলে নেহরুর কাছে যেতে পারে ? তাই ভগবান সহায় রইলেন নেহরুর পাশে আর ডাঃ শর্মা রইলেন শ্যামাপ্রসাদের কাছে।

পাহাড়ের ওপর ওঠার পর নেহরু পিছন ফিরে দেখলেন, শ্যামাপ্রসাদ বেশ খানিকটা পিছনে রয়েছেন। নেহরু হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদের হাত থেকে ছড়িটা কেড়ে নিয়ে এলেন। তারপর শ্যামাপ্রসাদ পাহাড়ের ওপর আসতেই নেহরু হাসতে হাসতে বললেন, ডক্টর মুখার্জী, ইওর স্টিক এ্যারাইভড্ বাট ইউ ডিড'নট্ !

শ্যামাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার ছড়ি সব সময়ই তোমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে।

নেহরু চুপ।

সাঁচীতে এবং এই উদয়গিরি-বিদিশায় দুটি দিন নেহরু ও শ্যামাপ্রসাদকে খুব কাছ থেকে দেখে স্পষ্ট বুঝেছিলাম, নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন। আর শ্যামাপ্রসাদ ? নেহরুকে নিশ্চয়ই অপমান করতেন না কিন্তু অগ্রাহ্য করতেন। চীফ কমিশনার, মুখ্যমন্ত্রী, ভারত সরকারের বড় বড় অফিসাররা শ্যামাপ্রসাদকে বাঘের

মত ভয় করতেন।

পরবর্তী কালে নেহরুকে ও নানা দলের বহু বিখ্যাত নেতাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছি। বিরোধী দলগুলির প্রায় সব বিখ্যাত ও বিশিষ্ট নেতারাই নেহরুকে দেখলে কুঁকড়ে যেতেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তৈরি গুহা দেখে বেরিয়ে আসতেই নেহরু দেখলেন, একটু দূরে একটা সুন্দর ছোট্ট গ্রাম্য মেয়ে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নেহরু তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে ঘোমটা সরিয়ে দিয়েই হাসতে হাসতে সঙ্গীদের ইংরেজিতে বললেন, আমি যদি ওর সমবয়সী হতাম তাহলে এখান থেকে আমি নড়তে পারতাম না। নেহরুর কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

আবার আমরা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি। আমি নেহরুর পাশে পাশে হাঁটছি। হঠাৎ উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, ভাল করে ইতিহাস পড়েছ?

না, তেমন ভাল করে পড়িনি।

ভাল করে ইতিহাস পড়বে। ইতিহাস না জানলে কী সাংবাদিকতা করা যায়?

পরবর্তী কালে দিল্লী গিয়ে নেহরুর ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাবার পর পরই ওঁরই লেখা ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া খুব ভাল করে পড়ে নিই।

নেহরু ও আমার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকলেও তিনমূর্তি ভবনের সেই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার পর আমার সব ভয়, দ্বিধা কেটে গেল। তাছাড়া ভয় করব কেন? আমি কী অন্যায় করেছি? সিংহের সঙ্গে খেলা করতে মুষিক কী দ্বিধা করে? শুধু স্নেহ আর আশীর্বাদ ছাড়া তাঁর কাছে আমার কোন প্রত্যাশা ছিল না বলেই আমি প্রাণ খুলে তাঁর কাছে গেছি। তাছাড়া এ সংসারে কিছু কিছু মানুষ থাকেন, যারা ভালবাসতে ভালবাসেন। নেহরু এই রকমই

একজন অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। শুধু মানুষকে না, পশুপক্ষী, গাছপালাকেও তিনি ভালবাসতেন।

মনে পড়ে সকালবেলার দিকে তিনমূর্তি ভবনে গিয়ে কত দিন নেহরুর সঙ্গে পিছন দিকের লনে গেছি। সাউথ ব্লকের অফিসে রওনা হবার আগে নেহরু প্রতিদিন তাঁর গৃহবাসী জীবজন্তুদের আদর করতেন। কত দেশের কত রকমের জীবজন্তু ছিল পিছন দিকের লনে। কেউ হিংস্র, কেউ বিষাক্ত, কেউ চঞ্চল, কেউ লাজুক। তা হোক, নেহরু নির্বিচারে তাদের সঙ্গে খেলা করতেন। শতসহস্র কাজ থাকলেও উনি ওদের আদর করতে ভুলতেন না। কোন কোন জীবজন্তু দেখে আমাদের ভয় বা ঘৃণা হত কিন্তু নেহরুর মনে ভয়ও ছিল না, ঘৃণাও ছিল না। একদিন একটা বাঘের বাচ্চা হঠাৎ কোন কারণে রেগে কামড়াতে যেতেই আমরা পিছিয়ে গেলাম কিন্তু নেহরু এক ইঞ্চি নড়লেন না। নেহরু সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গালে এক থাপ্পড় দিয়ে বেশ রাগ করেই বললেন, অসভ্য কোথাকার! নেহরু শাসন করতেই বাঘের বাচ্চা ভয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। যে ভালবাসে তার শাসন করারও অধিকার আছে—এ কথা বাঘ-ভাল্লুকও জানে। বকুনি দেবার পরই নেহরু হাসতে হাসতে ওকে আদর করলেন। ওদের দেখাশুনা আদর-ভালবাসার পর্ব শেষ হবার পর নেহরু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, The world is a funny place! Like human beings, they, too. have a role to play here.

যে মানুষের মনে এত ভালবাসা, তাঁকে ভয় করব কেন?

একদিন কথায় কথায় বললাম, সারাদিনই তো কাজকর্ম করেন। তারপর যেটুকু সময় পান, তখন পড়াশুনা করেন। একদিন সন্ধেবেলায় আর কিছু না করে গান শুনুন।

গান?

আমি বললাম, হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের গান।

কে গাইবেন?

আমার এক বিশিষ্ট শিল্পীবন্ধু।

নিশ্চয়ই শুনব।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীকে ডেকে বললেন, ইন্দু, ভট্টাচারিয়ার এক বন্ধু খুব নাম করা গায়ক। উনি টেগোর সঙ শোনাবেন। তুমি ব্যবস্থা করো।

ইন্দিরা গান্ধী মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

শিল্পীবন্ধু কলকাতায় থাকেন। দিন-ক্ষণ ঠিক করে তাঁকে চিঠি লিখব। তাই কবে পণ্ডিতজীর সময় হবে জানবার জন্য দু'তিন দিন পরে তিনমূর্তি ভবনে যেতেই শ্রীমতী গান্ধী আমাকে বললেন, বাবা বলেছেন বড় পিসীর (শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) জন্মদিনেই গানের আয়োজন করতে।

আমি চিঠি লিখলাম শিল্পীবন্ধু বিমলভূষণকে। বন্ধুবর সানন্দে পণ্ডিতজীকে গান শোনাবার জন্য দিল্লী আসতে রাজী হলেন। নির্দিষ্ট দিনের আগেই উনি দিল্লী এলেন। তারপর অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন শ্রীমতী গান্ধী আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনমূর্তি ভবনে হাজির হতেই দেখি, সি-পি-ডবলিউ-ডি এবং আর্মি সিগনালস্-এর কয়েকজন পদস্থ অফিসারও হাজির। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের সবাইকে দোতলার ড্রইংরুমে ডেকে বললেন, এখানেই গানের আসর বসবে। মঞ্চ হবে পশ্চিম দিকে। এবার ওদের সামনেই উনি আমাকে বললেন, কী রকম মঞ্চ চাও, মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা কি করতে হবে, সব এদের বুঝিয়ে দিও। সামান্য ঘরোয়া অনুষ্ঠান হলেও সে সম্পর্কে নেহরু ও শ্রীমতীর গান্ধীর আগ্রহ ও যত্নের ত্রুটি নেই। শিল্পীকে নিয়ে আসার জন্য কখন ক'খানা গাড়ি চাই তাও জেনে নিলেন শ্রীমতী গান্ধী।

পরের দিন অনুষ্ঠান শুরু হবার ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছতেই শ্রীমতী গান্ধী বললেন, সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখে নাও। আর কিছু করতে হলে লোকজনদের বলে দাও। হাজার হোক নেহরুর বাড়ির অনুষ্ঠান। তদারক করছেন শ্রীমতী গান্ধী নিজে। সুতরাং কী ত্রুটি থাকবে সেখানে?

অন্য দিনের চাইতে অনেক আগেই নেহরু অফিস থেকে চলে এলেন। পোশাক বদলে নিয়ে আমাদের কাছে আসতেই শিল্পীবন্ধু বিমলভূষণ, সুবোধদা ও দীপ্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। শ্রীমতী গান্ধী নিজে এসে চা দিয়ে গেলেন। এর একটু পর থেকে সেদিনের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে ড্রইংরুম পূর্ণ হল। বিমলভূষণ মঞ্চে বসলেন। তবলায় দিল্লীর একটি ছেলে, তানপুরায় দীপ্তি। আমি শিল্পীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মঞ্চের পাশেই নেহরু ও শাস্ত্রীর কাছে বসলাম। আমাদের কাছেই বসলেন আমার পরম শুভাকাঙ্খী সুবোধদা (ব্যানার্জী)। সেদিন অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর ছেলে পি. এন. সপ্রু, এম. পি, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীমতী উমা নেহরু, লেডী রমা রাও, বদরুদ্দীন তায়েবজী, এয়ার মার্শাল সুব্রত ও শ্রীমতী সারদা মুখার্জী, শ্রীমতী নয়নতারা সায়গল এবং নেহরু পরিবারের আরো কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা।

বিমলভূষণ একের পর এক রবীন্দ্রনাথের গান শোনান। আমি হিন্দী-ইংরেজিতে তার মর্মার্থ বলি নেহরু ও শাস্ত্রীজিকে। শ্রীমতী গান্ধী এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে করতে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে বসছেন। কথা ছিল ঘণ্টাখানেক গান হবে কিন্তু আসর এমন জমে উঠল যে অনায়াসে দু'ঘণ্টা কেটে গেল। তাও কী শেষ হয়? শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত শ্রীমতী সারদা মুখার্জীকে জোর করে টেনে এনে বসিয়ে দিলেন মঞ্চে। শ্রীমতী মুখার্জী আর বিমলভূষণের দ্বৈত সঙ্গীত হল।

অনুষ্ঠান শেষে ভুরিভোজন ও গল্প চলল আরো ঘণ্টাখানেক। সেদিন কালীবাবু না, শ্রীমতী গান্ধী নিজেই আমাদের খাওয়ালেন।

তখনও আমার অন্ধকার কাটেনি। একটু পাতলা হয়েছে মাত্র। আমার হিন্দী পত্রিকার শেঠজী তিরিশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে একশো তিরিশ দিচ্ছেন। আর দিয়েছেন একখানা সাইকেল। একশো

তিরিশের মধ্যে বাড়ি ভাড়া দিই পঞ্চাশ টাকা। বাকি আশী টাকায় পরিবার প্রতিপালন। অনাহারে না হলেও অর্ধাহারে দিন কাটে। সারা চোখে-মুখে অপুষ্টির ছাপ। জামা-কাপড়ের অবস্থাও তথৈবচ। কোন কারণেই গণ্য-মান্য-বরেণ্য সাংবাদিকদের পর্যায় পড়ি না। তা হোক। তবু নেহরু আমাকে দূরে সরিয়ে রাখেন না।

বিশ্ববিশ্রুত আমেরিকান সাংবাদিক জন গান্থার নেহরুকে বলতেন An Englishman in India and Indian abroad. কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। অভিজাত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত ইংরেজদের মত নেহরু অত্যন্ত রুচিশীল ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনধারণের মধ্যে যে রুচির ছাপ ছিল, তা বিলেত ফেরত গান্ধী, প্যাটেল, সুভাষের মধ্যে দেখা যায়নি। তাছাড়া পাশ্চাত্য জগতের বিশিষ্ট মানুষদের মত বিশ্বসংসারের সব ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল। ফুল-ফল, পশু-পাখি, অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র, নাচ-গান, শিল্প-সাহিত্য, খেলাধূলা, হাসি-ঠাট্টা এবং আরো হাজার রকম বিষয়ে নেহরুর আগ্রহ ও ভালবাসা ছিল। বড়লাটের বাসভবন, ভাইসরয় হাউস তৈরি হয় ইংরেজ আমলে। তাই সেখানে সেখানে একটা সুইমিং পুলও আছে। পাশ্চাত্য দেশের মানুষ সাঁতার কাটতে ভালবাসেন। চার্চিল, রুজভেল্ট বা ক্রশ্চেভও রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহন করেও নিয়মিত সাঁতার কেটেছেন। ভাইসরয় হাউস —বর্তমানের রাষ্ট্রপতি ভবনের সুইমিং পুলে নেহরু ছাড়া আর কোন ভারতীয় নেতা সাঁতার কাটেননি। ক্ষমতা হস্তান্তরকালীন রাজনৈতিক ঘূর্ণীঝড়ের মধ্যেও নেহরু সময় ছিনিয়ে নিয়ে লেডী মাউণ্টব্যাটনের সঙ্গে এখানে সাঁতার কাটতেন। পরেও সাঁতার কেটেছেন কিন্তু কম।

বিশ্ববন্দিত বেহালা-বাদক ইহুদি মেনুহীন দিল্লী এলেন নেহরুর আমন্ত্রণে। থাকলেন কোথায়? নেহরুর ব্যক্তিগত অতিথি হয়ে তাঁরই শয়নকক্ষের পূর্ব দিকের ঘরে। এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা করতে পাঠালেন কন্যা ইন্দু—ইন্দিরাকে। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে দিল্লীতে যিনি সবচাইতে বেশী শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন, তাঁর নাম

নেহরু। শুভলক্ষ্মী, রুক্মিণী, আরুণ্ডেল, বিসমিল্লা, রবিশঙ্করের মত যশস্বী শিল্পীদের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন নেহরু। উপেক্ষিত চলচ্চিত্র শিল্পীদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যিনি প্রথম সম্মানিত করেন তিনিই এশিয়ান গেমস্-এর অন্যতম জন্মদাতা নেহরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পঙ্গু এশিয়ায় প্রথম এশিয়ান গেমস্ দিল্লীতে হয় তাঁরই আগ্রহে ও উৎসাহে এবং এই উপলক্ষ্যে তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় বাণীতে বলেছিলেন —Play the game in the spirit of the game. পরবর্তী কালে বিশ্ব খেলাধূলার বহু আসরে এই মন্ত্র বার বার উচ্চারিত হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে। নেহরু প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন গিরিরাজ হিমালয়কে, ভালবাসতেন গিরিরাজ বিজয়ী তেনজিংকে। তাই তো গড়ে তুললেন হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা বিস্ময়কর ছিল। নেহরু ছাড়া অন্য কেউ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলে আধুনিক শিল্প বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের এমন বিস্ময়কর অগ্রগতি হত না, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে বিদেশে গিয়েও ছুটে গিয়েছেন জর্জ বার্ণার্ডশ—আইনস্টাইনের কাছে। আর পড়াশুনার ব্যাপারে তো বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ছিল নেহরুর. ইতিহাস আর সাহিত্যই ছিল সব চাইতে প্রিয়। টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে ভাল ও প্রিয় লেখকদের বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই নেহরু প্রকাশককে বই পাঠাতে বলতেন। বিমান ডাকে বই এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব বই পড়তেন। নেহরুর পরিচিত অনেকেই কলকাতা-দিল্লী-বোম্বে-মাদ্রাজের বিখ্যাত বইয়ের দোকান থেকে সর্বশেষ বই কিনে উপহার দিতেন।, বহু দিন তিনমূর্তি ভবনে দেখেছি, নেহরু বইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে বলছেন, কয়েক মাস আগেই বইগুলি পড়েছি। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে বইগুলি কোন লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দেব।

যারা ওঁকে ভাল করে চিনতেন না, তারা সবিনয়ে বলতেন, কিন্তু এই বইগুলি তো মাত্র তিন-চার দিন আগেই ইণ্ডিয়াতে এসে পৌঁছেছে।

নেহেরু বলতেন, আমি আসল প্রকাশকদের কাছ থেকেই বই আনিয়ে পড়ি।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

একদিন কনট প্লেসে ঘুরতে ঘুরতে নেহরুর A Bunch of old Letters কিনে চিঠিগুলো পড়ি। সারা পৃথিবীর বহু বরেণ্য মানুষের চিঠিগুলি পড়ে বহু অজানা কাহিনী জানতে পারি। আর মনে মনে ভাবি, ভারতবর্ষে এই একজন মানুষই আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোলা, বার্ণাড শ, মাও সে তুং, হ্যারল্ড ল্যানিক, চু তে, পল রবসন, মুস্তাফা, এল নাহাস, রুজভেল্ট, স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন প্রভৃতি বরণীয় মানুষের সঙ্গে স্মরণীয় চিঠিপত্রের লেনদেন করেছেন। এ ছাড়া বিশিষ্ট ভারতীয় নেতাদের বহু চিঠিপত্র তো ছিলই।

এই সব চিঠিপত্রের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের একটা চিঠি পড়লাম। ১৯৩৬-এ দার্জিলিং জেল থেকে সুভাষচন্দ্র এক চিঠিতে নেহরুর ব্যক্তিগত বিষয় লেখার পর লিখেছেন—তোমার লাইব্রেরীতে নীচের বইগুলো থাকলে তার দু'একখানা পাঠাবে ঃ

1. Historical Geography of Europe By Gordon East.
2. Clash of Cultures and Contact of Races By Pitty Rivers.
3. Short History of our Times By J. A. Spender.
4. World Politics 1918-35 By R. P. Dutt.
5. Science and he Future By J. B. S. Haldane.
6. Africa By Huxley.
7. Genghis (Chenghis) Khan By Ralph Fox.
8. The Duty of Empire By Barnes.

সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্র বা জয়প্রকাশ নারায়ণ ভাল কিছু পড়লেই নেহরুকে পড়তে বলতেন। তেমনি নেহরুও ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান বা টাইমস্-এ ভাল লেখা পড়লে ওঁদের পড়তে দিতেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সব নেতাই শুধু উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তাঁরা নিয়মিত পড়াশুনাও করতেন। তবে নেহরু, সুভাষচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু বা জয়প্রকাশ নারায়ণের মত স্বদেশ-বিদেশের বই

সমান তালে আর বোধ হয় কেউ পড়তেন না। Banch of old Letters-এর চিঠিগুলি পড়ে নেহরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল।

একদিন কথায় কথায় দার্জিলিং জেল থেকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠিখানির কথা বলতেই নেহরু বললেন, সুভাষ খুব পড়াশুনা করতেন। তারপর একটু থেমে হেসে বললেন, পড়াশুনার ব্যাপারে কখনও সুভাষ আমার মাস্টার হত, কখনও আমি ওর মাস্টার হতাম।

নেহরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আধুনিক ভারতবর্ষের তিনি অনন্যপুরুষ ছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে যখন ভাবাবেগবর্জিত সাংবাদিকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি তখন তাঁকে Hamlet of Indian Politics মনে হয়। To be or not to be!

মে-জুন মাস। দিল্লীর বাতাসে তখন আগুনের জ্বালা। গাছপালা-পশুপক্ষী থেকে শুরু করে মানুষের পক্ষেও সে দাহ সহ্য করা অসম্ভব। তবু বহুজনকেই সেই অসহ্য গ্রীষ্মের দাহ সহ্য করে রুজির জন্য পথে-প্রান্তরে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়।

বেলা আড়াইটে-তিনটে হবে। নেহরু মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করে আবার অফিসে ফিরছেন। গাড়ি সাউথ ব্লকের দরজায় থামল। নেহরু গাড়ি থেকে নেমেই থমকে দাঁড়ালেন একটু দূরের এক দিন-মজুরকে দেখে। হাড় গিলগিলে চেহারা। রোদ্দুরে দরদর করে ঘামছে। পিঠে বিরাট একটা কী যন্ত্র। বেচারা বইতে পারছে না—কিন্তু তবু বইতেই হবে। এই হতভাগ্য দিন-মজুরকে দেখে নেহরুর মন কেঁদে উঠল। অসহ্য।

সাউথ ব্লকের মধ্যে না ঢুকে নেহরু ওর দিকে এগিয়ে যেতেই কোথা থেকে দৌড়ে এলেন C P W D-র দু-একজন তদারকী কর্মী। নেহরু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটির পিঠে কী?

স্যার, এয়ার-কণ্ডিসনার।

এঁ্যা! দপ করে জ্বলে উঠলেন নেহরু, ননসেন্স! কার এয়ার-কণ্ডিসনার?

C P W D-র তদারকী কর্মীরা জানালেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অফিসারদের জন্য এইসব এয়ার-কণ্ডিসনার এসেছে।

নেহরু আরো রেগে গেলেন, কী? একটা মানুষ এইভাবে জানোয়ারের মত পরিশ্রম করবে, এই অসহ্য গরমে জ্বলে-পুড়ে মরবে আর একজন ঠাণ্ডা ঘরে বসে দিন কাটাবে?

এ প্রশ্নের জবাব কর্মীরা কী দেবেন? ওরা চুপ করে রইলেন।

নেহরু চুপ করে রইলেন না। রাগে গজগজ করে বললেন, না না, এ হতে পারে না।

নেহরুর সারা মুখে বিরক্তি। অসন্তোষ। কিসের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহের ইঙ্গিত তাঁর চোখে-মুখে। অফিসে গিয়েই পররাষ্ট্র সচিবকে ডেকে পাঠালেন। সোজাসুজি বললেন, সমস্ত এয়ার-কণ্ডিসনার বন্ধ করে দিন। একদল মানুষ এই রোদ্দুরের মধ্যে জানোয়ারের মত খাটবে আর একদল অফিসার ঠাণ্ডা ঘরে বসে দিন কাটাবে, তা চলতে পারে না।

পররাষ্ট্র সচিব সব শুনে বললেন, স্যার, সরকারী সিদ্ধান্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সবার ঘরেই এয়ার-কণ্ডিসনার থাকবে।

নেহরু চুপ। হয়তো ক্ষণিকের জন্য খুশি হলেন না কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্তটি পরিবর্তনের জন্য কিছুই করলেন না। এই হচ্ছে নেহরু। To be or not to be!

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলাম, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই নেহরুর এই দ্বৈত মনোভাব আমাকে বড় দুঃখ দিত। গুণী-জ্ঞানী বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান দিতে ওঁর কোন দ্বিধা ছিল না। যার মধ্যে গভীরতা ছিল না, যারা বিশেষ শিক্ষিত বা আদর্শবান ছিলেন না, যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন, তাদের উনি পছন্দ করা তো দূরের কথা, শত হাত দূরে রাখতেন। অথচ মজার কথা, এই রকমই একজন মানুষ তিনমূর্তি ভবনে সবচাইতে শক্তিশালী ছিলেন। শুধু তিনমূর্তি ভবনে কেন? অতি সাধারণ একজন ব্যক্তিগত সচিব (Private Secretary) হয়েও তিনি নির্বিকার ভাবে নেহরু মন্ত্রীসভার সদস্যদের সঙ্গে যে ব্যবহার

(দুর্ব্যবহার !) করতেন, তা অকল্পনীয়।

এম. ও. মাথাই আসলে একজন স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দূরপ্রাচ্যে এক মার্কিন সেবা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। নেহরুর সঙ্গে তার সামান্য পরিচয় ছিল এবং যুদ্ধ শেষে সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই নেহরুর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ শুরু করেন। একে ব্যাচেলার, তার উপর প্রচুর অর্থ আছে বলে মাথাই নেহরুর কাছ থেকে মাইনে নিতেন না। এরপর ঝড়ের বেগে ভারতবর্ষের ইতিহাস মোড় ঘুরতে শুরু করে। ক্যাবিনেট মিশন, ইন্টিরিম গভর্ণমেণ্ট ও সব শেষে স্বাধীনতা লাভ। সব সময় নেহরুর পাশে পাশে মাথাই।

আমি মাথাইয়ের প্রথম ছবি দেখি খবরের কাগজের পাতায়। নেহরু লণ্ডনে জর্জ বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করতে গেছেন এবং শ'র এক পাশে নেহরু অন্য দিকে মাথাই। ছবিতে মাথাইকে দেখে একটুও ভাল লাগেনি। এরপর দেখি নেহরুর সহযাত্রী হিসেবে কলকাতায়। এক কথায় বিচ্ছিরি দেখতে। কালো, বেঁটে, চোখগুলো গোল গোল, মাথাটা একটু বড়, নাক চ্যাপ্টা। যে বুদ্ধিদীপ্ত ঔজ্জ্বল্য না থাকলে নেহরু কাউকে খুব ঘনিষ্ঠ হতে দিতেন না, তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও মাথাইয়ের মধ্যে ছিল। যাই হোক, দিল্লীতে গিয়ে যখন আবার মাথাইকে দেখি, তখন তার চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে। হবে না কেন? তিনমূর্তি ভবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও ঐশ্বর্য এবং প্রধানমন্ত্রীর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়ে ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে বারো তেরো বছর উপনায়ক হবার সৌভাগ্য অর্জন করলে সবার মুখ চোখের চেহারাই বদলে যাবে। গদীর রসে যে মানুষের চেহারা বদলে যায়, এ কথা আজকাল সবাই জানেন।

যাই হোক, মাথাই স্টেনোগ্রাফারের বিদ্যা ও কয়েক বছর মার্কিনী সান্নিধ্যে থাকায় যেটুকু সাহেবীয়ানা রপ্ত করেছিলেন, তাই সম্বল করে প্রথমে নেহরুর প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং পরে স্পেশ্যাল এ্যাসিস্টাণ্ট হন। চাকরি হিসেবে এমন কিছু আহামরি না। প্রধানমন্ত্রীর কাজে

সাহায্য সাধারণ ভাবে সাহায্য করা ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবালয়ের তদারকী করাই তার কাজ ছিল—অন্য কিছু নয়। প্রধানমন্ত্রীকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সাহায্য ও পরামর্শ দেবার দায়িত্ব মন্ত্রী ও সেক্রেটারিদের। এ ক্ষেত্রে কোন প্রাইভেট সেক্রেটারি বা স্পেশ্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্টের কোন ভূমিকা থাকার কথা নয়. কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মাথাই প্রায় de jure প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

মাথাই-এর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটা মনে পড়ে। তিনমূর্তি ভবনে ঘোরাঘুরি করছিলাম। একজন তরুণ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাথাই একদিক থেকে অন্য দিকে যাচ্ছিলেন। তরুণ মন্ত্রীটি আমাকে দেখেই হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথাই ঐ তরুণ মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি মাঝে মাঝেই এখানে আসে। কী করে? তরুণ মন্ত্রীটি আমাকে মাথাই-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে উনি আমাদের দুজনকে নিয়ে নিজের অফিস ঘরে ঢুকলেন। মাথাই আমাকে আমার কাজকর্ম সম্পর্কে দু-চারটে প্রশ্ন করলেন। বোধ হয় আমার উত্তরে খুশি হলেন। তারপর বললেন, মাঝে মাঝে আমার ঘরেও উঁকি দিও। আমি খুশি হয়ে বললাম, অনুমতি যখন পেলাম তখন নিশ্চয়ই আসব।

খোস মেজাজে কথাবার্তা বলতে বলতেই মাথাই চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে টেবিলের এক দিকে দুটো পা তুলে দিলেন। এমন সময় হঠাৎ টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ঘরে ঢুকে বললেন, হাউ আর ইউ ম্যাক?

(ঘনিষ্ঠ মহলে মাথাই-এর নাম ছিল 'ম্যাক'। যুদ্ধের সময় আমেরিকান সহকর্মীদের কৃপায় মাথাই-এর এই নতুন নামকরণ হয়।)

মাথাই গুরুগম্ভীর হয়ে বললেন, আমি সব সময়ই ভাল থাকি।

ক্যান আই টক টু ইউ ফর ফিউ মিনিট্স?

কাণ্ট ইউ সী আই এ্যাম টকিং টু মাই ফ্রেণ্ডস?

মাথাইয়ের উত্তর শুনে আমরা দুজনে লজ্জা পাই। টি. টি. কৃষ্ণমাচারীর মত অহঙ্কারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুব কম দেখেছি কিন্তু

তাঁকেও নীরবে এভাবে অপমানিত হতে দেখে বিস্মিত হই। টি. টি. কে. মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরুবার সময় মাথাই ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার জন্য বললেন, টি. টি. টেল দেম টু সেণ্ড থ্রী কাপ্স অব কফি !

ঠিক যেন বড়সাহেব তার অতি সাধারণ অধস্তন কর্মচারীকে হুকুম করছেন !

টি. টি. কে. অপমান ও উপেক্ষা করার জন্যই মাথাই আরো খোস মেজাজে আমাদের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলেন।

মাথাই কেবল নেহরু ছাড়া আর কাউকেই প্রায় গ্রাহ্য করতেন না। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে তিনি নিছক গেঁয়ো মনে করতেন; আবার কৃষ্ণমেননের প্রখর কূটনৈতিক বুদ্ধি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ শারীরিক কারণে কখনই তিনমূর্তি ভবনে যেতেন না এবং প্রয়োজন হলেই নেহরু নিজেই পন্থজীর ৬নং কিং এডওয়ার্ড রোডের (বর্তমানে মৌলানা আজাদ রোড) বাংলোয় যেতেন। তাই তাঁর ওপর মাতব্বরী করার সুযোগ হয়নি মাথাই-এর। আর ব্যতিক্রম ছিলেন মোরারজী দেশাই। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেলা বলে নেহরু কোন কালেই মোরারজীকে খুব কাছে টানেননি, আবার মোরারজীও কখনই নেহরুর ঘনিষ্ঠ হবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। তাই মোরারজীর ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারেননি মাথাই। মনে হয় এই দুজনকে উনি একটু ভয়ও করতেন। বোধ করি এই দুজন ছাড়া আর সব নেতার সঙ্গেই মাথাই অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতেন। তখন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন গুলজারীলাল নন্দ। ওঁরই উদ্যোগে জন্ম নেয় ভারত সেবক সমাজ। এই ভারত সেবক সমাজ নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারী হলেও নন্দজী কোন কারণেই ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী ছিলেন না। পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে বেসরকারী মানুষের সহযোগিতার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এই ভারত সেবক সমাজ নিয়ে মাথাই নন্দজীকে এমন বিচ্ছিরি বিদ্রূপ করতেন যে তা বলার নয়।

তাছাড়া আরো কত ভাবে তাঁকে উপেক্ষা ও অপমান করতেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কংগ্রেস নেতাদের মাথাই তৃণজ্ঞান করতেন। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্পর্কে যে ধরণের নোংরা এবং অপমানজনক মন্তব্য সবার সামনে করতেন, তা কোন ভদ্র ও রুচিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মজার কথা, মাথাইয়ের বিরুদ্ধে কেউই নেহরুর কাছে নালিশ করতেন না। বোধ হয় সাহস হত না। কিন্তু কেন এই ভয়? কিসের ভয়? সামান্য একজন স্টেনোগ্রাফারের পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপেক্ষা ও অপমান করার সাহস কীভাবে হয়? কোন্ বিশেষ গুণ বা কাজের জন্য কী তিনি নেহরুকে এভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন? কেন এবং কোন্ অধিকারে মাথাই বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও ফিরোজ গান্ধীকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন? পদ্মজা নাইডুকেই বা তাচ্ছিল্য করার দুঃসাহস হত কেমন করে? মাথাই ভাল ভাবেই জানতেন, পদ্মজাকে নেহরু ভালবাসতেন এবং প্রধানমন্ত্রী হবার পর নেহরু তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সরোজিনী নাইডুর অনুরোধেই এই বিয়ে হতে পারেনি। বিয়ে না করলেও পদ্মজার সঙ্গে নেহরুর মধুর সম্পর্ক ছিল। সরোজিনী নাইডুর ভাই হারীন চট্টোপাধ্যায় ও পদ্মজার অন্য বোনের সঙ্গেও নেহরুর অত্যন্ত গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। তবে মাথাই-এর এত সাহস হয় কী করে? লেডি মাউন্ট-ব্যাটনের অনুপ্রেরণায় কী?

মজার কথা, লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটন মাথাইকে খুবই পছন্দ ও স্নেহ করতেন। ওঁদের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠতা সত্যি বিস্ময়কর। মাউন্টব্যাটন রাজ-পরিবারের মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ বিশারদ ও কূটনীতিবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। বিদ্যা, বুদ্ধি, ভিক্টোরিয়ান আভিজাত্য ছিল তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে। এ হেন মানুষ নেহরুর বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু মাথাই-এর মত স্টেনোগ্রাফারকে বিশেষ ভাবে স্নেহ করার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি থাকতে পারে না। মাউন্টব্যাটন-দম্পতি মাথাইকে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণে বা স্বার্থের জন্য ভালবাসতেন বলেই বহু জনের ধারণা। সামান্য একজন

স্টেনোগ্রাফারের এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য নিশ্চয়ই নেহরু দায়ী ছিলেন। লণ্ডনে প্রথম ভারতীয় হাই কমিশনার কৃষ্ণমেননের কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য নেহরু কেন মাথাইকে পাঠান? কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র সচিবকে কী লণ্ডন পাঠালে সম্মানজনক হত না? বা উচিত ছিল না? নেহরুর এই ধরণের কাজকর্মের কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

আমি মাথাইকে তাঁর স্বর্ণযুগের একেবারে শেষ অধ্যায়ে দেখি; তিনমূর্তি ভবনে ও সাউথ ব্লকের অফিসে তাঁর হাবভাব চালচলন দেখে মনে হত, উনি প্রধানমন্ত্রী না হলেও নিশ্চয়ই উপ-প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে তিনমূর্তি ভবনের নিম্নতম কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁকে সেই ভাবেই দেখতেন ও তাঁর হুকুম তামিল করতেন, কিন্তু কেন? কোন্ অজানা রহস্যের জন্য নেহরুর প্রত্যক্ষ স্নেহচ্ছায়ায় মাথাই এই ক্ষমতার অধিকারী হন? রহস্য যে ছিল, সে বিষয়ে বহু জনেই একমত।

উদার মহানুভব মানুষ হিসেবে নেহরুর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি থাকলেও তাঁর মধ্যেও আশ্চর্যজনক কিছু দৈন্য দেখে আমি হতবাক্ হয়েছি। গান্ধীজির নেতৃত্বে যাঁরা সংগ্রাম করে দেশের স্বাধীনতা আনেন, তার অনন্য ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিছক ও বিশুদ্ধ গান্ধীবাদী হিসেবে সর্বজনবিদিত। তিনি ষোলআনা কংগ্রেসীও ছিলেন। তাই তো তাঁকে গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং তিনিই গণতান্ত্রিক ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। মজার কথা, সৌজন্যের প্রতীক জহরলাল নেহরু এমন মানুষের মৃত্যুর পরও শ্রদ্ধা জানাতে যাননি! শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকেও রাজেনবাবুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য পাটনা যেতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করেই পাটনা গিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ও সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। একদিনের জন্য নেপাল সফর পিছিয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রীও রাজেনবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলেন।

আর নেহরু ? কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তিনি চলে গেলেন দিল্লীর বাইরে। অমন শ্রদ্ধেয় সহকর্মীর মৃত্যুর পরও কেন নেহরু তাঁর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কাহিনী ভুলতে পারলেন না ? নেহরুর মনে এই দৈন্য কোথায় লুকিয়ে ছিল ?

এর একটু নেপথ্য কাহিনী আছে। লর্ড মাউণ্টব্যাটন ভারতবর্ষকে দ্বিধাখণ্ডিত করেও স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হলেন। আমার মতে মাউণ্টব্যাটনের দ্বিতীয় অবিস্মরণীয় কীর্তি হচ্ছে 'কাশ্মীর বিরোধ'কে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পৌঁছে দেওয়া এবং এই সর্বনাশা কাজটি এই ভারতপ্রেমিক ইংরেজ সমর-বিশারদ এমন সময় করেছিলেন যখন আরো কয়েক দিন যুদ্ধ চললেই ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানী দস্যুদের হাত থেকে সমগ্র কাশ্মীরকে উদ্ধার করতে পারত ও জুনাগড় —হায়দ্রাবাদের মত চিরতরের জন্য কাশ্মীর 'সমস্যার' সমাধান হত। এমন দুটি মহান কাজ করার পর মাউণ্টব্যাটন আর বেশি দিন ভারতে থাকার প্রয়োজন বোধ করলেন না এবং হাসতে হাসতেই পালামের মাটি থেকেই বিলেত চলে গেলেন। গভর্ণর জেনারেল হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

রাজাজীর মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ রসবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ শুধু ভারতে কেন, সারা দুনিয়ায় বিরল। গভর্ণর জেনারেল হবার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি নয়াদিল্লীস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের মন জয় করে নিলেন। রুচিবোধ ও রসজ্ঞান দিয়ে রাজাজী জয় করে নিলেন নেহরুকেও। নানা দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে রাজাজী সম্পর্কে ভাল ভাল মন্তব্য শুনে নেহরু মনে করলেন, রাজাজী প্রথম রাষ্ট্রপতি হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নেহরু প্রথম রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রাজাজীর নাম প্রস্তাব করলেন। সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যরা তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় রাজাজী কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সে-কথা মনে রেখেই তাঁরা কখনই রাজাজীকে প্রথম রাষ্ট্রপতি হবার সম্মান দিতে পারেন না। কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যদের সমর্থনপুষ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদই ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন এবং নেহরু তাঁর রাজনৈতিক পরাজয়ের প্রথম স্বাদ পেলেন। রাজেনবাবু দ্বিতীয়বারের জন্যও রাষ্ট্রপতি হলেন নেহরুর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও। এই গ্লানি, এই পরাজয়ের কথা নেহরু কোন দিন ভুলতে পারেননি। আর পারেননি হিন্দু কোড বিলের বিরোধিতা করার জন্য। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, আইন হোক সমগ্র দেশবাসীর জন্য—শুধু হিন্দু বা মুসলমানের জন্য নয়। একাধিক বিবাহ অত্যন্ত নিন্দনীয় ঠিকই, কিন্তু তা সমস্ত ভারতবাসীর জন্য নিষিদ্ধ হোক—শুধু হিন্দুদের জন্য নয়। মুসলমান সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে নেহরু রাজেনবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করেননি। হিন্দু কোড বিল নিয়েই দুজনের মধ্যেও অত্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি হয়, কিন্তু গণতন্ত্রের পূজারী নেহরু মতবিরোধকে ব্যক্তিগত বিরোধ মনে করে রাজেনবাবুর মৃত্যুর পরও কেন শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি ?

নেহরুর চরিত্রে এই দৈন্য দেখে বহু নেহরু-অনুগ্রাহী ও ভক্তও হতাশ হয়েছিলেন।

* * *

নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী ও কংগ্রেসী হিসেবে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুপরিচিত ছিলেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে যে ক'টি উজ্জ্বল তারকার তেরঙ্গার নীচে সমাবেশ হয়, রাজেনবাবু তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের চাইতে বিহার ও উড়িষ্যার মানুষ অনেক বেশি বিনয়ী হন। ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েও রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের অতি সাধারণ মানুষের মতই বিনয়ী ছিলেন।

কংগ্রেসের বহু নেতাই অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিলেন। যাঁরা ভাল ছাত্র ছিলেন না, তাঁরাও সুপণ্ডিত ছিলেন। মেধায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মৌলানা আজাদ, বিদ্যা-বুদ্ধি পাণ্ডিত্যে নেহরু ও সরোজিনী নাইডু

এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় সর্দার প্যাটেল অতুলনীয় ছিলেন। নেহরু, মৌলানা আজাদ ও সরোজিনী নাইডু নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যের জন্য সব সময় সচেতন থাকতেন বলেই সাধারণ মানুষের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য সর্দার প্যাটেলের কাছেও অতি সাধারণ মানুষ আসতে দ্বিধা করত কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ চিরকালই নিছক সাধারণ মানুষ ছিলেন।

কলকাতায় রিপোর্টারী করার সময় দু' চারটে সভাসমিতি ও সমাবর্তনে রাজেনবাবুকে দেখেছি দূর থেকে কিন্তু দিল্লীতে গিয়ে যেদিন প্রথম কাছ থেকে দেখি, সেদিন চমকে উঠেছিলাম।

এক বিখ্যাত পণ্ডিতের টীকাসহ 'পদ্মপুরাণ' প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতায়। ওদেরই একজন আমাকে চার খণ্ডের পদ্মপুরাণ পাঠিয়ে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেবার অনুরোধ করেছিলেন। আমার অগ্রজ-প্রতিম রাজেন্দ্রলাল হাণ্ডা তখন রাষ্ট্রপতির প্রেস সেক্রেটারি। ওকে সব কথা জানাতেই উনি বললেন, এই বই যদি রাষ্ট্রপতি ভবনের লাইব্রেরী বা সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরীতে থাকে তাহলে প্রেসিডেন্ট এগুলি গ্রহণ করতে পারেন না। দু' চারদিন পর ঐ দুটি লাইব্রেরীতে খোঁজখবর নেবার পর মিঃ হাণ্ডা আমাকে জানালেন, না, কোন লাইব্রেরীতেই পদ্মপুরাণের ঐ টীকা নেই। তুমি পরশুদিন সকাল ন'টায় এসে প্রেসিডেন্টকে বইগুলি দিও।

পৌনে ন'টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে হাজির হয়ে এ-ডি-সি'র ঘরে গেলাম। কয়েক মিনিট পরে এ-ডি-সি আমাকে রাষ্ট্রপতির স্টাডিতে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিলেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনের এই স্টাডি রুম একতলায়। ঘরখানি বড়। ঘরের চারপাশের আলমারীতে বই। তিন কোণায় তিনটি সোফা সেট। এক কোণায় বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ঘরখানির পশ্চিম দিকেই মুঘল গার্ডেন। এই ঘরে বসেই রাষ্ট্রপতি সরকারী কাজকর্ম ও লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

প্রবেশ দ্বারের ঠিক কোণাকুণি উল্টোদিকের সোফায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ

বসে ছিলেন। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। তারপর ওঁর কাছাকাছি হতে উনিই এগিয়ে এলেন। একেবারে মুখোমুখি হতেই উনি আমার পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতেই আমি বিদ্যুৎ গতিতে পিছিয়ে এলাম। অবাক বিস্ময়ে বললাম, এ কী করছেন?

রাষ্ট্রপতি শান্তভাবে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ। আপনাকে প্রণাম করব না?

অসম্ভব।··· না, মা, তা হতে পারে না।

কেন হতে পারে না? উনি প্রশ্ন করতে করতেই আবার আমার দিকে এগিয়ে আসেন।

আমি কিছুতেই ওঁকে প্রণাম করতে দিই না, সেন্টার টেবিলের অন্যদিকে চলে যাই। রাষ্ট্রপতি আবার আমাকে ধরার চেষ্টা করেন, আমি আবার ঘুরে যাই।

বেশ কয়েক মিনিট ধরে চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ দু'হাত জোড় করে মাথা নীচু করে আমাকে নমস্কার করলেন। তারপর আমার হাত ধরে আগে সোফায় বসিয়ে উনি আমার পাশে বসলেন।

ব্রাহ্মণ হলেই তাকে প্রণাম করতে হবে, আধুনিক কালের মানুষ তা মনে করে না। আমিও করি না। এর মধ্যে কোন যুক্তিও দেখতে পাই না। বোধ হয় শুধুই সংস্কার। রাষ্ট্রপতির মধ্যে এ ধরণের সংস্কার না থাকাই কাম্য কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিকের এই বিনয় দেখে আমি বিমুগ্ধ না হয়ে পারিনি। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং আজ বোধ হয় আর সত্য নয়। আধুনিক সভ্যতার প্রথম বলিদান বোধ হয় বিনয়। অতি সাধারণ গরীব-দুঃখী মানুষ বিনয়ী হয় কিন্তু শিক্ষিত ও ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে বিনম্রভাব সত্যি দুর্লভ। কলকাতা কর্পোরেশনের কোন কাউন্সিলারের মধ্যে যে বিনম্রভাব দেখিনি এবং আশাও করিনি, তা স্বয়ং রাষ্ট্রপতির মধ্যে দেখে সত্যি ওঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেল।

পরে মিঃ হাণ্ডাকে এই ঘটনার কথা বলতে উনি হেসে বললেন,

আওয়ার প্রেসিডেন্ট ইজ লাইক ছাট। উনি শুধু ব্রাহ্মণকেই প্রণাম করেন না, উনি সমস্ত প্রবীণদের, গ্রামের স্কুলের পুরনো মাস্টারমশাই ও মৌলানা সাহেবদের ছাড়াও পীর সাহেবদের প্রণাম করেন।

হাণ্ডা সাহেব একটু থেমে বললেন, ডোন্ট ফরগেট সংস্কৃত ও আরবী ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের রাষ্ট্রীয় সম্মান দেবার ব্যবস্থা ওঁরই উদ্যোগে চালু হয়েছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি হলেও নিছক সাধারণ মানুষের মত জীবন কাটাতেন। পশ্চিমী আদব-কায়দা বা বিলাস-ব্যসনের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। খেতেন ডাল-ভাত রুটি-তরকারি। সঙ্গে ঘরে পাতা একটু দই। স্ত্রী রাজবংশী দেবী পূজাপার্বণ আর নাতি-নাতনীদের নিয়েই দিন কাটাতেন আর পাঁচজন সাধারণ ঠাকুমা-দিদিমার মত। স্বামী রাষ্ট্রপতি হলেও তিনি কখনই তাঁর সঙ্গে কোন অনুষ্ঠানে যেতেন না। এ নিয়ে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের পশ্চিমী আলোকপ্রাপ্তদের হাসাহাসির অন্ত ছিল না। চীন বা রাশিয়ার নেতারা তাঁদের স্ত্রীদের পাদপ্রদীপের আলোয় আনেন না বলে কোন সমালোচনা হয় না কিন্তু নিজের দেশের রাষ্ট্রপতির স্ত্রী সে কাজ করলে পশ্চিমী ভাবধারার ক্রীতদাসদের মধ্যে ছি ছি পড়ে যায়। সত্যি বিচিত্র দেশ! মজার কথা ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বা ডাঃ জাকির হোসেনের স্ত্রীও শ্রীমতী সরস্বতী গিরির মত স্বামীর উপগ্রহ হয়ে বিচরণ করতেন না কিন্তু তার জন্য তাঁদের নিয়ে কাউকে হাসাহাসি করতে দেখিনি। কথায় বলে, যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা!

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভোজনরসিক ছিলেন না। তাই রাষ্ট্রপতি ভবনের ভোজসভার ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি ভাবেই মিলিটারী সেক্রেটারির উপর নির্ভর করতেন এবং আশা করতেন মিলিটারী সেক্রেটারি অতিথি-অভ্যাগতদের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করবেন। রাজেনবাবুর ভোজসভার খাবার-দাবার নিয়েও দিল্লীর নানা মহলে অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ সমালোচনা হত। অনেকেই কথায় কথায় নেহরুর ভোজসভার উল্লেখ করে বলতেন, হ্যাঁ, ওখানে খেয়ে সত্যি

মন ভরে। মজার কথা, তিনমূর্তি ভবনেও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতেন রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারির অধীনস্থ সরকারী অতিথি-আপ্যায়ন বিভাগ (গভর্ণমেণ্ট হস্‌পিটালিটি অর্গানিজেশন)।

এই প্রসঙ্গেই রাষ্ট্রপতির এক মিলিটারী সেক্রেটাররি কথা মনে পড়ছে। তাঁর নাম ডাঃ বিমানেশ চ্যাটার্জী। ভদ্রলোক ডাক্তারী পাশ করে অবিভক্ত বাংলায় সরকারী চাকরি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর ডাক্তার হন। যুদ্ধ ফেরত ক্যাপ্টেন (নাকি মেজর ?) চ্যাটার্জী অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্ণর বারোজের স্টাফ অফিসার হন এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে তাঁর পুলিশ-সার্জেনের পদে যোগদানের কথা ছিল। ইতিমধ্যে শ্রীরাজাগোপালাচারীর ঔদার্যে উনি লাটসাহেবের মুখ্য স্টাফ অফিসার হয়ে রাজভবনে থেকে গেলেন। রাজাজী লর্ড মাউণ্টব্যাটনের পর প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল হয়ে দিল্লী যাবার সময় বিমানেশ চ্যাটার্জীকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং তথাকথিত বাঙ্গালী-বিরোধী বলে পরিচিত রাজাজীর সুপারিশ ও অনুগ্রহেই অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন মিলিটারী সেক্রেটারি হলেন। রাজাজী বিদায় নিলেন; গণতান্ত্রিক ভারতের প্রথন রাষ্ট্রপতি হলেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। বিমানেশ চ্যাটার্জীও বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে বললেন, আপনি যে কাজ করছিলেন, সেই কাজই করুন। আপনি থাকলে আমার বাংলায় কথাবার্তা বলার অভ্যাসটা ঠিক থাকবে। বিমানেশ চ্যাটার্জী থেকে গেলেন এবং রাজেনবাবুর সুপারিশেই উনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের আমলে কিছুকাল কাজ করার পরই মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী বুঝলেন, নেহরু-রাজেনবাবুর সম্পর্কটা বিশেষ মধুর নয় এবং গভর্ণমেণ্ট হসপিটালিটি অর্গানিজেশনের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি ভবনের ভোজসভা ও অতিথি আপ্যায়নকে উপেক্ষা করে তিনমূর্তি ভবনের দিকে একটু বেশি দৃষ্টি দিতে শুরু করলেন। চাকুরি থেকে অবসর নেবার সময় যত এগিয়ে আসে মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী

ভত বেশি মাথাইয়ের প্রিয়পাত্র হবার জন্য সচেষ্ট হন। দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের অনেকেই মনে করতেন, মেজর জেনারেল চ্যাটার্জীর জন্যই নেহরু-রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্পর্ক এত তিক্ত হয়। সত্য-মিথ্যা জানি না কিন্তু মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী অবসর গ্রহণ করার পর প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী নেহরুর সুপারিশেই তিনি মরিসাসে ভারতীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। মজার কথা, এর পরেও রাজেন্দ্রবাবু রাষ্ট্রপতি ভবনের এক বাঙালী ডাক্তারকে কর্ণেল থেকে ধাপে ধাপে তুলতে তুলতে মেজর জেনারেল করে দেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ নাকি প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন কিন্তু তিনি যে কত বাঙালীর উপকার করেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই। কলকাতার বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের অনুরোধ মত তিনি অনেক অপাত্রেরও উপকার করেছেন। আকাশবাণীর এক বড়কর্তা তো আজও তাঁর অনুগ্রহের ফল ভোগ করছেন।

এমন বিনম্র ও সরল মানুষ হয়েও রাজেন্দ্রপ্রসাদ কখনও কখনও চরম অপ্রিয় সত্যও বলতে দ্বিধা করতেন না।

রাণী এলিজাবেথ ও তাঁর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ ভারত সফর শেষ করে দিল্লী ত্যাগ করার ঠিক প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজেনবাবুর সঙ্গে ওঁদের নানা কথাবার্তা হচ্ছিল। কথায় কথায় রাজেনবাবুর বই লেখার কথা উঠতেই রাণী এলিজাবেথ বললেন, চিরকালই তো ব্যস্ততার মধ্যে কাটালেন। তবে এত লেখার সময় পেলেন কী করে?

রাজেনবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে নির্বিবাদে বললেন, আপনার বাবার জেলখানায় এত দীর্ঘ কাল কাটিয়েছি যে আরো অনেক বেশি লেখা উচিত ছিল।

রাণী চুপ। একটি কথা আর তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। চীফ অব প্রটোকল এস. আর. এ. বেগ কোনমতে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে মোড় ঘুরিয়ে দেন।

রাজেনবাবুর এই মন্তব্যের জন্য নেহরু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পুরনো কাসুন্দি ঘেটে ভারত-ব্রিটেনের সম্পর্ক তিক্ত করা তিনি আদৌ

সমর্থন করতেন না। ভারত-ব্রিটেনের সম্পর্ক তিক্ত হোক—তা রাজেন্দ্রপ্রসাদও চাইতেন না কিন্তু মাউন্টব্যাটন-দম্পতির প্রভাবে তিনি ইংরেজের প্রতি বেশি বন্ধুত্ব-ভাবাপন্নও হননি।

* * *

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সাঁচীতে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার পর থেকেই আমি ওঁকে নিয়মিত চিঠি-পত্র লিখতাম। দু' চারদিনের মধ্যেই উনি চিঠির জবাব দিতেন। যতদিন কলকাতায় থেকেছি, ততদিনই এই চিঠিপত্রের লেনদেন চলেছে। কলকাতায় আসার আগেই উনি আমাকে জানিয়ে দিতেন এবং আমিও সব সময় দমদম বিমানবন্দরেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতাম।

উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কলকাতায় এলেই লেকের ধারে শরৎ চ্যাটার্জী এভিনিউ-এ বন্ধুগৃহে থাকতেন। কখনই রাজভবনে থাকতেন না। যতদূর মনে পড়ে একবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর প্রতিবাদ জানান। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ওঁকে রাজ-ভবনে থাকার কথা বললে উনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, চিরকাল যখন বন্ধুর বাড়ি থেকেছি, এখনও থাকব। ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি হয়েছি বলে বন্ধুর বাড়ি ত্যাগ করতে পারি না। এ কথা শোনার পর নেহরু আর কিছু বলেন না।

উনিশ নম্বর শরৎ চ্যাটার্জী এভিনিউর মিঃ মজুমদার মারা গেলেও রাধাকৃষ্ণণ তাঁর ছেলেমেয়েদের সন্তানতুল্য স্নেহ করতেন। এবং তাঁরাও ওঁকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কলকাতায় এলে আমিও সারাদিন ঐ বাড়িতেই কাটাতাম। সাধারণত রাধাকৃষ্ণণের কলকাতা সফরের সময় ওঁর সহকারী একান্ত সচিব মিঃ বসু সঙ্গে আসতেন কিন্তু তিনি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাশুনা করার অবাধ স্বাধীনতা পেতেন। মিঃ মজুমদারের ছেলে বিজয়দা, মেয়ে বীণাদি ও আমিই রাধাকৃষ্ণণের ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করতাম। দু-একবার

কলকাতা থেকে আশেপাশের রাজ্যে সফরের সময় রাধাকৃষ্ণণ আমাকে সঙ্গেও নিয়েছেন। মন ভরে যেত ওঁর সান্নিধ্য লাভ করে।

দিনে দিনে সম্পর্ক আরো গভীর, আরো নিবিড় হয়। কলকাতায় থাকতে কাজকর্মে দিল্লী গেলে উপরাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবন ২ নম্বর কিং এডওয়ার্ড রোডেই সারাদিন কাটাতাম। আস্তে আস্তে আমাদের সম্পর্ক পারিবারিক পর্যায়ে পৌঁছায়। যে কোন ব্যাপারেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলেই আমি ওঁর পরামর্শ ও উপদেশ চাইতাম। এর কারণ ছিল। নেহরু ও রাধাকৃষ্ণণের পাণ্ডিত্য, ঔদার্য, মনুষ্যত্ববোধ আমাকে সব সময় আকর্ষণ করত। নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকায় সব সময় তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না এবং সম্ভব হলেও উচিত মনে হত না, কিন্তু নিছক অধ্যাপকের মত রাধাকৃষ্ণণের বাড়িতে অবাধ গতি ছিল সবার।

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। প্রথম জীবনে ছাত্র ও পরবর্তী জীবনে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে দেশেবিদেশে সমান খ্যাতি অর্জন করার পর স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে মস্কো গেলেন। সেটা ১৯৪৯ সালের কথা। মার্শাল স্তালিন তখন জীবিত ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর বিশ্বের কমিউনিষ্ট দুনিয়ার কর্ণধার। ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসী রাধাকৃষ্ণণকে নেহরু মস্কোয় পাঠাবার জন্য অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং যা কেউ আশা করেননি, যা কোনদিন ঘটেনি, তাই ঘটল। ১৯৫২ সালে উপ-রাষ্ট্রপতি হয়ে ভারত প্রত্যাবর্তনের আগে স্বয়ং স্তালিন রাধাকৃষ্ণণকে ডেকে পাঠালেন ঐতিহাসিক ক্রেমলিনে। সারা বিশ্বের কূটনৈতিক জগৎ চমকে উঠে নজর দিলেন দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের দিকে।

মস্কো থেকে দিল্লী। গণতান্ত্রিক ভারতের নতুন সংবিধানের প্রথম উপ-রাষ্ট্রপতি।

সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ হচ্ছে রাজ্যসভা পরিচালনা করা। চেয়ারম্যান। আর রাষ্ট্রপতি অসুস্থ হলে বা কোন কারণে রাষ্ট্রের কাজ করতে অক্ষম হলে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব

বহন করা। এ ছাড়া আছে নানা আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব।

উদ্যোগ ভবনের ঠিক পূব দিকেই কিং এডওয়ার্ড রোডের (বর্তমানে মৌলানা আজাদ রোড) দু'নম্বর বাংলো ছিল তখন উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন। না, প্রধান ফটকে কোন সশস্ত্র প্রহরী ছিল না। উন্মুক্ত ফটকের ভেতর দিয়ে ফুলের বাগানের মাঝখানের কাঁকর বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেলেই ইংরেজ আমলের ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্যের জন্য তৈরি বাংলো। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেই বিরাট বারান্দা! বারান্দার বাঁদিকেই উপ-রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারিয়েট। মিঃ বসু, মিঃ ফাদকে ও আরো দু-একজন মাত্র কাজ করছেন। কোন দর্শনার্থী এলেই ভিতরে খবর চলে যাবে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়বে ভিতরে। ড্রইংরুমে নয়, অফিস ঘরেও নয়, একেবারে সোজা শোবার ঘরে।

হ্যাঁ, দার্শনিক উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শোবার ঘরেই সবার সঙ্গে দেখাশুনা করতেন। একজনের শোবার মত পুরনো আমলের খাট। মাথার দিকে গোটা দুয়েক বালিশে হেলান দিয়ে বসে রাধাকৃষ্ণণ সব সময় পড়তেন। বিছানার সর্বত্র বই আর অসংখ্য পত্র-পত্রিকা। ঘরের মধ্যেও সর্বত্র বই আর বই। হাতের কাগজ বা বই পাশে সরিয়ে রেখেই উনি লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। পরণে একটা ধুতি আর শার্ট। হয়তো একটা চাদরও। চোখে পুরু লেন্সের সোনালী ফ্রেমের চশমা! সৌম্যদর্শন জ্ঞানপিপাসু রাধাকৃষ্ণণ উপ-রাষ্ট্রপতি হয়েও সেই অতীত দিনের অধ্যাপকই ছিলেন। মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কলকাতা, বেনারস আর অক্সফোর্ড, শিকাগো, হাবার্ট, প্রিন্সটন, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করার সময়ও ঠিক একই ভাবে জীবন কাটাতেন। ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন, লেডী মাউন্টব্যাটনের মত রাষ্ট্রীয় অতিথিরা এলেই রাধাকৃষ্ণণ শুধু ড্রইংরুমে বসে কথাবার্তা বলতেন। অনেক বিদেশী রাষ্ট্রদূতরাও শোবার ঘরে বসেই ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করতেন। সভ-সমিতি বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যাবার সময় মাথায় পরতেন বিখ্যাত পাগড়ী আর গায়ে

চড়াতেন ঘিয়ে রঙের সেই বিখ্যাত লম্বা কোট। ব্যস। মোটর গাড়ি চড়তেন ঠিকই কিন্তু তাতে না থাকত লাল আলো বা রাষ্ট্রীয় পতাকা। সামনে পিছনে থাকত না পুলিশের কোন গাড়ি বা পাইলট।

উপ-রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের বাংলোয় চাকর-বাকর বেয়ারা-চাপরাশী বা অর্ডারলী দেখা যেত না। পুত্র ডাঃ গোপালকে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও স্ত্রী বা পুত্রবধূ নিজেদের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন বাড়ির ভিতরে। কোন দিন কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বা সরকারী সফরে ওঁরা কেউই রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে যাননি। শুধু দু'বেলা খাবার সময় রাধাকৃষ্ণণ বাড়ির ভিতরে যেতেন, অন্য সব সময় ঐ নিজের শোবার ঘরে। কদাচিৎ কখনও পায়চারী করতেন বারান্দায় বা সামনে-পিছনের লনে।

অধ্যাপনা জীবনের ব্যক্তিগত সচিব নাটা শাস্ত্রী ঐ বাড়িতেই আউট হাউসে থাকতেন এবং রাধাকৃষ্ণণের বইপত্তর ও অন্যান্য লেখালেখির ব্যাপারে সাহায্য করতেন। নাটা শাস্ত্রী কোন সরকারী কাজ করতেন না বা উপ-রাষ্ট্রপতির ঐ এক ঘরের সেক্রেটারিয়েটেও বসতেন না। বসু বা ফাদকে বাড়ি থেকে যাতায়াত করতেন সাইকেলে। নাটা শাস্ত্রী, বসু বা ফাদকের বাড়িতে কোন টেলিফোনও ছিল না। এক কথায় সব মিলিয়ে এক অতি অনাড়ম্বর ছবি।

এলো ১৯৬১। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ রাষ্ট্রপতি হয়ে চলে গেলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম রূপদাতা জামিয়া মিলিয়া খ্যাত বিহারের রাজ্যপাল ডাঃ জাকির হোসেন হলেন উপ-রাষ্ট্রপতি। ইতিমধ্যে ২ নম্বর কিং এডওয়ার্ডে রোডের বাংলোর জায়গায় 'নির্মান ভবন' তৈরি হবে বলে ঠিক হওয়ায় ৬ নম্বর কিং এডওয়ার্ড রোডের বাংলো হল নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন।

ডাঃ জাকির হোসেনও শিক্ষাজগতের মানুষ ছিলেন। পাণ্ডিত্যও ছিল যথেষ্ট। তবে ওঁর মত সৌন্দর্য ও রুচিবোধ শুধু নেহরুরই ছিল। তাই উপ-রাষ্ট্রপতি ভবনের চেহারা বদলে গেল। জাকির হোসেনের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ও পছন্দমত তৈরি হল সুন্দর ফুলের বাগান। ওঁর গোলাপ প্রীতি সর্বজনবিদিত। অসংখ্য ও বিচিত্র গোলাপে ভরে গেল

চারদিকের বাগান। নিজে পরিচর্যা করে তৈরি করলেন আরো কত ফল-ফুলের গাছ। ঘরদোরের চেহারাও বদলে গেল। সুন্দর কার্পেট ও দামী সোফার চাইতে জাকির হোসেন সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহের পেন্টিং ও আর্ট কালেকশন সবার দৃষ্টি কেড়ে নিত। কথাবার্তা, পড়াশুনা, চালচলন, ঘরদোর, বাগান, কাজকর্ম—জাকির হোসেন সাহেবের সব কিছুতেই সৌন্দর্যপ্রীতি ও রুচিবোধের পরিচয় ছিল। দর্শনপ্রার্থীদের বিদায় জানানোর জন্য উনি সব সময় বাংলোর শেষ দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। রাধাকৃষ্ণণের মত জাকির হোসেন সাহেবেরও পরিবারের কারুর সঙ্গে সরকারী কোন ব্যাপারের সম্পর্ক ছিল না।

এলো ১৯৬৭। ডঃ জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি হলেন। বিখ্যাত শ্রমিক নেতা প্রগতিশীল ভি. ভি. গিরি উপ-রাষ্ট্রপতি হয়েই সব উল্টে দিলেন। যে সব বৈশিষ্ট্যের জন্য উপ-রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন সবার মন জয় করেছিল, তার কিছুই রইল না এই জনদরদী প্রগতিবাদী শ্রমিক নেতার আমলে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বা ডক্টর জাকির হোসেন সাহেবের পাণ্ডিত্য বা বিমুগ্ধ মন সবার হতে পারে না—কিন্তু সারল্য, রুচি, সৌজন্য?

গদীতে বসার পরই ভি. ভি. গিরি জানালেন, এই বাংলোয় তাঁর অফিস ও বাসস্থানের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব নয়। সুতরাং লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হল নতুন অফিস-বাড়ি। হোম মিনিস্ট্রিতে চিঠি দিলেন, আরো কয়েকটা এয়ার-কণ্ডিশনার চাই। চিঠি পেয়ে হোম মিনিস্ট্রি অবাক। সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে হোম মিনিস্ট্রি নতুন উপ-রাষ্ট্রপতিকে জানাল, উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং তাই তাঁর অফিস ইত্যাদির ব্যাপারে বিধি-ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাজ্যসভার। সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করে এই রাজ্যসভার সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। চিঠি গেল রাজ্যসভার সচিবের কাছে। সচিবও অবাক। প্রচলিত নিয়মানুসারে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান অফিসে একটি ও বাড়িতে একটি এয়ার-কণ্ডিসনার পেতে পারেন কিন্তু তার

বেশি কী করে দেওয়া যায়? রাজ্যসভার সচিব গোপনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে ব্যাপারটি জানালেন। শ্রীমতী গান্ধী একটু মুচকি হেসে বললেন, স্বয়ং ভাইস-প্রেসিডেন্ট যখন চাইছেন, তখন না বলবেন কী করে?

এখানেই শেষ নয়। দ্বারে নিযুক্ত হল সশস্ত্র প্রহরী। নিযুক্ত হলেন এ-ডি-সি। গাড়ির সামনে দেখা গেল পুলিশ পাইলট ও পিছনে পুলিশের নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি। আরো কত কি!

জীবনে বহু জ্ঞানী, গুণী ও বিখ্যাত মানুষের সাহচর্যে এসেছি কিন্তু সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মত অনন্য পুরুষ খুব কম দেখেছি। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিক হয়েও তিনি যে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন; তা সত্যি বিস্ময়কর ছিল।

দু' নম্বর কিং এডওয়ার্ড রোডের মত রাষ্ট্রপতি ভবনেও রাধাকৃষ্ণণ প্রায় সারা দিনই কাটাতেন তাঁর নিজের ছোট্ট ঘরে। সেই একটি সিঙ্গল খাটে আধশোয়া অবস্থায় বসে বসে দুনিয়ার সবকিছু পড়া দেখে সত্যি অবাক হয়ে যেতাম। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ, দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের কাছে কত রকমের বই, পত্রপত্রিকা এবং রিপোর্ট আসত তার ঠিক-ঠিকানা নেই। অবিশ্বাস্য হলেও উনি সব কিছু পড়তেন। সিনেমা পত্রিকা? মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মুখপত্র? হ্যাঁ, তাও পড়তেন।

একদিন সকালে আমি ওঁর ঘরে গেছি। উনি কি একটা পত্রিকা পড়ছিলেন। পাশে আরো অনেক রকমের পত্রপত্রিকা পড়ে আছে। হঠাৎ উনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আর ইউ এ ফ্যান অব মীনাকুমারী অর বৈজয়ন্তীমালা?

প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠি। হাসি।

হাসছ কী? এর পর তখনকার তিন-চারটে হিন্দী ছবির নাম করে গম্ভীর হয়ে বললেন, এই ছবিগুলোতে ওরা খুব ভাল অভিনয় করেছে, তা তুমি জানো?

আমি মীনাকুমারী বা বৈজয়ন্তীমালা সম্পর্কে কোন কথা না বলে

বললাম, আপনি সিনেমার খবরও পড়েন ?

কেন পড়ব না ?

সিনেমা দেখার অবকাশ তাঁর ছিল না কিন্তু সব খবরাখবর রাখতেন এবং রাজ্যসভার কাজ পরিচালনার সময় কখনও কখনও এমন ছোটখাট টিকা-টিপ্পনী দিতেন যে এক মুহূর্তে সব উত্তেজনা থেমে যেত। ভূপেশদা (গুপ্ত) মাঝে মাঝে এমন তর্ক-বিতর্ক করতেন যে কংগ্রেস সদস্যরা ক্ষেপে উঠতেন। এই রকম তর্ক-বিতর্কের সময় একবার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ হাসতে হাসতে বললেন, ভূপেশ, ডানদিকের সদস্যরা (অর্থাৎ কংগ্রেসী) ভাবছে তুমি কে. এন. সিং-এর মত ভিলেনের ভূমিকায় নেমেছ কিন্তু আমি জানি তুমি অশোককুমারের মত আদর্শ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে চাইছ। তাই না ?

চারদিক থেকে হো হো করে হাসি উঠতেই তর্ক-বিতর্কের যবনিকা।

আরেকবারের কথা মনে পড়ছে। এই রকমই তর্ক-বিতর্কের সময় রাধাকৃষ্ণণ গম্ভীর হয়ে কংগ্রেস সদস্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন কিন্তু ভূপেশের সে সুযোগ নেই বলেই এখানে এসে চেঁচামিচি করে। তবে আমি নিশ্চিত যে আজকের মত ভূপেশ আর আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে না।

এক কথা লিখতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম, কিন্তু উপায় নেই। রাধাকৃষ্ণণ এবং জাকির হোসেন যত দিন উপ-রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ছিলেন, তত দিন বিরোধী পক্ষের এক চুল অধিকারও সরকার কেড়ে নিতে পারেননি। সরকারের কাজকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করার পূর্ণ সুযোগ তারা পেয়েছেন এবং এই দুজন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সামনে কোন সদস্যই কোন দিন অশালীন কিছু করতে সাহস করেননি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব, সরকারও বিরোধীদের গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তাদের দায়িত্ব পালনে অযথা বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি। রাধাকৃষ্ণণ বা জাকির হোসেন আইনজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতবোধ এত প্রখর ছিল যে সরকার ও বিরোধীপক্ষের কেউই কোন

আক্ষেপ বা অভিযোগ করার অবকাশ পাননি। প্রকৃতপক্ষে এই দুজনের সময় রাজ্যসভার আকর্ষণই অন্য রকম ছিল। ভি. ভি. গিরি এই গদীতে (উপ-রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান) বসার সঙ্গে সঙ্গেই সে আকর্ষণ শেষ হয়ে যায়। পাঠক ও জাত্তির আমলে অধঃপতন স্থায়ী রূপ নেয়।

যাই হোক, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ যে কত অনাড়ম্বর জীবন পছন্দ করতেন, তার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখা যেত তাঁর বিদেশ সফরের সময়। উপ-রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণকে প্রায়ই রাষ্ট্রীয় সফরে যেতে হত নানা দেশে এবং স্বাভাবিক ভাবেই উনি ওই সব দেশে রাষ্ট্রীয় অতিথি হতেন। সুতরাং দলবল নিয়ে সফরে গেলে কোন অসুবিধা হত না. কিন্তু না, তিনি কখনই তা করতেন না। সব সময় একা যেতেন। একবার নেহরু ওঁকে বললেন, হাজার হোক আপনি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বিদেশ সফরে আপনার সঙ্গে অন্তত দু-একজন অফিসার ও দু-একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী থাকা একান্তই দরকার।

হোয়াই ? রাধাকৃষ্ণণ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন. যাতায়াত করি এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে এবং প্লেনে এত যত্ন পাই যে অন্য কারুর সাহায্য দরকার হয় না। আর বিদেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাসের লোকজনই আমার দেখাশুনা করে। তাছাড়া সর্বত্রই আমার দু-চারজন ছাত্রছাত্রীকেও পেয়ে যাই। ওরাও কী আমার কম সাহায্য করে ?

দ্যাট আই এগ্রি—নেহরু তবুও বললেন, এ সব সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে দু-একজন থাকা দরকার। তাছাড়া এতে তো আমাদের বিশেষ খরচা নেই। আপনি তো সর্বত্রই স্টেট গেস্ট।

রাধাকৃষ্ণণ এবার হেসে বললেন, কিন্তু যাতায়াতের প্লেন ভাড়া তো আমাদের সরকারকেই দিতে হয়। সুতরাং লোকজন সঙ্গে নিয়ে সরকারের সে টাকাটাই বা নষ্ট করি কেন ?

নেহরু আর কিছু বলতে পারেননি।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই রকমই সুবিবেচক ছিলেন। বাহ্যিক

আড়ম্বর বা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য জনসাধারণের অর্থের অপ-ব্যবহার করতে তিনি আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। পরবর্তী কালে দিল্লীতে ও বিভিন্ন রাজ্যে কত প্রগতিবাদী জনদরদী নেতাই তো দেখলাম কিন্তু তাদের অধিকাংশের মধ্যেই এই রকম সুবিবেচনার ছিটে-ফোঁটাও দেখতে পেলাম না।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ছাত্রপ্রীতি দেখেও স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। মনে পড়ছে লক্ষ্ণৌয়ের একটা ঘটনা।

মাত্র একদিনের সফর। সকালে গিয়ে বিকেলেই ফিরবেন। একটির পর একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা। মাঝে রাজভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন এবং সামান্য কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম। রাজভবনের মধ্যাহ্ন ভোজনে আমন্ত্রিত হয়েছেন লক্ষ্ণৌয়ের বহু রথী-মহারথী কেষ্ট-বিষ্টুর দল। রাধাকৃষ্ণণ অযথা কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট না করে আমন্ত্রিতদের সবাইকে নমস্কার করেই সোজা খাবার টেবিলে বসলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই উনি আমাকে বললেন, চল, একটু ঘুরে আসি।

বললাম, চলুন।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের চীফ সেক্রেটারি পাশেই ছিলেন। এবার রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে বললেন, আমি একটু বেরুব।

তখনই কোথাও বেরুবার প্রোগ্রাম ছিল না। তাই চীফ সেক্রেটারি সবিনয়ে নিবেদন করলেন, বাট স্যার, ইওর নেক্সট প্রোগ্রাম ইজ....

ইয়েস আই নো। ঠিক সময়েই আমি আবার রাজভবনে ফিরে আসব।

চীফ সেক্রেটারি আর কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। তাড়াতাড়ি দু-চারজনের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণও অতিথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

নির্দিষ্ট গাড়িতে চড়তে গিয়েই রাধাকৃষ্ণণ দেখলেন, সামনে পিছনে পুলিশের বেতার গাড়ি, সশস্ত্র পুলিশের জীপ, স্বরাষ্ট্র সচিব ও প্রটোকল

অফিসারের গাড়ি-টাড়ি ছাড়াও পুলিশের মোটর সাইকেল আউট-রাইডার। এ সব দেখেই রাধাকৃষ্ণণ পাশে দাঁড়ানো চীফ সেক্রেটারিকে বললেন, আমি এক ছাত্রের বাড়ি যাচ্ছি। কোন পুলিশের গাড়ি যেন এই গাড়ির সামনে পিছনে না থাকে।

চীফ সেক্রেটারি হতভম্ব কিন্তু কী করবেন? রাজভবনের চত্বরে পড়ে রইল পুলিশের সব গাড়ি।

আমাদের গাড়ি রাজভবন থেকে বেরুতেই রাধাকৃষ্ণণ ড্রাইভারকে বললেন, টার্ন রাইট।

কিছু দূর যাবার পর উনি আমাকে বললেন, বাঁদিকের থার্ড রাস্তায় ঢুকেই ডানদিকে ঘুরতে হবে।

গাড়ি সে রাস্তায় ঢোকার পর কখনো সোজা, কখনো ডাইনে বাঁয়ে করে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি নজরে পড়তেই রাধাকৃষ্ণণ আমাকে বললেন, ঐ পুরানো বাড়িটার সামনে গাড়ি থামাও।

গাড়ি থামল ঐ বাড়ির সামনে।

এবার উনি আমাকে বললেন, দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই দেখবে দড়ি ঝুলছে। ঐ দড়ি টানলে ওপরে ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজবে। ঘণ্টা বাজলেই একটা মেয়ে বেরিয়ে আসবে। ওকে বলবে, আমি এসেছি। সব শেষে বললেন, বাংলাতেই কথা বোলো। ওরা বাঙালী।

গাড়ি থেকে নামলাম। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি, হ্যাঁ, দড়ি ঝুলছে। দড়িটা টানতেই ওপরে ঠুং ঠাং আওয়াজ হল। মধ্য-বয়সী একজন মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই?

বললাম, ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ এসেছেন।

আনন্দে, খুশিতে ভদ্রমহিলা প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, স্যার এসেছেন! উত্তেজনায় সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমেই আবার ওপরে উঠে গেলেন। চিৎকার করে কাকে যেন বললেন, স্যার এসেছেন। আমি নিয়ে আসছি। তারপর উনি তর তর করে নেমে এলেন।

ওকে দেখেই রাধাকৃষ্ণণ গাড়ি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলেন, গৌরী (?) হাউ আর ইউ? হাউ ইজ অমল (?)?

ভদ্রমহিলা ওঁকে প্রণাম করে বললেন, এখন একটু ভাল।

তারপর রাধাকৃষ্ণণ ওপরে উঠলেন।

মাঝারি সাইজের একখানা ঘর। ঘরের একপাশে চৌকির ওপর অমলবাবু শুয়ে। ঘরের চারদিকে কয়েকটা আলমারী ও শেল্ফে বই। পড়ার টেবিলেও অনেক বই ও কাগজপত্র। রাধাকৃষ্ণণকে দেখে অমলবাবু উঠে বসার চেষ্টা করতেই উনি বাধা দিলেন। চেয়ারটা চৌকির পাশে টেনে নিয়ে বসে রাধাকৃষ্ণণ ওর মাথায় হাত রাখলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর গৌরীদেবীর কাছ থেকে মেডিকেল রিপোর্টগুলো নিয়ে বললেন, আমি দিল্লীর দু-একজন ভাল ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ওদের মতামত জানিয়ে দেব। আর ওরা যদি বলেন, দিল্লী যেতে, তাহলে চলে এসো। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আমি নীরবে মুগ্ধ হয়ে সব কিছু শুনি।

রাধাকৃষ্ণণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অমলবাবু শুয়ে শুয়েই ওঁকে প্রণাম করার চেষ্টা করলেন। উনি বাধা দিয়ে বললেন, থাক থাক। আগে সুস্থ হয়ে নাও, তারপর প্রণাম করো।

গৌরী ওকে প্রণাম করলেন. রাধাকৃষ্ণণ ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোমার শরীর যেন ঠিক থাকে

পনেরো-বিশ মিনিট। না. আর সময় নেই। ধীরে ধীরে রাধাকৃষ্ণণ নেমে এলেন।

রাজভবনে ফেরার পথে গাড়িতে রাধাকৃষ্ণণ আমাকে বললেন, এরা দুজনেই আমার কাছে পড়েছে।

এবার আমি বলি, তা বুঝেছি। তাছাড়া এত অলি-গলি পার হয়ে ও বাড়িতে যেতেই বুঝলাম, ওখানে আপনার যাতায়াত আছে।

রাধাকৃষ্ণণ একটু হেসে বললেন, ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগে একবারই এই বাড়িতে এসেছি। তারপর ওরাও অনেক ঘুরে-ফিরে এখানে ফিরে এসেছে।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে ওই একবারই এসেছিলেন? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

ইয়েস।

আমি ওঁর স্মৃতিশক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

*   *   *

দু' হাজার আই-সি-এস. সৈন্যবাহিনীর দশ হাজার ইংরেজ অফিসার, ষাট হাজার সৈন্য ও দু' লক্ষ ভারতীয় সৈন্য নিয়ে যিনি ইংল্যাণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে এই উপমহাদেশ শাসন করতেন, তিনি ছিলেন ভাইসরয় বড়লাট। বড়লাট কোন সম্রাট ছিলেন না কিন্তু তিনি যে বৈভবের মধ্যে জীবন কাটাতেন, তা বোধ হয় স্বয়ং ইংল্যাণ্ডেশ্বরও উপভোগ করতেন না। বড়লাটের বাসস্থানই ভাইসরয় হাউস। আরব্য উপন্যাসের মত অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ কথা সত্য যে এই একটি মানুষের সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভাইসরয় হাউসে পাঁচ হাজার কর্মচারী ছিলেন। বিলাস-ব্যসনের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় যে চতুর্দশ লুই ও জার সম্রাটের নাম চিরকালের জন্য লেখা থাকবে, তাদের সেবার জন্যও প্রত্যক্ষভাবে এত কর্মচারী ছিল না। ফরাসী সম্রাটের ভার্সাই প্রাসাদ বা জারের পিটারহফ্ প্রাসাদের মতই ভাইসরয় হাউসও একটি বিরাট প্রাসাদ এবং আমাদের এই ভাইসরয় হাউসের পর পৃথিবীর কোন দেশে এমন বিশাল প্রাসাদ আর কোথাও তৈরি হয়নি। দিল্লীর ভাইসরয় হাউসই পৃথিবীর সর্বশেষ প্রাসাদ। আর সেদিনের সেই ভাইসরয় হাউসই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন।

এই রাষ্ট্রপতি ভবন নিয়ে নিঃসন্দেহে হাজার পাতার ইতিহাস বই লেখা যায়। এ প্রাসাদে ৩৭টি অভ্যর্থনা কক্ষ আছে। ঘরের সংখ্যা ৩৪০। মুঘল গার্ডেনে মালী ছিল ৪১৮ জন। ৫০ জন ছোকরা শুধু এই বাগান থেকে পাখি তাড়াত। চেম্বারলিন, খিদমতগার, স্টুয়ার্ট, কুক, খানসামা, অর্ডালী ইত্যাদির সংখ্যা ছিল কম-বেশি দু'

হাজার। এর ওপর বডিগার্ডস, ঘোড়সওয়ার, সেক্রেটারিয়েট ও মিলিটারী সেক্রেটারির এলাহি দপ্তর। লর্ড মাউন্টব্যাটনের সময় এই চেহারাই ছিল ভাইসরয় হাউসের। সাইনবোর্ড বদলে রাষ্ট্রপতি ভবন হলে কিছু রদবদল হয়েছে ঠিকই কিন্তু এমন কিছু হয়নি, যা বিস্ময়কর বা বৈপ্লবিক।

যা বদলেছে তা হচ্ছে এই প্রাসাদের মুখ্য বাসিন্দার জীবনধারণ। রাজাগোপালাচারী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণও অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজাজী যখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন তখনও পুরোদমে সাহেবী আমলের মত এই প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ হত। রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত গান্ধীবাদী রাষ্ট্রপতি ভবনের মুখ্য বাসিন্দা হবার পর হাওয়া বদলে গেল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজের লেখাপড়া ও কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের কোন ব্যাপারেই উনি মাথা ঘামাতেন না। এ সব ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারিই সর্বময় কর্তা ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে এমন অসংখ্য জিনিস আছে যা বহু মিউজিয়ামেও নেই। ভারত ও ইংল্যাণ্ড ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশের বহু বিখ্যাত শিল্পীর বহু অমূল্য পেন্টিং ও ভাস্কর্যও রাষ্ট্রপতি ভবনের সংগ্রহে আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় রুচিহীন মিলিটারী সেক্রেটারির ও ঐসব অমূল্য সম্পদের তদারকী ভারপ্রাপ্ত শিল্পীদের ঔদাসীন্য ও গাফিলতিতে বহু পেন্টিং ও ভাস্কর্য মাটির নীচের সেলারের অন্ধকার গুদামে স্থান পেয়েছিল। রাধাকৃষ্ণণ রাষ্ট্রপতি ভবনে আসার কয়েকদিন পরেই ঐসব অমূল্য সম্পদ অন্ধকার সেলার থেকে উদ্ধার করাবার পর গম্ভীর হয়ে অফিসারদের বললেন, ইউ উইল গেট মেনি মোর প্রেসিডেন্টস কিন্তু এই সব অমূল্য পেন্টিং বা ভাস্কর্য আর পাওয়া যাবে না। কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর সাহায্যে এই সব পেন্টিং ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলিকে পুরনো মর্যাদায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং রাধাকৃষ্ণণের নির্দেশে ও তাঁর পুত্রবধূর (ডঃ গোপালের স্ত্রী) ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সেগুলি আবার যথাযথ স্থানে রাখা হয়।

পৃথিবীর নানা দেশের রাষ্ট্রনায়করা ভারত সফরে এলেই রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রীয় ভোজে আপ্যায়ণ করা হয়। প্রটোকল অনুযায়ী সে ভোজের উদ্যোক্তা কখনও স্বয়ং রাষ্ট্রপতি, কখনও প্রধানমন্ত্রী। কখনও আবার দুজনেই দু'দিন রাষ্ট্রীয় ভোজে আপ্যায়ণ করেন সম্মানিত অতিথিকে। এ সব রাষ্ট্রীয় ভোজসভার পর কিছুক্ষণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সম্মানিত অতিথিদের সম্মানে। এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের বিখ্যাত শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে গানের চাইতে সেতার, সরোদ, বাঁশী বাজিয়ে শোনানোই হয় বেশি এবং তার কারণ গানের চাইতে এই সব বাজনাই সম্মানিত অতিথিরা বেশি উপভোগ করেন। এই সঙ্গে প্রায় সব সময়ই নাচের ব্যবস্থা থাকে। বলা বাহুল্য, ভারত বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীরাই শুধু আমন্ত্রণ পান এই ভি-ভি-আই-পি সমাবেশে নাচ দেখাবার। শিল্পীদের নির্বাচন করার দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এবং শিল্পীরা পারিশ্রমিকও পান ঐ মন্ত্রণালয় থেকে। সমালোচনার ভয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সব সময়ই শুধু অতি-খ্যাত ও প্রবীণ শিল্পীদের নির্বাচন করেন। এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটালেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তিনি পররাষ্ট্র সচিব ও তাঁর নিজস্ব মিলিটারী সেক্রেটারিকে বললেন, তরুণ শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া কী আমাদের কর্তব্য নয়? ওদের উৎসাহ না দিলে বহু প্রতিভাই হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া প্রবীণ শিল্পীরা কী চিরকাল বেঁচে থাকবেন? উই মাস্ট এনকারেজ ইয়াং ট্যালেণ্টস্।

ব্যস! সেই থেকে শুরু হল রাষ্ট্রপতি ভবনের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তরুণ শিল্পীদের আত্মপ্রকাশ। অনেক শিল্পীর কথাই এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কিন্তু বিশেষ করে মনে পড়ছে আজকের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না ভারতনাট্যম শিল্পী শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তির কথা।

বিশ-বাইশ বছর আগে কে চিনত যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে।

আমি যামিনীকে প্রথম দেখি উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের বাড়িতে। আমি ঘরে ঢুকতেই যামিনীকে দেখিয়ে রাধাকৃষ্ণণ আমাকে বললেন,

যামিনী ইজ এ ভেরি গুড ডান্সার। তোমাদের উইকলি কাগজে তো নানা রকমের লোকজনকে নিয়ে ফিচার লিখছ। হোয়াই নট রাইট অন যামিনী ?

দু-একদিন পর আমি আমাদের পত্রিকার ফটোগ্রাফার সুদর্শন খোসলাকে নিয়ে এক সকালবেলায় হাজির হলাম যামিনীর আস্তানায়। কনট প্লেসে একটা দোকানের ওপরের একখানা ঘরে যামিনী তাঁর বাবা পণ্ডিত কৃষ্ণমূর্তি ও ছোট বোন যমুনাকে নিয়ে থাকে। বেশ মনে আছে ঘরের মধ্যে কোন আসবাবপত্র ছিল না। মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে যমুনা আমাদের বসতে দিল। ঘরের পাশের একফালি বারান্দা থেকে ভারত নাট্যমের সাজে সেজে আসার পর যামিনীর নানা ভঙ্গিমায় ছবি তোলা হল ঘণ্টাখানেক ধরে। দু-এক সপ্তাহ পরেই যামিনীর দশ-বারোখানা ছবি ছাপা হল আমাদের পত্রিকায়। পত্রিকাটি দেখে রাধাকৃষ্ণণ মহা খুশি হয়েছিলেন এবং যত দূর মনে পড়ে সেই প্রথম যামিনীর ছবি ছাপা হয়।

আজ থেকে ঠিক তেইশ বছর আগেকার ঘটনা। তারপর গঙ্গা-যমুনা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে। নিত্যনতুন সম্মানের স্মৃতিতে যামিনী হয়তো সেদিনের কথা ভুলে গেছেন কিন্তু আমি ভুলিনি রাধাকৃষ্ণণ ওর জন্য কি করেছিলেন। জানি না যমুনা কোথায় আছে। যমুনাও খুব ভাল শিল্পী ছিল। বোধ হয় দিদির খ্যাতির পথে প্রতিদ্বন্দ্বিনী না হবার জন্য যমুনা নাচ ছেড়ে দেয়। ওকে দেখলেই আমার অন্নপূর্ণাদেবীর কথা মনে হত। সেন্ট্রাল ভিস্তা এয়ারফোর্স মেসের সেই সুন্দর অফিসারটির সঙ্গেই বোধ হয় যমুনার বিয়ে হয়েছে।

সে যাই হোক মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্যই যেমন ইন্দ্রানী রহমানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে, সেই রকম সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্যই যামিনী কৃষ্ণমূর্তির খ্যাতি হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে এক বাঙালী শিল্পীর কথা মনে পড়ছে। শিল্পী হিসাবে রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন এবং তাঁর জন্য কিছু

করতে পারলে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ অত্যন্ত খুশি হতেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শিল্পী তাঁকে সে সুযোগ দেননি।

সেটা ১৯৬৫ সাল। বছর খানেক আগে প্রধানমন্ত্রী নেহরু মারা গিয়েছেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডি, অতুল্য ঘোষ, নিজলিঙ্গাপ্পা এবং আরো কয়েকজন দুরদর্শিতাহীন কংগ্রেস নেতারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার শুরু করলেন—লালবাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী হবার কোন মুরোদ নেই কিন্তু লোকটি মোটামুটি ভাবে জনপ্রিয় বলেই ওরা ওকে প্রধান-মন্ত্রী করেছেন এই সর্তে যে ওদের পরামর্শ মতই উনি দেশ চালাবেন। এই সব প্রাদেশিক কংগ্রেসী জায়গীরদাররা দিল্লীতে পাকাপাকি ভাবে বসে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে কিছু কিছু বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের স্নেহভাজন সাংবাদিকদের মাধ্যমে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচার চালাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে দেশের সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, সিণ্ডিকেটের (কংগ্রেস) নেতারাই 'ব্যাক-সিট ড্রাইভিং' করে দেশ চালাচ্ছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আবির্ভূত হলেন এক মার্কিন সংবাদপত্রের দিল্লী সংবাদদাতা।

এই সংবাদদাতা সম্পর্কে একটু আলাদা করে বলা প্রয়োজন। ইনি ভারতীয়। জন্মস্থান পশ্চিম পাকিস্তানে। আসানসোল, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া অঞ্চলে কিছু কাল শ্রমিক আন্দোলন করেছেন। পরবর্তীকালে অজ্ঞাত কারণে মার্কিন দেশে কাটিয়েছেন বেশ কয়েক বছর। তারপর অকস্মাৎ দিল্লীতে আবির্ভাব এক মার্কিন সংবাদপত্রের সংবাদদাতারূপে। সিণ্ডিকেটের প্রায় প্রত্যেকটি নেতার সঙ্গে এর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। নেতাদের বাড়ির অন্দরমহলে এর অবাধ যাতায়াত ছিল। এরই অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসের কিছু নেতা মার্কিন দেশের আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে গভীর ভাবে পড়াশুনা শুরু করেন। বলা বাহুল্য এই 'সাংবাদিক'-এর সুপারিশে

মার্কিন দূতাবাস থেকে হাজার হাজার টাকার বই পৌঁছে যেত বিভিন্ন কংগ্রেসী নেতাদের বাংলোয়। মজার কথা, যে-সব নেতারা এই সব বইপত্র উপহার পেতেন, পাণ্ডিত্যের জন্য তাদের কারুরই খ্যাতি ছিল না। বইপত্র ছাড়াও মার্কিন দূতাবাস থেকে মাঝে মাঝে বাক্স ভর্তি সিগারেট-টিগারেটও কিছু নেতার বাড়ি যেত। শুধু তাই নয়, এই 'সাংবাদিক' নিজে কিছু কিছু কংগ্রেসী নেতাকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আস্তানায় নিয়ে গেছেন।

এই 'সাংবাদিকের' প্রতিপত্তির আরো একটা নজীর দিই। পার্লামেণ্টের সেণ্ট্রাল হলে কোন বিদেশী সংবাদপত্রের সংবাদদাতার প্রবেশাধিকার নেই কিন্তু কোন অনুমতিপত্র ছাড়াই মার্কিন সংবাদ-পত্রের এই 'সংবাদদাতা' নিয়মিত সেণ্ট্রাল হলে যেতেন এবং সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেই নিয়মিত আড্ডা দিতেন। অজ্ঞাত রহস্যজনক কারণে কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট-সোস্যালিষ্ট-জনসঙ্ঘ দলের কোন এম-পিই এই সাংবাদিকের সেণ্ট্রাল হলে নিয়মিত আড্ডা দেবার ব্যাপারে কোন আপত্তি জানাননি।

খানিকটা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম এইটুকু বলার জন্য যে এই বিখ্যাত সাংবাদিকের অতি উৎসাহের ফলেই বিদেশের মানুষকে জানানো হয়—লালবাহাদুর শাস্ত্রী সাক্ষীগোপাল মাত্র। আসল কলকাঠি নাড়ছেন সিণ্ডিকেটের কয়েকজন নেতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এমন অসহায় অবস্থার খবর জানতে পেরে মহা খুশি হলেন পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক আয়ুব খান।

আয়ুব খান নেহরু-হীন ভারতের 'মহাদুর্দিনে' ভারতকে শিক্ষা দেবার জন্য খুব বেশি সময় নষ্ট করলেন না। অমূল্য তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ 'রাণ অব কচ্ছে' আয়ুব খানের তাঁবেদারী সৈন্যবাহিনী মার্কিন ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে এলো বেশ কিছুটা। গর্জে উঠলেন লালবাহাদুর। হুঁসিয়ার করে দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার প্রেসিডেণ্ট জনসনকে। বহু বাধা অতিক্রম করে ভারতীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে গেল রাণ অব কচ্ছের দিকে।

থমকে গেলেন আয়ুব খান কিন্তু 'দুর্বল' ভারত সরকারকে শিক্ষা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। সাতচল্লিশ সালের নভেম্বর মাসে জিন্না সাহেব যেমন রাজাকার পাঠিয়ে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, আয়ুব খান ঠিক অনুরূপ প্রচেষ্টা করতেই 'দুর্বল' প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেনাবাহিনীকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। শাস্ত্রীজির 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ' মন্ত্রে ষাট কোটি ভারতবাসী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

এর পরের কাহিনী সবার জানা আছে। যা জানা নেই তা হচ্ছে এই যে, ঐ 'সাক্ষীগোপাল' ও 'দুর্বল' লালবাহাদুরের দুর্জয় সঙ্কল্প ও অভাবনীয় নেতৃত্বের পরিচয় পেয়ে শুধু আয়ুব খান না, সিণ্ডিকেটের কেষ্ট-বিষ্টুরাও ঘাবড়ে গেলেন। দিল্লীতে বসে ফোপর দালালী করার সুযোগ নেই দেখে অনেক নেতাই দীর্ঘ কয়েক মাস পর স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে গেলেন। শুরু করলেন দেশরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থ ও জিনিসপত্র সংগ্রহ। কংগ্রেস নেতাদের সে কী উৎসাহ! খরা, বন্যা, নির্বাচন আর যুদ্ধের সময় অনেক নেতাই এমন জনদরদী ও কাজপাগল হয়ে ওঠেন, যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এমন মওকায় নেতারা কেন দেশ ও দশের সেবায় পাগল হয়ে ওঠেন, তা কে না জানে?

যাই হোক, যুদ্ধ বিরতি হবার ক'দিন পরই শাস্ত্রীজি একদিন আমাকে বললেন, তোমার সঙ্গে তো অনেক গায়কের পরিচয় ও বন্ধুত্ব আছে। তুমি ওদের এনে একটা অনুষ্ঠান করে কিছু টাকা তুলছ না কেন?

শাস্ত্রীজির অনুপ্রেরণাতেই ঐতিহাসিক বিজ্ঞান ভবনে দু'দিনের বাংলা সঙ্গীত সম্মেলন করলাম। (এর আগে বিজ্ঞান ভবনে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়নি।) প্রায় সমস্ত বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা বিনা পারিশ্রমিকে এই সম্মেলনে যোগ দিলেন এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করতেই উনি এই সম্মেলনের

গান রেডিও থেকে সাত ঘণ্টা প্রচার করার ব্যবস্থা করলেন। শিল্পীদের ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ বাসভবনে আপ্যায়িত করলেন প্রধানমন্ত্রী, শ্রীমতী গান্ধী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা, দেশরক্ষা মন্ত্রী চ্যবন ও আরো অনেকে। সর্বোপরি শিল্পীদের সম্বর্ধনা হল রাষ্ট্রপতি ভবনে। সেই কাহিনী বলতে গিয়েই কত কি মনে পড়ল। খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও তাই এই সব না লিখে পারলাম না।

যাই হোক, একদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণকে সম্মেলনের বিষয়ে সবকিছু জানাবার পর বললাম, একসঙ্গে এত গুণী বাঙালী শিল্পীর সমাবেশ কখনও দিল্লীতে হয়নি। সুতরাং আপনার এখানে একটা কিছু অনুষ্ঠান হওয়া উচিত বলে মনে হয়।

বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় হাসতে হাসতে উনি বললেন, তোমার মাথায় যখন ঢুকেছে তখন কিছু তো না করে উপায় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী সেক্রেটারি মেজর জেনারেল সিংকে ডেকে বললেন, শুনুন, নিমাই কি বলছে।

আমি আমার বক্তব্য বলতেই মেজর জেনারেল সিং রাষ্ট্রপতিকে বললেন, স্যার, অত শিল্পীর গান শোনার সময় কী আপনার হবে?

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ হাসতে হাসতে বললেন, একে নিমাই-এর ব্যাপার, তার ওপর এতজন গুণী শিল্পী আসবেন। সময় আমাকে দিতেই হবে।

দিনক্ষণের ব্যাপারে কথাবার্তা বলার পর মেজর জেনারেল সিং রাষ্ট্রপতিকে বললেন, স্যার, শিল্পীদের লীডারকে শ' পাঁচেক টাকার তোড়া দিলেই হবে তো?

ফর দ্যাট কনসার্ণ্ট নিমাই।

মেজর জেনারেল সিং আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই আমি বললাম, না, তা হতে পারে না। ওরা প্রত্যেকেই গুণী শিল্পী। জনাবিশেক শিল্পীকে কী ঐ টাকা ভাগ করে দেওয়া যায়?

মোট হাজারখানেক দিলে তো হবে?

না, তাও হবে না। আমি আরো বললাম, শিল্পীরা রাষ্ট্রপতির আশীর্বাদ পেলেই ধন্য হবে। তাঁদের আর কিছু চাই না।

মেজর জেনারেল সিং বললেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো ফ্রী সার্ভিস নেন না।

আমি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সামনেই বললাম, কিন্তু তাই বলে তো তাঁরা এখানে অপমানিত হতে আসবে না। তাদের প্রত্যেককে শ'পাঁচেক করে দিতে পারেন না?

তাহলে তো হাজার দশেক টাকার দরকার। না, না, অত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

তাহলে অল্প কিছু দিন। আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম, যা-ই দেওয়া হোক, তা প্রত্যেকটি গায়ক ও তবলচীকে দিতে হবে।

হোয়াই তবলচী? ফোঁস করে উঠলেন মেজর জেনারেল। আমি একটু মৃদু হেসে বললাম, তারাও গুণী শিল্পী।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত মোহরাঙ্কিত ফ্রেমে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর করা ছবি দেওয়া হবে প্রত্যেকটি শিল্পীকে এবং এই সিদ্ধান্ত হল স্বয়ং ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের সুপারিশে। মেজর জেনারেল সিং প্রস্তাবটি মেনে নিলেও আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা এই উপহার বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও ভারতস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের দিয়ে থাকি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বললাম, জেনারেল, আর্টিস্ট লাইক পঙ্কজ মল্লিক এ্যাণ্ড আদার্স আর নো লেস রেসপেক্টেবল ছান দেম।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ছাট্স রাইট। পঙ্কজ ইজ পঙ্কজ!

আর একটি শব্দ উচ্চারণ না করে মেজর জেনারেল সিং রাষ্ট্রপতিকে স্যালুট করে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন।

উনি বেরিয়ে যাবার পর পরই ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ একজন শিল্পীর নাম করে জিজ্ঞেস করলেন, ও আসছে তো?

হ্যাঁ, উনিও আসছেন।

ও আমাকে গান শোনাবে তো?

আমি হেসে বললাম, নিশ্চয়ই শোনাবেন।

এবার ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ নিজে থেকেই বললেন, ও সত্যি অত্যন্ত উচুদরের শিল্পী।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবার রাষ্ট্রপতি বললেন, মাঝে মাঝে ভাবি ইউনেস্কো সেক্রেটারি জেনারেলকে বলব, প্যারিস হেডকোয়ার্টার্সে ওর একটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে।

শুনে এত আনন্দ হল যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না কিন্তু আমার সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। মেজাজ ভাল নেই বলে ঐ শিল্পী রাষ্ট্রপতি ভবনের সম্বর্ধনা সভায় গেলেন না। আমি মনে মনে বুঝলাম, গ্রামে-গঞ্জে প্যাণ্ডেলে গান গেয়ে মোটা টাকা পেয়ে পেয়ে ওদের রুচিটাই নষ্ট হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আমি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণকে বললাম, হঠাৎ ওর শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় উনি আসতে পারলেন না।

পরে একদিন ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ আমাকে বলেছিলেন, বাঙালী শিল্পীরা যদি বোম্বে-মাদ্রাজের শিল্পীদের মত ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারতেন ও পাঁচজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাহলে তাঁদের অনেকের খ্যাতিই বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত বাট নাইদার দে উইল বী সোস্যাল নর দে লাইক টু লার্ণ ইংলিশ।

* * *

ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিকই রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রধান আবাসিক। সেই উনিশ শ' বাহান্ন সালে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রাসাদে ঢোকেন। তারপর কতজনেই রাষ্ট্রপতি হলেন।

গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার দেয়নি কিন্তু দিয়েছে অকল্পনীয় সম্মান। সমগ্র রাষ্ট্রের তিনি প্রতীক। তাঁরই নামে চলে সরকার। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর তিনিই সর্বাধিনায়ক। তাঁরই আমন্ত্রণে সন্ধ্যা-পার্টি ভোজের দেওয়া হয়

প্রাধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ ও মন্ত্রগুপ্তি নিতে হয় এই রাষ্ট্রপতির কাছেই। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁরই কাছ থেকে নিয়োগপত্র পান। রাষ্ট্রদূতরাও তাই। ভারতস্থ বিদেশী রাষ্ট্রদূতরাও তাঁদের পরিচয়পত্র রাষ্ট্রপতির করকমলে সমর্পণ করে কাজ শুরু করেন। আরো কত কি। ক্ষমতা না থাক, এই সম্মানের কি মূল্য নেই? যাকে-তাকে কি এই সম্মান দেওয়া যায়? নাকি উচিত?

ষাট-সত্তর কোটি ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্য প্রথম দিকে এমন এক একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, যাঁদের নিয়ে গর্ব করা যায় কিন্তু পরবর্তীকালে এমন এক একজনকে এই অভূতপূর্ব সম্মান প্রাবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, যাঁদের কীর্তি কাহিনী জানলে সমস্ত ভারতবাসী মাথা হেঁট করবেন।

এমন এক ব্যক্তি একবার রাষ্ট্রপতি হলেন, যার সীমাহীন দৈন্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। দিল্লীতে এই ভদ্রলোকের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিল। তারা চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। থাকতেন নিজেদের আস্তানাতেই কিন্তু সেসব বাড়িতে রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ঐ ভদ্রলোক যখন রাষ্ট্রপতি তখন রাষ্ট্রপতি ভবনের গাড়ি ছুটে বেড়াতো সারা দিল্লী। ঐসব গাড়ি করে রাষ্ট্রপতির আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিদিন সকালে-সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে সরকারী তহবিলের সর্বনাশ করে খাওয়া-দাওয়া করতেন।

রাষ্ট্রপতি ভবন সংলগ্ন জমিতে শুধু ফুলের বাগানই নেই, চাষ হয় অনেক কিছুর। ধান-গম থেকে আলু-পটল-পেঁয়াজ-টমাটো। আরো কত কি। এসব চাষ হয় রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রয়োজনেই কিন্তু ঐ মহাপুরুষটি এইসব আলু-পেঁয়াজ দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতেন নিয়মিত।

রাষ্ট্রপতি ভবনের সবাই এ খবর জানতেন কিন্তু বাইরের কেউ রাষ্ট্রপতির এই লোভের কথা জানতেন না। কথায় বলে, চোরের দশ দিন, গেরস্থর একদিন।

রাষ্ট্রপতি সপরিবারে নিজের দেশে যাবেন। দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানটি দাঁড়িয়ে। র‍্যামপ্-এর পাশেই কমাণ্ডার অব্ দ্য এয়ার ক্রাফট ও অন্যান্য বিমান-কর্মীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার ও পুলিশ অফিসাররাও রাষ্ট্রপতির জন্য অধীর প্রতীক্ষায়।

নিয়ম অনুযায়ী ভি-আই-পি কনভয়ের আগেই এলো মালপত্র। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরিবার এবং রাষ্ট্রপতির সহযাত্রী রাষ্ট্রপতি ভবনের অফিসার ও কর্মীদের মালপত্র বিমানে তোলা শুরু হল। প্রায় সব মাল উঠে গেছে। এমন সময় কয়েকটা বস্তা তুলতে গিয়েই বিভ্রাট। হঠাৎ একটা বস্তা বিমানের দরজার কাছ থেকে মাটিতে পড়লেই কয়েক মণ পেঁয়াজ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

সবাই অবাক। রাষ্ট্রপতি বস্তা বোঝাই পেঁয়াজ নিয়ে যাচ্ছেন। মুখে কেউ কিছু না বললেও লজ্জায় ঘেন্নায় সবাই মুখ নীচু করলেন।

ইতিমধ্যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সদলবলে হাজির। একবার আড়চোখে বস্তামুক্ত পেঁয়াজগুলোর গড়াগড়ি দেখে বিমানকর্মী ও অন্যান্যদের সঙ্গে করমর্দন করে বিমানে উঠলেন কিন্তু পেঁয়াজগুলো আবার সংগ্রহ করে বস্তাবন্দী হয়ে বিমানে তোলার পরই ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমান আকাশে উড়ল।

আমাদের সৌভাগ্য আমরা এমন মহামান্য রাষ্ট্রপতিও পেয়েছি যাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী চোর।

রাষ্ট্রীয় সফরে রাষ্ট্রপতি গিয়েছেন এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী। মাননীয়া ফার্স্ট লেডি অব ইণ্ডিয়া। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও তাঁর স্ত্রীর জন্য সম্মানে অতিথিসেবক রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় ভোজের আয়োজন করেছেন এক বিখ্যাত হোটেলে। রূপার কাটলারী দেখে মাননীয়া রাষ্ট্রপতির পত্নী আর লোভ সামলাতে পারলেন না। ভোজনসভা শেষে ঘরে ফেরার সময় তিনি কয়েকটা ছুরি-কাঁটা চামচ ইত্যাদি শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চলে এলেন।

এই রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সহধর্মিণী গিয়েছেন দূর প্রাচ্যের একটি দেশে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও দলের সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এক বিখ্যাত হোটেলে। রাষ্ট্রপতির ঘরের মধ্যে ও বাইরে অমূল্য শিল্প সামগ্রী দিয়ে সাজান হয়েছে সরকারী উদ্যোগে। তার কয়েকটি বড় পছন্দ হল মাননীয়া রাষ্ট্রপতি-পত্নীর। যথারীতি তিনি দু'চারটে তুলে নিজের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন দেশে নিয়ে যাবার জন্য।

সুখের কথা কোন দেশের কোন চুরি করা জিনিষই আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত পৌঁছায়নি। রাষ্ট্রপতি-পত্নীর স্বভাবের কথা আমাদের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের ভালভাবেই জানা ছিল। তাই তো এই রাষ্ট্রপতি কোন দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গেলেই নিরাপত্তা কর্মীরা ছাড়াও দু'চারজন ঝানু গোয়েন্দা পাঠানো হত। এইসব ঝানু গোয়েন্দারা চুরি করা জিনিষপত্র আবার চুরি করে যথাস্থানে রেখে দিতেন।

আরেক রাষ্ট্রপতির কাহিনী প্রায় অমৃত সমান।

ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল চলেছে অষ্ট্রেলিয়া। প্রতিনিধি দলে দু'একজন মহিলা সদস্যও আছেন। বিমানে এক মহিলা সদস্যর পাশেই বসেছেন পরবর্তী কালের এক রাষ্ট্রপতি।

দিল্লী থেকে পার্থ। পার্থ থেকে ক্যানবেরা। এক মহাদেশের দুটি প্রান্ত। দীর্ঘ পথ। সারারাত ধরে বিমান চড়ার পরই ক্যানবেরা পৌঁছানো যাবে। নৈশ-ভোজন শেষ। প্লেনের উজ্জ্বল আলোগুলো আর জ্বলছে না। সারা প্লেনে আবছা আলো। প্রায় সব যাত্রীই সীট ঠিক করে কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। কয়েকজন যাত্রী মাথার উপরের আলো জ্বেলে বইপত্র পড়ছেন।

ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সবাই ঘুমুচ্ছেন। ভাবী রাষ্ট্রপতির পাশের মহিলা সদস্যাও ঘুমুচ্ছেন। উনি ঘুমের মধ্যেই অনুভব করলেন শাড়ির মধ্যে দিয়ে কি যেন একটা কিছু আস্তে আস্তে তাঁর শরীরের উপর দিকে এগুচ্ছে। হঠাৎ খুব বেশী অস্বস্তি বোধ করতেই উনি খপ করে চেপে ধরলেন।....

শাড়ির মধ্যে কোন পোকা-মাকড় ঢোকেনি। ভাবী রাষ্ট্রপতির হাতই শাড়ির তলা দিয়ে....

এই মহিলা সদস্যটির সৎ সাহসের খ্যাতি ছিল এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ইনি পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে প্রকাশ্যে বলতেন, দোহাই, এই চরিত্রহীন লোকটিকে ভোট দেবেন না।

এসব কথা লিখতেও ঘেন্না হয় কিন্তু তবু না লিখে পারি না। সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যে নানা রকমের দুর্বলতা থাকবেই কিন্তু যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন, তাদের মধ্যে দৈন্য, মালিন্য ও চারিত্রিক দুর্বলতা থাকলে সমাজ বা রাষ্ট্র কিভাবে চলবে? ষাট কোটি মানুষের মধ্যে কী এমন একজনকে পাওয়া যায় না যাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি-মনীষা ত্যাগ-তিতিক্ষা ও চরিত্র আমাদের অনুপ্রাণিত করবে?

আজকাল রাজনৈতিক জগতের আরশোলা-টিকটিকিদের ঔদ্ধত্য দেখলেই মনে পড়ে যায় আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদের কথা। একবার কলকাতা থেকে প্রকাশিত পদ্মপুরাণের কয়েকটি খণ্ড ওঁকে উপহার দিতে গেছি। এ-ডি-সি আমাকে রাষ্ট্র-পতির স্ট্যাডিতে ঢুকিয়েই চলে গেলেন।

বিরাট স্ট্যাডির এক কোণায় বসেছিলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। আমি ওঁর কাছে যেতেই উনি আমার পায় হাত দিয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হলেন। আমি ছিটকে দূরে সরে গেলাম কিন্তু উনি বার বার আমাকে প্রণাম করার চেষ্টা করলেন।

তুমি ব্রাহ্মণ। তোমাকে প্রণাম করব না?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম, আপনি আমার পিতৃতুল্য। তাছাড়া অন্যান্য সবদিক দিয়েই আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। তাই আমিই আপনাকে প্রণাম করব।

উনি তবুও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত উনি হাত জোড় করে নমস্কার করে আমাকে আগে বসিয়ে তারপর নিজে বসলেন।

শুধু ব্রাহ্মণকেই উনি প্রণাম করতেন না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গুণী-জ্ঞানী বা প্রবীণদেরও উনি প্রণাম করতেন। সংস্কৃত ও উর্দু ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের রাষ্ট্রীয় সম্মানে সম্মানিত করা শুরু হয় ওঁরই উদ্যোগে।

এই চারিত্রিক মাধুর্য ও বিনয় আজ কোথায় ?

মনে পড়ছে আরো একটা ঘটনা। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রীয় সফরে জাপান গিয়েছেন। একদিন এক রাষ্ট্রীয় ভোজের ঠিক আগে সহযাত্রী রাষ্ট্রপতি ভবনের এক কর্মী হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হলে উনি ভোজসভা বাতিল করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তারপর প্রবীণ অফিসারদের পরামর্শে উনি ভোজসভায় যোগদান করলেও আবার রোগীর শয্যাপার্শে ফিরে আসেন।

মানুষের প্রতি এই দরদ, ভালবাসা না থাকলে কি সবার শ্রদ্ধা লাভ করা যায় ?

আবার নিরীহ মানুষটি কত স্পষ্ট বক্তা ছিলেন ভাবলেও অবাক হতে হয়। ভারত সফর শেষে রাণী এলিজাবেথ দিল্লী ত্যাগ করার প্রাককালে উনি জানতে পারেন, রাজেন্দ্রবাবু ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হবার কাহিনী নিয়ে একখানা অতি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। সবিস্ময়ে রাণী ওঁকে বললেন, সারা জীবনই নানা কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। এই বই লেখার সময় পেলেন কখন ?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ নির্বিকারভাবে বললেন, আপনার বাবার জেলখানায় এত দীর্ঘদিন থেকেছি যে এ বই লিখতে কোন অসুবিধে হয়নি।

শুধু রাণী বা প্রিন্স ফিলিপ না, উপস্থিত ভারতীয় অফিসাররাও রাজেন্দ্রবাবুর স্পষ্টবাদিতার প্রমাণ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

এই ধরণের মানুষ কি আবার রাষ্ট্রপতি হবেন না ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর নানা দেশের মানুষকে শিখিয়েছিল যে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা দেশের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন কূটনৈতিক মিশনের কূটনৈতিকরা কিন্তু সব সময় এই যোগাযোগের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট দেশের ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশ্ব শান্তির স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মাঝে মাঝে

রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ। সে যোগাযোগ কখনও চিঠিপত্রের মাধ্যমে, কখনও বা ব্যক্তিগত দেখাশুনা-কথাবার্তার দ্বারা।

রাষ্ট্রনায়কদের রাষ্ট্রীয় সফর হয় আরো একটি কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্র বড় দ্রুত গতিতে বদলাতে শুরু করে। নানা মহাদেশের নানা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে শুরু করে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই জন্ম নেয় তৃতীয় বিশ্ব' (থার্ড ওয়ার্লড কানট্রিস)। এই তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশই জন্ম নেয় নানা সমস্যার মধ্যে এবং সেসব সমস্যার সমাধানের জন্য এই সব দেশের রাষ্ট্রনায়করা অন্যান্য বহু দেশের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করলেন। প্রধানতঃ এই প্রয়োজনের তাগিদেই শুরু হল অন্য দেশের কর্ণধারদের আমন্ত্রণ জানানো।

উন্নতশীল দেশের কর্ণধাররা অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানান আরো একটি বিশেষ কারণে। বহু উন্নতশীল দেশেই গণতন্ত্র নেই, অনেক সময়ই একনায়কত্বের অধিকারীরা নিজেদের ভাবমূর্তি ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানান।

এ ছাড়াও আরো একটি কারণ থাকে রাষ্ট্রীয় সফরের পিছনে। কোন কোন দেশ ও রাষ্ট্রপ্রধানরা অন্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সার্টিফিকেট বড় পছন্দ করেন। আবার কিছু কিছু রাষ্ট্রনায়করা অন্য দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে নিজের গুরুত্ব বাড়ান।

যাইহোক ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আমাদের রাষ্ট্রনায়করা যেমন রাষ্ট্রীয় সফরে নানা দেশে গিয়েছেন, সেই রকম বহু দেশের রাষ্ট্রনায়করাও আমাদের দেশে এসেছেন রাষ্ট্রীয় সফরে।

এই সব রাজা-রাণী বা প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিস্টারকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান হয় দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে। দু'পক্ষ থেকে দুটি ভাষণে পরস্পরকে মহান বলে উল্লেখ করা, মাননীয় অতিথির স্টেট ড্রাইভ, রাষ্ট্রপতি ভবনে অভ্যর্থনা, অবস্থান, রাজঘাটে শ্রদ্ধার্ঘ, পার্লামেন্টে বক্তৃতা, কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়ামে কিছু অতি মূল্যবান

জিনিষপত্র কেনা, রাষ্ট্রীয় ভোজ, কূটনৈতিক সম্বর্ধনা, নাগরিক সম্বর্ধনা ইত্যাদির খবর সব কাগজেই প্রকাশিত হয় ও দেশবাসী জানতে পারেন কিন্তু এইসব রাষ্ট্রীয় সফরের কিছু নেপথ্য কাহিনী থাকে বা এইসব সফরের সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা কোনদিনই সংবাদপত্রে ছাপা হয় না।

আইসেনহাওয়ার, ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন, চু এন লাই, হো চি মীন, কুইন এলিজাবেথ, প্রিন্স ফিলিপ, নাসের, টিটো, সোয়েকর্ণ, ভরোশিলভ, জনসন, হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, হ্যারল্ড উইলসন, নক্রুমা, উ নূ ও আরো অনেক রাষ্ট্রনায়কদের কখনও দূর থেকে, কখনও খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেক রাষ্ট্রপ্রধানদের সফরে আমিও সঙ্গী হয়েছি সাংবাদিক হিসেবে। এইসব সফরের সময় অনেক কিছু জেনেছি, দেখেছি। তার অনেক কিছুই ভুলে গেছি কিন্তু কিছু ঘটনা এখনও মনে আছে।

মনে পড়ছে কুইন এলিজাবেথের সফরের কথা।

নেহরু কিছু কিছু রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রনায়কদের সফরের ব্যাপারে একটু অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে উঠতেন ও তাঁদের সফর সর্বতোভাবে আনন্দদায়ক ও সাফল্যজনক করার জন্য বিন্দুমাত্র ত্রুটি করতেন না। কুইন এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপের ভারত সফরের আগেও বহু গণ্যমান্য-বরেণ্য রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রনায়করা দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে থেকেছেন এবং নিঃসন্দেহে ভালভাবেই থেকেছেন। তবুও কুইন এলিজাবেথ আসার আগে নেহরু অতি উৎসাহী হয়ে তাঁদের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের ঘরগুলি নতুন করে সাজাবার হুকুম দিলেন। মহীশূর থেকে চন্দন কাঠ এনে নতুন খাট তৈরি হল। প্যানেলিংও হল চন্দন কাঠের। বাথরুম? কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে পৃথিবীর আধুনিকতম ও সর্বাধিক মনোরম ব্যবস্থা করা হল। শুধু তাই নয়। ঘরগুলির পুরানো আসবাবপত্র, পেন্টিং, সিল্কের পর্দা সরিয়ে সবকিছু নতুন করা হল। এক কথায় এলাহি ব্যাপার। জ্যাকুলিন কেনেডি যখন দিল্লী সফরে এসে তিনমূর্তি ভবনে ছিলেন, তখন তাঁর জন্যও

অনুরূপ এলাহি ব্যাপার হয়।

যাইহোক কুইন এলিজাবেথের সঙ্গে সারা দেশ ঘোরার সময় কয়েকটা মজার ঘটনা ঘটে। কুইনের সঙ্গে আমরা সত্তর-পঁচাত্তরজন সাংবাদিক ঘুরছিলাম। তার মধ্যে জনদশেক মাত্র ভারতীয়, বাকি সব সব বিদেশী। তখন দিল্লী-লণ্ডন-দিল্লীর বিমান ভাড়া ছিল তিন হাজারের কিছু বেশি। আর কুইনের সঙ্গে ঘোরার জন্য আমরা এক একজন সাংবাদিক ভারত সরকারকে বিমান ভাড়া বাবদ দিয়েছিলাম প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। এ ছাড়া হোটেল, খাওয়া-দাওয়া ও স্থানীয় যানবাহনের খরচ বাবদ দিই আরো কয়েক হাজার টাকা। সব টাকাই আগাম দিতে হয়েছিল সরকারকে। বলা বাহুল্য সব সাংবাদিকের জন্যই একই বিধিব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা করা হয়েছিল।

অঘটন ঘটল জয়পুরে।

গুরমুখ নীহাল সিং তখন রাজস্থানের রাজ্যপাল। রাজ্যপালের অন্যতম পুত্র নীহাল সিং স্টেটসম্যানের প্রতিনিধি হয়ে আমাদেরই সঙ্গে কুইন্স প্রেস পার্টিতে ছিলেন। হঠাৎ দুপুরবেলায় রামবাগ প্যালেসে বসে আমরা খবর পেলাম রাজভবনে কুইন ও প্রিন্স ফিলিপের জন্য রাজ্যপাল আয়োজিত প্রাইভেট লাঞ্চে রাজপাল তাঁর পুত্রকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খবরটা যখন এলো তখন লাঞ্চ প্রায় শেষ। খবরটা সব সাংবাদিককেই বিচলিত করল এবং বিচলিত হবার দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ কুইন্স প্রেস পার্টির সব সদস্যই সমান অধিকার পাবার অধিকারী এবং কোন কারণেই বিশেষ একজন কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কুইন কোন রাজনৈতিক বক্তৃতাদি দিতেন না বলে অন্য ধরণের বৈচিত্রময় খবরই সাংবাদিকদের পরিবেশন করতে হত। সে ক্ষেত্রে যদি কোন সাংবাদিক একা কুইনের কোন অনুষ্ঠানের কোন ধরণের কথাবার্তা গল্পগুজব তাঁর পত্রিকায় রিপোর্ট করেন, তাহলে অন্য সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের পেশাগত আপত্তি থাকার অবশ্যই কারণ আছে।

যাই হোক হিন্দুস্থান টাইমস্-এর শ্রীমতী প্রমীলা কলহান ও আমি

খবরটির সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য রাজ্যপালের কাছে গেলাম। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে উনি আমাদের বললেন, নীহারকে লাঞ্চে ডেকেছিলুম। তাছাড়া চীফ সেক্রেটারীকে বলেছি, কুইন ও প্রিন্সের সঙ্গে ওকে সাওয়াই মধুপুর ফরেস্ট যাবার ব্যবস্থা করে দিতে।

শুনে আমরা দুজনেই হতবাক। কোন প্রতিবাদ ও তর্ক না করে আমরা ফিরে এসে কুইন্স প্রেস পার্টির ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ মেননকে সবকিছু বলে প্রতিকার দাবী করলাম। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই অফিসারটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রচার দপ্তরের অধিকর্তা ও একজন অতি বিখ্যাত ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূতের জামাতা ছিলেন। সাংবাদিকদের তার সঙ্গে অনেক তর্ক-বিতর্ক হল। সব শেষে উনি বললেন, যদি কেউ ভাল পরিবারের ছেলে হয় বা ভাল পারিবারিক যোগাযোগ থাকে, তাহলে তিনি কী করবেন?

ভদ্রলোকের কথার প্রতিবাদ করলেন অনেকেই। আমি ওকে বললাম, আমি গরীব স্কুলমাস্টারের ছেলে। বাপের সুপারিশ বা শ্বশুরমশায়ের কৃপায় আমি কুইন্স প্রেস পার্টিতে আসিনি বা কোন সুযোগ-সুবিধা চাই না। যাদের নিজেদের উপর আস্থা নেই এবং যারা অকর্মন্য তারাই বাপ-শ্বশুরের নাম ভাঙিয়ে কাজ হাসিল করে।

আমার কথায় ভদ্রলোক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

কুইন্স প্রেস পার্টির সম্মানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়ার পার্টির সময় হয়ে এসেছিল বলে তর্ক-বিতর্ক ঐখানেই থামল। ঐ পার্টিতে গিয়েই সুখাদিয়াকে সবকিছু বলে জানালাম, একজন সাংবাদিককে বিশেষ সুযোগ দেওয়া ও প্রেস পার্টির ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিন্দনীয় মনোভাবের প্রতিবাদে আমরা কেউ কুইন-এর খবর পাঠাব না। আমরা নেহরুকে সব জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাব, তাও ওকে বললাম।

সবকিছু শুনে সুখাদিয়া কি খুশি। উনি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অনেক কথা জানিয়ে আমাকে বললেন, টেলিগ্রাম এখুনি টাইপ করে আমাকে দাও। আমি ওয়ারলেস-এ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমি মহা উৎসাহে টেলিগ্রাম টাইপ করলাম। প্রেরকদের মধ্যে সবার প্রথমে নাম রইল আমার ও প্রমীলাদির। দু'চারজন সাংবাদিক নিজেদের নাম দিতে ভয় পেলেন বলে তাদের নামের উল্লেখ করা হল না।

আমি টেলিগ্রামের কপি সুখাদিয়াকে দিতেই উনি সঙ্গে সঙ্গে চীফ-সেক্রেটারীর হাতে দিয়ে বললেন, এটা এখুনি পুলিশ ওয়ারলেস-এ পাঠিয়ে দিন।

তখন বিকেল সাড়ে চারটে-পাঁচটা হবে।

রিসেপসন-ককটেল-ডিনার ইত্যাদি সেরে আমরা রামবাগ প্যালেসে ফিরলাম অনেক রাত্রে। বোধ হয় বারোটা-সাড়ে বারোটা হবে। আমি আর আমার রুম-মেট ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মিঃ দার জামাকাপড় বদলে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় কে যেন দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করলেন। দরজা খুলতেই দেখি, একজন আর্মি মেসেন্জার। উনি সেলাম করে যে সীল করা খামটি দিলেন, সেটা খুলে দেখি প্রাইম মিনিস্টারের টেলিগ্রাম—সব সাংবাদিক সংবাদ সংগ্রহের সমান সুযোগ পাচ্ছেন না জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। যাই হোক ভারত-বৃটেনের মৈত্রীর স্বার্থে ও রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখানোর জন্য রাণীর সফরের সংবাদ পরিবেশন বন্ধ না রাখলে অত্যন্ত সুখী হব। ভবিষ্যতে আপনাদের কাজে কোন অসুবিধা হবে না এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছি। আমি আর দার প্রায় দৌড়ে গিয়ে প্রমীলাদিকে সবার আগে খবর দিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই একটু হৈ চৈ শুরু হল সাংবাদিকদের মধ্যে।

আধঘণ্টা পরেই আবার টেলিগ্রাম। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বি. ভি. কেশকার লিখেছেন, আপনাদের অসুবিধার খবর জেনে দুঃখিত। যাই হোক অনুগ্রহ করে রাণীর সফরের খবর পরিবেশন করা বন্ধ করবেন না। প্রাইম মিনিস্টার যথোচিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই আবার দরজায় করাঘাত। রাত তখন দুটো-আড়াইটে হবে। দরজা খুলে দেখি, ভারতীয় বিমান বাহিনীর

জনপ্রিয় জনসংযোগ অফিসার উইং কমাণ্ডার মালিক। উনি ঘরে ঢুকেই আমাকে বললেন, তুমি যে কি কেলেঙ্কারী করো!

কেন?

আমাকে কুইন্স প্রেস পার্টির চার্জ নিতে হবে। আর যে স্পেশ্যাল প্লেনে এসেছি, সেই প্লেনেই এখুনি মেননকে ফেরত পাঠাতে হবে।

আমি আনন্দে উইং কমাণ্ডার মালিককে জড়িয়ে ধরে বললাম, আপনার দ্বিধা করার কোন কারণ নেই। এই সুখবরটা আমিই মেননকে জানিয়ে আসছি।

উনি হাসতে হাসতে বললেন, মেননের অনেক উপকার করেছ। তোমাকে ওর আর উপকার করতে হবে না।

গভীর রাত্রে মেনন যখন অধোবদনে রামবাগ প্যালেস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললাম, বন ভয়েজ, হ্যাপি ল্যাণ্ডিং।

দুপুরবেলায় যিনি বাঘের মত হুঙ্কার দিচ্ছিলেন, এই গভীর রাত্রে তিনিই মুষিকের মত রামবাগ প্যালেস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, যে নীহাল সিংকে নিয়ে এতকিছু ঘটল, তিনি কিন্তু নীরব। তাঁর মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। সেদিন থেকে নীহাল সিং'কে শ্রদ্ধা করতে শুরু করি।

জয়পুর রাজভবনের লাঞ্চে রাণীর গল্পগুজবের খবর স্টেটসম্যানে ছাপা হয়নি। দিল্লীতে ফিরে শুনেছিলাম, নেহরু নিজে স্টেটসম্যানের সম্পাদক জনসনকে সব জানিয়ে বলেছিলেন, আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করবেন। আদর্শবান সাংবাদিক হিসেবে জনসন ঐ সংবাদ প্রকাশ করা উচিত মনে করেননি।

রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে সারা ভারত নেপাল সফরের সময় নানা ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং তার মধ্যে দুটি-একটি অভিজ্ঞতার কথা বোধ হয় সারা জীবনেও ভুলব না।

রাণীর সফরের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ছিল না। তিনি ও প্রিন্স ফিলিপ প্রায় টুরিস্টের মতই সারা দেশ ঘুরছিলেন। তার সঙ্গে ব্রিটেন

ও কমনওয়েলথের প্রধান হিসেবে যথোচিত আদর-আপ্যায়ণ ইত্যাদি।

আমাদের কুইন্স প্রেস পার্টির দিন শুরু হতো সাত-সকালে রাণীর লেডি-ইন-ওয়েটিংয়ের ব্রিফিং দিয়ে। উনি সেই সাত সকালেই আমাদের জানিয়ে দিতেন, সেদিন রাণী কখন কার ডিজাইন ও কোথায় তৈরি করা কি ধরনের পোশাক পরবেন। কখন কি গহনা ব্যবহার করবেন।

এর পর রাণী ও প্রিন্স ফিলিপ, লর্ড মার্লবোরা, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গে প্রাতঃকালীন শুভেচ্ছা বিনিময় করেই আমরা ভি-ভি-আই-পি পার্টির সঙ্গে নানা দ্রষ্টব্য দেখতে যেতাম। দুপুরে প্রাইভেট লাঞ্চ। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার ঘোরাঘুরি। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ককটেল এবং ব্যাংকোয়েট বা বিশেষ ভোজসভা। মোটামুটি এই ছিল সারাদিনের প্রোগ্রাম।

রাণী যখন যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে দেখতে আসতেন। পথে-ঘাটে সর্বত্র সব সময় ভীড় হতো। এ তো গেল সাধারণ মানুষের কথা। যারা তথাকথিত গণ্যমান্য বা বিশিষ্ট তাদের মধ্যেও রাণী সম্পর্কে অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখতাম। রাণীর কোন না কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য অসংখ্য গণ্যমান্য মানুষের যে হ্যাংলামী দেখতাম, তা ভাবলেও অবাক লাগে। রাণীকে একটু কাছ থেকে দেখে বা তাঁর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং মেয়েরা যে কি করতেন, তার পুরো বৃত্তান্ত লিখতেও ঘেন্না হয়। তবু কিছু না লিখে পারছি না।

রাণী আমেদাবাদ থেকে করাচী যান। সেখানে থেকে পূর্ব পাকিস্তানে। সেখান থেকে ফিরে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভারত সফর শুরু হয় দুর্গাপুর থেকে। ভারতীয় সাংবাদিকদের পাকিস্তান সরকার ভিসা না দেওয়ায় কুইন্স প্রেস পার্টিকে নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার সুপার কনস্টেলেশন বিমানটি রাণী পৌঁছবার আগের দিনই দিল্লী থেকে পানাগড় পৌঁছে যায়। সেখান থেকে দুর্গাপুর।

সেদিন সন্ধ্যায় ও রাত্রে সাংবাদিকদের কোন কাজ ছিল না বলে জমিয়ে আড্ডা দেবার ব্যবস্থা হল। কিছু সাংবাদিক ও টি. ভি. ক্যামেরাম্যান শুধু আড্ডা দিয়ে এমন একটি সন্ধ্যা ও রাত্রি নষ্ট করতে চাইলেন না; তাই ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দুর্গাপুরের এদিক-ওদিক আর আসানসোলের আশেপাশে ঘুরতে। কুইন্স প্রেস পার্টির এইসব রসিক সাংবাদিকরা বোধ হয় দু'খানা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কিন্তু ফিরে এলেন পাঁচ-সাতখানা গাড়ি করে। সে সব গাড়ি বোঝাই হয়ে এলেন দুর্গাপুর-আসানসোল-বার্ণপুর শিল্পাঞ্চলের বেশ কিছু গণ্য-মান্য অফিসার ও তাদের স্ত্রী ও বোনেরা। কুইন্স প্রেস পার্টির সদস্যদের সঙ্গে সারা রাত্রি মদ খাওয়া আর নাচ-গান করা কি কম সৌভাগ্যের কথা? ওদের খুশি করলে রাণীকেও খুব কাছ থেকে দেখা যাবে। হয়ত রাণীর সঙ্গে ছবিও উঠতে পারে। এসব কী সব অফিসার ও তাদের স্ত্রী-বোনের ভাগ্যে হয়?

আহা! এই পরম সৌভাগ্য লাভের আশায় কিছু অফিসারের স্ত্রী ও বোনেরা হাসতে হাসতে কিভাবে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তবে আরো মজার ঘটনা দেখেছিলাম এক দেশীয় রাজ্যের রাজপ্রাসাদে। রাণী এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপ ভারত সফরে এসে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে ঐ দেশীয় রাজ্যের রাজধানীতে এলেন। রাজপ্রাসাদে তাঁদের সম্বর্ধনার এলাহি ব্যাপার। অনেক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল রিসেপসন। কুইন্স পার্টির সম্মানে ছিল ককটেল। বিরাট প্রাসাদের কয়েকটি ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ থেকেই রাণী ও প্রিন্স ফিলিপ বিদায় নিয়েছেন। বিদায় নিয়েছেন লর্ড মার্লবোরা, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও আরো কয়েকজন। আনন্দ উৎসবে আমরাও মেতে আছি। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে কিন্তু ককটেল চলছে। চলছে নাচগান হৈ-হুল্লোড়। রসিকের দল তখনও মত্ত থাকলেও ঘড়ির কাঁটা মাঝ-রাত্তির ছুঁই ছুঁই করছে দেখেই দু' একজন বন্ধুকে নিয়ে পার্টি ছেড়ে বেরুলাম। হঠাৎ মনে হল, দেখি তো অন্যান্য ঘরে কি হচ্ছে।

একটি ঘর পেরিয়ে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকেই চক্ষু ছানাবড়া। কয়েকজন সুন্দরী যুবতী ও বধূ প্রায় উলঙ্গ হয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি দিচ্ছেন কিন্তু কয়েকজন অতি রসিক ইংরেজ ও ভারতীয় অফিসাররা চূড়ান্ত প্রমত্ত অবস্থায় তাদের জড়িয়ে রয়েছেন। আহা! সে কি দৃশ্য। বুদ্ধ-গান্ধীর দেশের সামান্য মর্ত্ত্যবাসী হয়ে অমরাবতী-অলকানন্দর দৃশ্য দেখে আমি তাজ্জব। একটু এগিয়ে না গিয়ে পারলাম না কিন্তু কাছে যেতেই চমকে উঠলাম। সবাইকে চিনতে পারলাম না কিন্তু দুজন নায়িকাকে দেখেই চিনলাম এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এই দুজন শুধু বাঙালী মেয়েই নন, কলকাতার অতি বিখ্যাত পরিবারের কন্যা ও বধূ! খ্যাতি, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি—সব কিছু এই পরিবারের আছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের নানা দেশীয় রাজ্যের রাজপরিবারের সঙ্গে এদের গভীর হৃদতা আছে। এরা অবশ্যই সেই সূত্র ধরে রাণীর সফর উপলক্ষে কলকাতা থেকে ওখানে গিয়েছিলেন।

যাই হোক পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়েই দেখি, ঐ দু'জন বাঙালী নায়িকা একটা টেবিলে বসে আছেন। চেহারা দেখেই বুঝলাম, রাত্রে ওদের উপর দিয়ে সাইক্লোন বয়ে গেছে। ওদের কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে হাসি মুখে বললাম, গুড মর্ণিং।

ওরা দুজনেই হেসে বললেন, মর্ণিং!

এবার সোজাসুজি বাংলায় বললাম, কাল রাত্রের পার্টিটা খুব জমেছিল, তাই না?

ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি কুইন্স পার্টিতে আমার মত একটি বঙ্গজ সন্তান থাকতে পারে। তাই আমার কথায় ওরা দু'জনে চমকে উঠে কোন মতে বললেন, হ্যাঁ।

আবার আমি বললাম, কাল রাত্রে আপনাদের দু'জনকে দেখে খুব ভাল লাগল। কুইনের সঙ্গে এত ঘুরছি কিন্তু আপনাদের মত এমন প্রাণবন্ত ও স্ফূর্তিবাজ মেয়ে দেখিনি। রিয়েলি আই ওয়াজ ভেরি ভেরি হ্যাপি টু সী ইউ ইন সাচ এ মুড লাস্ট নাইট।

আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে অন্য টেবিলের দিকে

এগুলাম। ওরা নির্বাক হয়ে বসে রইলেন।

এই সফরের সময় আরো অনেক মজার ঘটনা ঘটেছিল।

কুইন্স প্রেস পার্টির আমরা সবাই এয়ার ইণ্ডিয়ার একটা সুপার কনস্টেলেশনে ঘুরতাম। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একজন আঞ্চলিক অধিকর্তা মিঃ শ্রীবাস্তব ছিলেন কুইন্স পার্টির এয়ার মুভমেণ্ট অফিসার। উনিও আমাদের প্লেনেই সফর করতেন। রাণী ঘুরতেন তাঁর রয়্যাল ব্রিটানিকাতে। আমাদের প্রেস পার্টির প্লেনে একজন মাত্র এয়ার হোস্টেস ছিলেন। আর কয়েকজন স্টুয়ার্ট। এয়ার হোস্টেস মেয়েটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিল। রঙ একটু চাপা হলেও মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী ছিল এবং তাকে নিয়ে কুইন্স প্রেস পার্টিতে বেশ সরস আলোচনা হতো।

মিঃ শ্রীবাস্তব বেশ বয়স্ক ছিলেন এবং দেখতেও বিশেষ ভাল ছিলেন না। কালো মোটা ও মুখে বসন্তের দাগওয়ালা এই প্রবীণ অফিসারটি সুযোগ পেলেই এয়ার হোস্টেস মেয়েটির গায়ে হাত দিয়ে কথাবার্তা বলা বা আইল দিয়ে যাতায়াতের সময় একটু ধাক্কা লাগাতে বড় ভালবাসতেন। আমি বেশ বুঝতে পারতাম মেয়েটি ওর এই ব্যবহার একটুও পছন্দ করেন না কিন্তু মুখে কিছু বলার সাহস হয় না। আর লক্ষ্য করতাম একজন স্টুয়ার্টের কাছে ও যেন একটু বেশী সহজ ও ঘনিষ্ঠ। অনুমান করলাম, ওদের মধ্যে ভালবাসা আছে।

আমি একদিন মিঃ শ্রীবাস্তবকে হাসতে হাসতে বললাম, আমার মত ইয়াং হ্যাণ্ডসাম লোক থাকতে আপনি কেন মেয়েটির সঙ্গে খাতির করার চেষ্টা করেন?

এই ঘটনার পর মিঃ শ্রীবাস্তব সত্যি একটু সংযত হলেন এবং মেয়েটি ও স্টুয়ার্ট আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

কলকাতা থেকে আমাদের প্লেন মাদ্রাজ রওনা হওয়ার পর পরই প্রেস লিয়াজো অফিসার আমাদের হাতে মাদ্রাজের প্রোগ্রাম, নানা অনুষ্ঠানের নেমন্তন্ন কার্ড, থাকা ও গাড়ির বিধিব্যবস্থার কাগজপত্র হাতে দিলেন। মাদ্রাজে রাণীর সম্মানে রাজভবনে যে সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে বিখ্যাত অভিনেত্রী ও নৃত্য শিল্পী পদ্মিনীর নাচ ছিল। আমাদের প্রেস প্লেনের কমাণ্ডার অব দ্য এয়ারক্রাফটকে এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ-লিপি দেওয়া হলেও বিমানের আর কোন কর্মীকে আমন্ত্রণ করা হয় না। প্লেনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করার সময় এয়ার হোস্টেস আর ঐ স্টুয়ার্টের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, ওরা পদ্মিনীর নাচ দেখতে খুবই ইচ্ছুক কিন্তু দেখা হবে না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমার কার্ডটি এনে স্টুয়ার্টকে দিয়ে বললাম, আপনি এই কার্ড নিয়ে চলে যাবেন। আর মেয়েটিকে বললাম, আমাদের রওনা হবার আগে আপনি একটা সুন্দর শাড়ি পরে হোটেলে আমার কাছে আসবেন এবং আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

প্রেস পার্টির কোন সদস্যরই কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য কার্ড লাগত না। কারণ আমরা সব সময় ভি-আই-পি কনভয়ের গাড়িতেই যেতাম। তাই সেদিন সন্ধ্যায় এয়ার হোস্টেস মেয়েটিকে নিয়ে আমি নির্বিবাদে রাজভবনে পৌঁছলাম। অনুষ্ঠান হলে প্রবেশের সময় আমি আলতো করে মেয়েটির হাত ধরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশদ্বারের অফিসাররা ভাবলেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী।

হলে প্রবেশ করেই আমি মেয়েটিকে বললাম, যান, আপনার বন্ধুর কাছে গিয়ে বসুন।

অশোককুমারের দৌলতে পদ্মিনীর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। তাই অনুষ্ঠান শেষে আমি ওদের সঙ্গে পদ্মিনীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, জানেন, আমি আর এই বিমান সেবিকাটি কয়েক মিনিটের জন্য স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করেছি।

আমার কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

এমন সময় হঠাৎ আমাদের পুরনো বন্ধু ও ফিল্ম ডিভিশনের ক্যামেরাম্যান রাও মঞ্চে এসে আমাকে বলল, পদ্মিনী যদি আবার নাচেন তাহলে আমি ভাল করে তুলে নিতাম।

রাও' এর অনুরোধ পদ্মিনীকে জানাতেই উনি আবার পর্দার আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ নাচলেন। এয়ার হোস্টেস ও স্টুয়ার্ট মহা খুশি। পদ্মিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসতেই রাও হাসতে হাসতে বলল, জানিস, আমার ক্যামেরায় ফিল্মই ছিল না।

রাও আবার হাসতে হাসতে বলল, অত কাছ থেকে অমন একজন অভিনেত্রী ও ডান্সারের নাচ দেখার লোভ কী ছাড়া যায়?

রাণী এলিজাবেথের সফরে আরো কিছু মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মনে পড়ছে আমেদাবাদের কথা।

আনুষ্ঠানিক নৈশ ভোজের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে রাজভবনের বিস্তীর্ণ লনে। সবরমতীর তীরে আজকের এই রাজভবনেই এককালে প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করতেন এবং সে সময় রবীন্দ্রনাথও এখানে এসেছেন। যাই হোক অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানের পর গুজরাটীদের বিবাহ উৎসবও রাণী ও প্রিন্স ফিলিপকে দেখান হয়। অনুষ্ঠান শেষে রাণী ও প্রিন্স ফিলিপ মঞ্চে উঠে সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হন ও তাদের অভিনন্দন জানান। হঠাৎ ফিলিপ নকল বিবাহ অনুষ্ঠানের বরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সত্যিকার স্বামী-স্ত্রী?

সলজ্জ হাসি হেসে ছেলেটি বলল, না।

প্রিন্স এবার গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বিবাহিত?

না।

এবার বিবাহের পাত্রীকে প্রিন্স জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দেশে তো অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়। তা তোমারও কি বিয়ে হয়ে গেছে?

মেয়েটি একটু হেসে বলল, না।

অনুষ্ঠানের গণ্যমান্য দর্শকদের সামনেই প্রিন্স ওদের দুজনের লেখাপড়া ও পরিবারের খোঁজখবর নিলেন। জানা গেল, দুটি ছেলেমেয়েই অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ও দু'জনেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। এবার প্রিন্স ওদের দুজনকে একটু কাছে নিয়ে বললেন,

তোমাদের দুজনকেই দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। এবার তোমরা বল, দুজনে দুজনকে পছন্দ হয় কিনা।

প্রিন্সের প্রশ্ন শুনে বিশিষ্ট অতিথিরা হেসে ওঠেন আর লজ্জায় ছেলেমেয়েটি মুখ নীচু করে হাসে।

ওদের পাশে দাঁড়িয়ে রাণী, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, লর্ড মার্লবোরো, গুজরাতের গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রী হাসেন।

প্রিন্স চুপ করে থাকেন না। বলেন, আমি জানি, এ দেশের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ সময়ই নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করতে পারে না। তাই বলছি, তোমরা খোলাখুলি বল বিয়ে করবে কিনা। প্রিন্স একটু হেসে বললেন, তোমরা বিয়ে করতে চাইলেও হয়তো বাবা-মার আপত্তির জন্য বিয়ে করতে পারবে না। তাইতো তোমরা যদি তোমাদের মনের ইচ্ছা আমাকে জানাও, তাহলে এখনই তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা আমি পাকাপাকি করে দিতে পারি।

প্রিন্সের কথায় আমরা সবাই হো হো করে হাসি।

মঞ্চ থেকে নেমে আসার আগে প্রিন্স বললেন, আমার মনে হয়, তোমাদের বিয়েতে তোমাদের অভিভাবকরা আপত্তি করবেন না। যাই হোক আমি তোমাদের দুজনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলাম।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি একটু দীর্ঘই ছিল। তারপর এইসব ঘটনার জন্য অনেক রাত হয়ে যায়। অনুষ্ঠান শেষে আমরা রাণী ও প্রিন্সের পিছন পিছন হাঁটছি। আমার বিশেষ বন্ধু ও কুইন্স প্রেস পার্টির অন্যতম সদস্য গার্ডিয়ান পত্রিকার মাইকেল ওয়াল হঠাৎ ঘড়ি দেখেই আমাকে বলল, নিমাই, আর দু'ঘণ্টা পরেই তো লগেজ হ্যাণ্ডওভার করতে হবে। আজ আর ঘুম হবে না।

এই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভি-ভি-আই-পি'র সঙ্গে সফর করা নিশ্চয়ই বিশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার। অনেক বিচিত্র ও অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হয় এইসব সফরে কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক কষ্টও সহ্য করতে হয়।

রাণী এলিজাবেথের ভারত সফরের সময় প্রেস পার্টির জন্য এয়ার

ইণ্ডিয়ার একটা আলাদা বিমান ছিল। রাণীর রয়্যাল ব্রিটানিকা বিমান ছাড়ার আধঘণ্টা আগেই কুইন্স প্রেস পার্টির বিমান রওনা হত এবং নতুন শহরে-নগরে রাণীর স্বাগত অভ্যর্থনা আমরা কভার করতাম। রাণীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিমানবন্দরে যে গণ্যমান্যবরেণ্যরা উপস্থিত থাকতেন, তাঁরাও আমাদের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হতেন। ভি-ভি-আই-পি'র সহযাত্রী বলে তখন আমরাও ভি-আই-পি। আমাদের থাকা-খাওয়া গাড়ি-ঘোড়া ঘোরা-ফেরার তদারক করতেন অতি উচ্চপদস্থ অফিসারের দল। শুধু কি তাই? আমাদের মালপত্র দেখাশুনার জন্য ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ও একদল সাধারণ অফিসার নিযুক্ত থাকতেন। তবে আমাদের বিমান রওনা হবার চার ঘণ্টা আগে আমাদের মালপত্র ওদের হাতে দিয়ে দিতে হতো। তারপর সব মালপত্র নিয়ে একখানি বিমান রাণীর বিমান ছাড়ার তিন ঘণ্টা আগেই পরবর্তী গন্তব্যস্থলে রওনা হতো এবং সেখানে আমাদের পৌঁছবার বহু আগেই আমাদের মালপত্র যার যার নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে যেত। অর্থাৎ রাণী কোন শহর থেকে সকাল আটটার সময় রওনা হলে আমাদের মালপত্র জমা দিতে হতো রাত সাড়ে তিনটেয় এবং সেজন্য এর ঘণ্টাখানেক আগেই আমাদের বাথরুমে ঢুকতে হতো ও সাড়ে তিনটের মধ্যেই সাজগোজ সারতে হতো। রাত একটা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ককটেল পার্টিতে থাকার পর রাত সাড়ে তিনটের মধ্যে সারাদিনের মত তৈরী হয়ে নেওয়া নিশ্চয়ই খুব সুখকর নয়। তাই আমেদাবাদ রাজভবন থেকে বেরুবার সময় ওয়াল আমাকে বলল, আজ আর ঘুম হবে না।

পরের দিন সকালেই রাণীর করাচী যাত্রা। তাছাড়া রাণীর সফরসূচীর বিন্দুমাত্র অদলবদল তো হবে না। তাই আমি মাইকেল ওয়াল্‌কে বললাম, এখন ঘুমুলে নিশ্চয়ই ঠিক সময় তৈরী হওয়া যাবে না। গল্প করেই আমাদের সময় কাটাতে হবে।

আমাদের ঠিক সামনেই হাঁটছিলেন রাণী, প্রিন্স ফিলিপ, লর্ড মার্লবোরা ও ব্রিটেনে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রীমতী

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। রাণী মাইকেল ও আমার কথা শুনতে পেয়েই লর্ড মার্লবোরাকে বললেন, লর্ড, প্লীজ চেক আপ হোয়াট দ্য প্রেস-বয়েজ বিহাইণ্ড মী আর সেইং।

সঙ্গে সঙ্গে লর্ড মার্লবোরা একটু পিছিয়ে এসেই মাইকেলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বলাবলি করছিলে তা কুইন জানতে চাইছেন।

কুইনের নাম শুনেই রাজভক্ত মাইকেলের চক্ষু ছানাবড়া। লজ্জায় সে প্রায় মারা যায় আর কি। ওর অসহায় অবস্থা দেখে আমিই লর্ড মার্লবোরাকে বললাম, ঘণ্টা আড়াই পরেই প্রেস পার্টির লগেজ হ্যাণ্ডওভার করতে হবে। তাই বলছিলাম, আজ আর ঘুম হবে না।

লর্ড মার্লবোরা সঙ্গে সঙ্গে রাণীকে সে কথা জানালেন এবং রাণী সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী পণ্ডিতকে বললেন, আমরা আপনার দেশে কাল সকালে যদি একঘণ্টা বেশি থাকি তাহলে কি আপনাদের খুব অসুবিধে হবে?

শ্রীমতী পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা।

এবার রাণী লর্ড মার্লবোরা ও ভারতস্থ ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে বললেন, আপনারা এখুনি প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে জানিয়ে দিন, আমি একঘণ্টা দেরিতে পাকিস্তান পৌঁছব। দ্য বয়েজ মাস্ট হ্যাভ সাম শ্লিপ। একটু না ঘুমুলে ওরা সারাদিন কাজ করবে কি করে?

রাণীর এই সিদ্ধান্তের জন্য সাংবাদিকরা সে রাত্রে সত্যি একটু ঘুমিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে ঠিক বিপরীত একটি অভিজ্ঞতার কথা।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে নির্বাচনী সফরে গেছি মধ্যপ্রদেশ। সারা দিনে উনি দশ-বারোটা নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিচ্ছেন এবং সেইসঙ্গে শত শত মাইল ঘুরতে হচ্ছে। কখনও কখনও হঠাৎ পথের ধারের জনতার অনুরোধেও প্রধানমন্ত্রী দু'পাঁচ মিনিট বক্তৃতা দেন। কখনও আবার হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে আশেপাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। সুযোগ পেলে ওদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু-আধটু রসিকতাও করেন।

সাধারণ মানুষ নেহরুকে চুম্বকের মত টানত এবং তাই আমরা যে ক'জন সাংবাদিক ওঁর সঙ্গে সফর করছিলাম, তাদের প্রতি মুহূর্ত অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হতো। হাজার হোক নেহরু। ওঁর সবকিছুই তো নিউজ। নেহরুর এই ধরণের সফর কভার করার একটা সমস্যা ছিল। উনি এক এক সময় ভাবাবেগে এমন এক একটি মন্তব্য করতেন, যা ওঁরই আর একটি মন্তব্যের ঠিক বিপরীত। একই দিনে অনেক সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিলে এই ধরণের সমস্যা দেখা দিত। নেহরুর প্রতিটি মন্তব্যে দেশের মধ্যে ও বিদেশে নানা রকম প্রতিক্রিয়া হতো বলে এই ধরণের বিপরীতধর্মী মন্তব্য রিপোর্ট করা সম্পর্কে আমাদের যেমন সমস্যা দেখা দিত, সেই রকম সতর্কও থাকতে হতো। তবে অধিকাংশ সময়ই নেহরু নিজে এই সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

ঐ মধ্যপ্রদেশ সফরের সময় আমরা (নেহরুর সফর সঙ্গী সাংবাদিকরা) প্রত্যেকটি সভার আলাদা আলাদা রিপোর্ট পাঠাতাম না। সারা দিনের সব সভার মূল ও প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলিকে নিয়ে একটা বড় রিপোর্ট লিখতাম এবং সে খবর পাঠাবার আগে নেহরু নিজে একবার দেখে দিতেন। এইভাবেই দুটো দিন কাটল।

তৃতীয় দিনেও ঐ একই কর্মসূচী। সকাল আটটা-সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা। তারপর পাঁচ-সাতটা ছোট-বড় মিটিং-এর পর চার-পাঁচশ' মাইল দূরে কোন শহরে বা গ্রামের সরকারী আস্তানায় মধ্যাহ্ন ভোজন। আধঘণ্টার বিশ্রামের পরই আবার যাত্রারম্ভ। রাত সাড়ে আটটা-ন'টায় রাত্রি যাপনের জন্য যেখানে পৌঁছলাম তা সত্যিই হট্ট মন্দির। অত্যন্ত ছোট দু'খানি পাকা ঘর। ঐখানে প্রধানমন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তাঁর সহযাত্রী সরকারী অফিসার ও সাংবাদিকদের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা হয়েছে। যাইহোক আমরা পৌঁছবার পরই মিলেমিশে রিপোর্ট তৈরী করলাম এবং তারপর নেহরুকে দেখাবার জন্য ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর উনি ঘুমুচ্ছেন বলে আমরা ওঁর ঘুম ভাঙান অনুচিত মনে করে আবার সবাই মিলে রিপোর্টটিকে ভালভাবে

দেখলাম। তারপর আমরা দু'তিনজনে একটা জীপ নিয়ে মাইলখানেক দূরের টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম। টেলিগ্রাফ অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আমাদের প্রেস টেলিগ্রামের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন এবং আমরা তার হাতে মেসেজ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার কাজ শুরু করলেন। কয়েক মিনিট পরেই আমরা আরেকটা জীপগাড়ীর আওয়াজ পেলাম কিন্তু ভাবলাম বোধ হয় কোন সরকারী অফিসার টেলিগ্রাম পাঠাতে এসেছেন এবং আমরা কেউই সেদিকে খেয়াল করিনি। হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে টেলিগ্রাফ অফিসের ভিতরে ঢুকে টেলিগ্রাফিস্টকে বকুনি দিতেই আমরা সবাই ভূত দেখার মত চমকে উঠি। উনি টেলিগ্রাফিস্টকে বললেন, এরা সবাই আমার সম্পর্কে আজেবাজে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে, তা জানেন ?

নেহরুর কথায় ভদ্রলোকের হৃদপিণ্ডের স্পন্দনও বোধ হয় থেমে যায়।

এবার প্রধানমন্ত্রী আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা ভালভাবে দেখেশুনে রিপোর্ট পাঠাচ্ছ তো ?

হ্যাঁ।

ব্যস! তাহলে ঠিক আছে। হাসতে হাসতে নেহরু টেলিগ্রাফিস্টকে বললেন, তাড়াতাড়ি খবর পাঠান। তা না হলে কাল সকালেই কাগজে বেরুবে কি করে ?

টেলিগ্রাফিস্ট ভদ্রলোক অভাবনীয়ভাবে ভারতভাগ্য-বিধাতার সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দে খুশিতে নিউজ পাঠাতে শুরু করলেন এবং আমরা সবাই ক্যাম্পে ফিরে এলাম। নেহরু তাঁর নিজের ঘরে গেলেন। আমরাও যে যার তাঁবুতে এসে জামাকাপড় বদলে ও মশারী ঠিকঠাক করেই শুয়ে পড়লাম। আমরাও অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম। তাই শোবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত তখন গভীর।

অঘোরে ঘুমুচ্ছি কিন্তু মশার কামড়ে পাগল হয়ে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ঘুম ভেঙ্গে যেতেই অবাক—মশারী উধাও। অন্য সাংবাদিক বন্ধুদেরও মশারী উধাও। আশ্চর্য কাণ্ড! চারদিকে সশস্ত্র পুলিশের

পাহারা এবং এই অবস্থায় আমাদের মশারী চুরি করল কে? তাঁবুর বাইরে পাহারারত সশস্ত্র পুলিশকে প্রশ্ন করে কিছুই জানা গেল না। অনেকক্ষণ অনেককে জিজ্ঞাসা করার পর একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার চাপা হাসি হেসে নেহরুর ঘরের দিকে ইসারা করলেন।

নেহরুর ঘরে গিয়ে দেখি, উনি বই পড়ছেন এবং আমাদের দেখেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, কি? ঘুম হলো না?

আমরা ওঁর ঘরের মধ্যে স্তূপাকৃত মশারী দেখে হাসতেই উনি বললেন, তোমাদের জন্য আমি বিছানা ছেড়ে টেলিগ্রাফ অফিস যাই। তোমরা যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছ, তখন আমিই বা কেন তোমাদের ঘুমুতে দেব?

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি।

সেদিন বাকি রাতটুকু নেহরু আর আমরা ক'জনে গল্প করেই কাটিয়ে দিই।

পরদিন ভোরবেলায় নেহরু হাসতে হাসতে আমাদের বললেন, পুলিশে এফ-আই-আর করনি তো? এফ-আই-আর করলে ওরা আমাকে চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করবে।

ঐ একরাত্রির আনন্দের জন্য সমস্ত নির্বাচনী সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল।

'ভি-আই-পি' কথাটি আমাদের দেশে বড়ই অপব্যবহার করা হয় এবং দিন দিন এই অপব্যবহার বাড়ছে। প্রথম যখন রিপোর্টার হলাম, তখন বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ভি-আই-পি ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীরাও ভি আই-পি ছিলেন ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সরকারী অনুষ্ঠান ও নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে সীমিত ছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কোন রাজ্যে সফরে গেলে তাঁরা রাজভবনে থাকতে পারতেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো ঠিকই কিন্তু আজকের মত তাঁরা পুলিশের গাড়ির শোভাযাত্রার শোভা বর্ধন করতেন না। দিল্লীতেও তাঁদের সঙ্গে সব সময় একজন সাধারণ

পোষাকের নিরাপত্তা কর্মী থাকলেও বাড়ির দরজায় সঙ্গীনধারী মোতায়েন ছিল না। সঙ্গীনধারী মোতায়েন থাকত শুধু রাষ্ট্রপতি ভবনে ও প্রধানমন্ত্রী নেহরুর তিনমূর্তি ভবনে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বাংলোয় প্রথম সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা হয় চীন-ভারত যুদ্ধের সময়। যুদ্ধ শেষ হবার পর সশস্ত্র প্রহরীরা ব্যারাকে ফিরে যায়।

ভি-আই-পি কনভয়ের অগ্রগামী পুলিশের গাড়িতে সাইরেন ব্যবহার প্রথম চালু হয় বোম্বেতে এবং তার জন্য মহারাষ্ট্র সরকারকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নিতে হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরের চাইতে বোম্বেতেই মোটর গাড়ির সংখ্যা সর্বাধিক ও গতিও অত্যন্ত বেশী। তাই দ্রুতগামী যানবাহনকে অনেক দূর থেকে সতর্ক করার জন্যই এই সাইরেন ব্যবহার চালু হয়। শুধু তাই নয়। বিশেষ বিশেষ ভি-আই-পি'র বিশেষ বিশেষ স্থানের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগদানের সময়ই এই সাইরেন ব্যবহার চালু ছিল এবং এখনও এই ব্যবস্থা সত্যিকার ভি-আই-পি'দের জন্যই নির্দিষ্ট আছে। কিছু কিছু রাজ্যে পশুপালন ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রীর গ্রাম গঞ্জ সফরের সময়েও এই সাইরেন ব্যবহার হচ্ছে।

ভি-আই-পি গাড়ির সামনে লাল আলো? পৃথিবীর বহু দেশেই অ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ির সামনে লাল-নীল ফ্লিকারিং আলো থাকে কিন্তু ভি-আই-পি গাড়ির সামনে নৈব নৈব চ। এখনও দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে লাল আলো নেই। যাই হোক এই সব ব্যবস্থাই নাকি নিরাপত্তার জন্য। কমিউনিষ্ট ও একনায়কতন্ত্রের দেশগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্যি অভাবনীয় কঠোর। তবে কমিউনিষ্ট দেশে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমনই যে তা সাধারণের দৃষ্টি-গোচরে পড়ে না। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত নগ্ন ও প্রকট শুধু একনায়কতন্ত্রের দেশগুলিতে। এই ধরণের অমার্জিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে এই সব ডিক্টেটররা দেশের মানুষকে ভয় করেন। সব গণতান্ত্রিক দেশেও ভি-আই-পি'দের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা কঠোরতম কিন্তু ভারতবর্ষের

মত এমন অমার্জিত নয়। লরী ও জীপ ভর্তি সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে মন্ত্রীদের সফর করা কোন সভ্য দেশে দেখা যাবে না।

সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণ মানুষের সঙ্গে ট্রামে চড়ে অফিস যান। সুইডেন প্রভৃতি দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র প্রহরী তো দূরের কথা, কোন ব্যক্তিগত কর্মচারীও থাকেন না। কোন দর্শনার্থী গেলে প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাকে অভ্যর্থনা করবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও অফিস দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে কোন আর্দালী-চাপরাশী-বেয়ারা বা কলিং বেলের ব্যবস্থা নেই। কোন কর্মচারীকে দরকার হলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজে তার ঘরে গিয়ে ডেকে আনেন—জন, উড ইউ প্লীজ ড্রপ ইন? আর গণতান্ত্রিক প্রগতিবাদী পশ্চিমবঙ্গের সাব-রেজিষ্ট্রাররাও ঘণ্টা বাজিয়ে একজন বেয়ারাকে তলব করেন ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় টেলিফোন ধরে একজন সিপাই! মন্ত্রী-সেক্রেটারিরা তো চন্দ্র-সূর্যের মতই বহুদূরের বাসিন্দা। গরীব মানুষের টাকায় এই বিলাসিতা সত্যি বিস্ময়কর। যাই হোক এ দেশে খুদে ভি-আই-পি'দেরও ঢং দেখে হাসি পায়।

জীবনে কত অসংখ্য ভি-আই-পি দেখলাম, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নানা রকম কায়দা-কানুন করে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকাই, আমাদের বাচাল বক্তৃতা-শ্লোগান সর্বস্ব ভি-আই-পি'দের স্বপ্ন ও সাধনা। মনে পড়ে মার্শাল টিটোর কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চল্লিশ ডিভিশন নাৎসী সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন মার্শাল টিটো। যুদ্ধবিগ্রহ শত্রু-মিত্র অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তাঁর মত অভিজ্ঞ রাষ্ট্রপ্রধান বিরল। ইতিহাসের সেই অমর নায়ক এসেছেন ভারত সফরে এবং ঘুরতে ঘুরতে কলকাতা।

রাজভবন থেকে মার্শাল টিটোর বেরুবার তখনও দেরি আছে। তা হোক। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ-কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্ণধাররা অনেক আগেই রাজভবন পৌঁছে গেছেন

এবং কনভয়ের গাড়ি ঠিক মত দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার ও নিরাপত্তা কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে মার্শাল টিটো সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে ওদের সামনে হাজির। একা মার্শাল টিটোকে সামনে দেখে গোয়েন্দা দপ্তরের বড় কর্তাদের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। তাছাড়া প্রেসিডেন্টের রওনা হবার কি সময় হয়ে গেল ? ওরা সবাই ঘড়ি দেখেন। মার্শাল টিটো হেসে বললেল, না না, আমার রওনা হবার সময় হয়নি। ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। তাই ঘরের মধ্যে বসে না থেকে বেরিয়ে এলাম।

গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তারা এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আপনারা কি করছেন ?

মার্শাল টিটোর প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এলেন গোয়েন্দা দপ্তরের একজন প্রবীণ অফিসার। তিনি সবিনয়ে বললেন, ইওর একসেলেনসী, আমরা আপনার নিরাপত্তা কর্মী। তাই সবাইকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহানায়ক মৃদু হেসে বললেন, এত ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও কি আপনারা গ্যারান্টি দিতে পারেন আমার কোন বিপদ হবে না ?

কি জবাব দেবেন ? আমতা আমতা করতে লাগলেন গোয়েন্দা দপ্তরের বড় কর্তারা।

এবার মার্শাল টিটো বললেন, কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থাই সব বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না। একজনের নিরাপত্তার জন্য শত সহস্র নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত থাকলেও একজন সাধারণ মানুষ ইচ্ছা করলেই অঘটন ঘটাতে পারেন।

গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার সাহস করে বললেন, ইওর একসেলেনসী, আমরা তো চেষ্টা করব যাতে অঘটন না ঘটে।

মার্শাল টিটো হেসে বললেন, তা ঠিক কিন্তু অতিরিক্ত কিছু করলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়।

এই নিরাপত্তার ব্যাপারে একটি মজার ঘটনা না বলে পারছি না।

তৈল সমৃদ্ধ একটি দেশেব রাষ্ট্রপ্রধান এসেছেন দিল্লীতে। আছেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। নৈশ ভোজনের বেশ কিছু পরে ঐ দেশের রাষ্ট্রদূত একজন সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের ঘরে ঢুকলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রাষ্ট্রদূত একা বেরিয়ে এলেন এবং ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসারকে জানালেন, মেয়েটি সারারাত ঐ ঘরেই থাকবে। ভাল কথা। রাষ্ট্রদূত চলে যাবার একটু পরেই খবর পাওয়া গেল, ঐ রাষ্ট্রপ্রধানের সহযাত্রী দু'জন নিরাপত্তা কর্মী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে ঐ ঘরে ঢুকেছে। খবর শুনেই ভারতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন! যদি ওরা দু'জন রাষ্ট্রপ্রধানের কোন ক্ষতি করে? অথচ ওঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব তো ভারতের। কি করা যায়? ঘরের দরজা খুলতে বলা অসম্ভব। হাজার হোক রাষ্ট্রপ্রধান। তার উপর উনি এখন চিত্তবিনোদনে ব্যস্ত। এ সময় কি মহামান্য অতিথিকে বিরক্ত করা যায়? সারারাত মহা উৎকণ্ঠায় কাটালেন আমাদের নিরাপত্তা-গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা। তারপর ভোরবেলায় ঐ সশস্ত্র প্রহরী দুটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ভারতীয় অফিসাররা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা ঘরে ঢুকেছিলেন কেন?

আমরা পাহারা দিচ্ছিলাম।

পাহারা?

হ্যাঁ। রাষ্ট্রপ্রধানের খাটের তলায় বসে সারারাত পাহারা দিয়েছি।

সেকি?

হ্যাঁ! ঐ মেয়েটি যদি রাষ্ট্রপ্রধানের কোন ক্ষতি করে? তাই ওঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা রোজ রাত্রেই এই রকম পাহারা দিই।

ওদের কথা শুনে ভারতীয় অফিসাররা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কিছু কিছু স্বদেশী-বিদেশী ভি-আই-পি নিরাপত্তার নামে অতিরিক্ত কিছু তামাসা সত্যি পছন্দ করেন। অনেকে ঠিক বিপরীত। যেমন মার্শাল টিটো। হো-চি-মিন আর একজন বিশ্ববরেণ্য নেতা

যাকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখেছি। শুধু তাই নয়। দুটি এনগেজমেন্টের মাঝের সময়টুকু তিনি নিজের ঘরে শুয়ে-বসে কাটাতেন না। হাতে সময় পেলেই উনি লনে বসে সাংবাদিক ও অফিসারদের সঙ্গে গল্প করতেন। হো-চি-মিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্য ভি-ভি-আই-পি'দের মত উনি বার বার পোষাক বদল করতেন না। একটা জামা-প্যাণ্টেই সারা দিন কাটাতেন! দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে চার্চিল, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ ও দ্যগলকে আমি দেখিনি। আর অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়ককেই আমি দেখেছি কিন্তু তাঁদের মধ্যে হো-চি-মিনের চাইতে সহজ সরল অনাড়ম্বর কাউকে দেখিনি। নতুন দেশ ও নতুন জাতির জন্মদাতা ও বিশ্ববরেণ্য নেতা হয়েও উনি ভুলে যাননি, এককালে লণ্ডনের কার্লটন হোটেলে বাসন মাজতেন।

তবে অন্যান্য সব ভি-ভি-আই-পি'দের চাইতে ক্রুশ্চভের সফর কভার করার সময় সাংবাদিকদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হতো। উনি যে কখন কি করবেন, তা কেউ জানতেন না। তাছাড়া ওঁর সাধারণ জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধি এত প্রখর ছিল, তা সত্যি ভাবা যায় না। এর সঙ্গে ছিল ওঁর অসম্ভব স্মৃতিশক্তি ও রসজ্ঞান। ভারত সফরের সময় নানা বিষয়ে নানা জায়গায় ওঁর মন্তব্য কিংবদন্তি হয়ে আছে। তাই সেসব কথার পুনরাবৃত্তি না করে অন্য দু'একটি ঘটনা বলব।

দিল্লীতে ক্রুশ্চভের সাংবাদিক সম্মেলন। প্রায় ছ'সাত শ' দেশী বিদেশী সাংবাদিক জড় হয়েছেন। হবে না কেন? ওঁর প্রত্যেকটি কথাই তো তাৎপর্যপূর্ণ! তাছাড়া ওঁর মত উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন ও রসিক নেতার সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আনন্দই আলাদা। ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছেন এবং ক্রুশ্চভ তার জবাব দিচ্ছেন। এইভাবে সময় চলে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার খেয়াল হয়, আর তো বিশেষ সময় নেই কিন্তু সে সময় উনি একদল আমেরিকান সাংবাদিকদের একটির পর একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। মার্কিন সাংবাদিকরা যেমন কড়া কড়া প্রশ্ন

করছেন, উনি তাদের আরো কড়া জবাব দিচ্ছেন হাসতে হাসতে। শুনতে সবাই মশগুল।

ক্রুশ্চভের আশেপাশের কূটনীতিবিদ ও অফিসাররা বার বার ঘড়ি দেখতেই আমার খেয়াল হল, আর এক মিনিটও নেই। আমি আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে চিৎকার করে উঠলাম, মিষ্টার চেয়ারম্যান, স্যার! আপনি কি শুধু আমেরিকান সাংবাদিকদেরই প্রশ্নের জবাব দেবেন?

উনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, আমি যে এতক্ষণ আমেরিকান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম, তা বুঝতেই পারিনি। এবার আমেরিকান সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে মুচকী হেসে বললেন, আমি আপনাদের যা বলেছি, সব ভুলে যান। তারপর আমাকে বললেন, আপনার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কি ভারত ত্যাগ করতে পারি?

ভারত কি আপনাদের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করতে পারে?

একশ' বার। ভবিষ্যত নিশ্চয়ই প্রমাণ করবে, আমরা ভারতের সত্যিকার বন্ধু!

ভারত ত্যাগের ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় চেয়ারম্যান ক্রুশ্চভের সম্মানে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বেনেদিকভের পার্টি। সে পার্টিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু, উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ থেকে শুরু করে রাজধানী দিল্লীর সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাবেশ হয়েছে। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা তো আছেনই। একদল সাংবাদিকের মধ্যে আমিও নিমন্ত্রিত হয়ে সে পার্টিতে গেছি। ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি এদিক-ওদিক কিন্তু ক্রুশ্চভ, নেহরু ও রাধাকৃষ্ণণের চারপাশে অনেকের ভিড় বলে ওদের কাছে যাচ্ছি না। হঠাৎ সোভিয়েত দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কূটনীতিবিদ আমাকে এসে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

তারপর উনি আমাকে সোজা ক্রুশ্চভের সামনে হাজির করে বললেন, এই যে ওকে ধরে এনেছি।

ক্রুশ্চভ আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি সত্যি খুশি হয়েছি। এই কথাটা জানাবার জন্যই আপনাকে খুঁজছিলাম।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার বিস্ময় কেটে যাবার পর সেদিনই আমি বুঝেছিলাম, নেহরু-ক্রুশ্চভের আলোচনায় সত্যিকার ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের বনিয়াদ তৈরী হয়েছে এবং আগামী দিনের ইতিহাস তা প্রমাণ করবে। এত বছর পর আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, ভারতবর্ষের বহু সঙ্কটে যে বন্ধু রাষ্ট্র সব সময় পাশে দাঁড়িয়েছে, তার নাম সোভিয়েত ইউনিয়ন। কাশ্মীর, চীন-ভারত যুদ্ধ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাব তুলনা বিরল

ক্রুশ্চভ সম্পর্কে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না।

আজ খবরের কাগজের পাতায় মানুভাই শা'র নাম ছাপা হয় না। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে রকম ডিফেন্স পলিসি'র জন্মদাতা হিসেবে কৃষ্ণমেনন, অয়েল পলিসি'র জন্মদাতা হিসেবে কেশবদেও মালব্যর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, সেইরকম রপ্তানী বানিজ্যের মূল বনিয়াদ তৈরীর জন্য মানুভাই শা'র নাম সবার মনে রাখা উচিত। মানুভাই মন্ত্রী হিসেবে যেমন খ্যাতি অর্জন করেন, পার্লামেন্টিরিয়ান হিসেবেও সবার মন জয় করেন।

যাই হোক মস্কোয় 'ভারত মেলা'র আয়োজন হলো মানুভাই শা'র উদ্যোগে। উনি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলতে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য অপরিহার্য এবং ভারত-সোভিয়েত বানিজ্যের খানিকটা সাম্য রক্ষা করতে হলে আমাদের রপ্তানী বাড়াতেই হবে। সোভিয়েত দেশে আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি করার জন্যই সেবার 'ভারত মেলা'র আয়োজন হয়। দিল্লী থেকে মস্কো রওনা হবার আগেই মানুভাই জানতেন, ক্রুশ্চভের পক্ষে মেলার উদ্বোধন করা সম্ভব হবে না। কারণ ঠিক ঐ সময় মস্কোয় পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধানদের সম্মেলন হবে।

তাছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ ব্যক্তিগত দূত হ্যারিম্যানও ঠিক ঐ সময় সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। তবু মানুভাই প্রধানমন্ত্রী নেহরুর একটা চিঠি নিয়ে গেলেন।

মস্কোয় পৌঁছে মানুভাই ক্রুশ্চভকে নেহরুর চিঠি দিতেই উনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, নো, নো, ভেরি বিজি। কান্ত গো। সরি।

ক্রুশ্চভ ব্যস্ত বলে সোভিয়েত বিদেশ বানিজ্য মন্ত্রী ভারত মেলা'র উদ্বোধন করবেন বলে সব ঠিক। আমন্ত্রণপত্র বিলি হয়ে গেছে। বক্তৃতা ছাপান হয়েছে। মেলার উজ্যোগ-আয়োজন সব শেষ।

সেদিন বিকেলেই মেলার উদ্বোধন। মানুভাই সারা সকাল মেলার মাঠে কাটিয়ে দুপুরে হোটেলে এসেছেন। খাওয়া-দাওয়া করে যথারীতি খালি গায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। হঠাৎ টেলিফোন—হ্যালো!

স্পীক টু চেয়ারম্যান, স্যার।

ক্রুশ্চভ স্পীকিং! আই কাম, ইওর একজিবিশন।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে টেলিফোন লাইন কেটে গেল।

হতভম্ব হয়ে মানুভাই নিজের বিছানায় বসে আছেন। ঠিক বুঝতে পারছেন না কি ঘটে গেল। এমন সময় ঘরে ঘণ্টা বাজতেই উনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। ঘণ্টা শুনে ভাবলেন নিশ্চয়ই আমাদের দূতাবাস থেকে কেউ এসেছেন।

দরজা খুলতেই সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুজন অফিসার মানুভাইকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন ইওর একসলেনসী, চেয়ারম্যান আপনাদের ভারত মেলার উদ্বোধনে আসছেন, সে খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন?

হ্যাঁ এক্ষুনি চেয়ারম্যান টেলিফোন করেছিলেন।

চেয়ারম্যান যখন যাচ্ছেন তখন আপনার বক্তৃতার নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন হবে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে বক্তৃতার প্রথম প্যারাটা লিখে দেন, তাহলে আমরা তা ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারি।

কিন্তু সময় তো বিশেষ নেই।

তা হোক। তবু আমরা চেষ্টা করব।

শুধু মানুভাই'এর বক্তৃতার প্রথম প্যারা না, চেয়ারম্যান ক্রুশ্চভের নামে নতুন আমন্ত্রণ পত্রও ছাপা হলো। এবং শত শত অতিথিরা এই নতুন আমন্ত্রণলিপি নিয়েই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এলেন। মানুভাই'এর বক্তৃতার প্রথম পাতাও নতুন করে ছাপা হয়ে এলো ঠিক সময়। এত অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবেই যে এসব ছাপা হলো এবং শত শত অতিথিদের কাছে পৌঁছে গেল, তা ভেবে মানুভাই ও ভারতীয় দূতাবাসের সবাই বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

ক্রুশ্চভ একলা না, রাষ্ট্রপতি মিকোয়ানও এলেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। ভারত মেলার শেষ প্রান্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার পটভূমিকায় দার্জিলিং তৈরি করা হয়েছিল এবং সেখানে কয়েকটি ভারতীয় সুন্দরী দার্জিলিং'এর চা পরিবেশন করছিল। ক্রুশ্চভ ঐ সুন্দরীদের দেখেই হাসতে হাসতে বললেন, এদের যদি আগে দেখতাম, তাহলে কি আমি আমার স্ত্রীকে বিয়ে করতাম ?

ওঁর কথায় সবাই হাসেন।

তারপর মিকোয়ানকে বলেন, মেয়েরা কেউ আপনাকে পছন্দ করবে না। ওরা আমাকেই চায়। আপনি দূরে দাঁড়ান।

এইসব হাসি-ঠাট্টা চলতে চলতেই ক্রুশ্চভ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মানুভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা তো আমাদের আরো চা বিক্রী করতে চান, তাই না ?

ইয়েস ইওর একসেলেনসী !

কাল সকাল এগারটায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

এই কথা বলেই ক্রুশ্চভ চলে গেলেন।

সোভিয়েতে চা রপ্তানীর ব্যাপারে যত চিঠিপত্র ও কথাবার্তা হয়েছে, সে সম্পর্কে কাগজপত্র জোগাড় করার জন্য মস্কোর ভারতীয় দূতাবাস এবং দিল্লীর পররাষ্ট্র ও বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সারারাত টেলেক্স মেসেজ লেনদেন হলো। মানুভাই ও অফিসাররা সারারাত ও

সকাল সেসব নিয়ে পড়াশুনা ও আলাপ-আলোচনা করে যথাসময়ে ক্রেমলিনে হাজির হলেন। সোভিয়েত পররাষ্ট্র বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের সবাইও হাজির। ঠিক এগারটার সময় ক্রুশ্চভ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেই বললেন, ভেরি বিজি, ভেরি বিজি। দু'তিন মিনিট থেকেই আমি পালাব।

তারপর অন্য কিছু বলার আগেই ক্রুশ্চভ গড় গড় করে বলে গেলেন, ভারত এই সময় এই সব প্রস্তাব দিয়েছে: আমরা তার এইসব জবাব দিয়েছি। এখনই আমরা এত চা কিনব, পরে এত কিনব এবং ভারতকে এইসব ব্যবস্থা করতে হবে।

এইটুকু বলেই উনি আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন।

এত বছরের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে এক সপ্তাহ পরে দুই দেশের প্রতিনিধি দল দেখলেন, ক্রুশ্চভ যা বলেছেন, তাই আদর্শ সমাধান এবং ক্রুশ্চভের প্রস্তাব অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

সে সময় সেই অসম্ভব ব্যস্ততা ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাঝে ক্রুশ্চভ যে কিভাবে চায়ের ব্যাপারে এত খবর জানলেন, তা মানুভাই ভেবে পেলেন না।

ক্রুশ্চভ সত্যি অনন্য পুরুষ ছিলেন।

* * *

আমি গামাল আবদুল নাসেরকে প্রথম দেখি কলকাতায়। বান্দুং'এ অনুষ্ঠিত এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির সম্মেলনের শেষে দেশে ফিরছিলেন। তখনও বোয়িং বা জাম্বো আবিষ্কার করা হয় নি। সুপার-কনস্টেলেশন ও ভাইকাউন্ট বিমানই সর্বাধুনিক। এক লাফে পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিক উড়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই নেহরু, নাসের ও আফগানিস্তানের নিয়াম কলকাতায় যাত্রা বিরতি করেছিলেন এক রাত্রির জন্য। সেটা ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের কথা।

বেশ মনে আছে বিকেলের দিকে ওঁরা দমদম পৌঁছলেন। বিমান

থেকে প্রথম বেরুলেন নেহরু, তারপরই নাসের ও নিয়াম। মধ্যপ্রাচ্যের মহানায়ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিরাট জিজ্ঞাসা নাসেরকে দেখেই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। দীর্ঘকায় চেহারা, দোহারা গড়ন, মুখে হাসি। পরণে কর্ণেলের পোষাক। সাঁইত্রিশ বছরের এই অনন্য রাষ্ট্রনায়ককে নবজীবনের দূত মনে করত বিশ্বের অসংখ্য মানুষ। করবে না কেন? মাত্র চৌত্রিশ বছরের যে তরুণ ইংরেজের পোষ্যপুত্র ব্যাভিচারী ফারুককে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারেন, তাকে নবযুগের স্রষ্টা মনে করাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পঞ্চাশের দশকে জন্ম নিল পৃথিবীর তৃতীয় শক্তি (Third world) এবং নেহরু, সোয়েকর্ণ, টিটো, বন্দরনায়ক, উ নূ, নক্রুমার মত এই তরুণ রাষ্ট্রনায়কও তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম মহানায়ক। তাইতো সেদিন অস্তগামী সূর্যের আলোয় দমদম বিমানবন্দরে এই মহানায়ককে দেখে সত্যি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।

স্বৈরতন্ত্রী মিশরের এক দরিদ্র পোস্টমাস্টারের ছেলে নাসের পরের বছরই সারা পৃথিবীকে চমকে দিলেন সুয়েজ খাল রাষ্ট্রীয়করণ করে। তখন একদিকে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ ও অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক বেশ তিক্ত। (ক্রুশ্চেভ হঠাৎ নেহরুকে খবর দিলেন, আগামী দু' একদিনের মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসীরা মিশর আক্রমণ করবে। খবরটা নাসেরকে জানিয়ে দেবার জন্য ক্রুশ্চভ নেহরুকে অনুরোধ করলেন এবং নেহরুও কালবিলম্ব না করে সোভিয়েট গোয়েন্দা দপ্তরের সংগৃহীত এই খবরটি নাসেরকে জানিয়ে দেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে তখন মিশরের সম্পর্ক কী রকম ছিল, তা এই ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়।) তবু এই দুঃসাহসী তরুণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি একই সঙ্গে ইজরাইল-ইংরেজ-ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। সারা পৃথিবীর ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেদিন নাসেরকে সমর্থন করেন।

যাই হোক বহু ইতিহাসের স্রষ্টা ও নবজাগ্রত এশিয়া-আফ্রিকার অন্যতম মহানায়ক নাসেরকে আবার দেখি ১৯৬২ সালের বেলগ্রেড

গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মেলনে ও পরে দিল্লীতে। দৈবক্রমে একটু ঘনিষ্ঠ হবারও দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রনায়কেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। অনেকে বিরল প্রতিভাসম্পন্ন হন। কোন কোন রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে বিস্ময়কর দূরদর্শিতা থাকে কিন্তু অনেক রাষ্ট্রনায়কের মধ্যেই যা থাকে না, তা হচ্ছে উষ্ণ ব্যক্তিত্ব। ইংরেজিতে যাকে বলে warm personality. আমাদের নেহরুর মধ্যে ছাড়াও এই বিরল গুণ দেখেছি নাসের ও নক্রুমার মধ্যে।

মনে পড়ে বেলগ্রেড গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনের ক'টি দিনের কথা। এখনকার মত সরকারী খরচে একদল সাংবাদিক নিয়ে নেহরু বিদেশ সফর করতেন না এবং করার প্রয়োজনও বোধ করতেন না। (পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রেডিও— টি. ভি—সংবাদপত্রের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আছে বলে তারা জলের মত অর্থ ব্যয় করে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিদেশ সফর কভার করে। কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে এই প্রতিযোগিতা বিন্দুমাত্রও নেই কিন্তু তবু কমিউনিষ্ট নেতারা নিজেদের ব্যাপক প্রচারের জন্য বিদেশ সফরের সময় বিমান ভর্তি রেডিও—টি. ভি—সংবাদপত্র-সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের সঙ্গে আনেন। এখন এই রোগ গরীব দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে।) বেলগ্রেডে আমরা মাত্র তিন চারজন ভারতীয় সাংবাদিক ঐ ঐতিহাসিক সম্মেলনের খবর সংগ্রহের জন্য উপস্থিত ছিলাম এবং তার মধ্যে একজন ছিলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র সংবাদদাতা মিঃ চোনা। একজন বৃদ্ধ সাংবাদিক সস্ত্রীক ইউরোপ পরিভ্রমণে বেরিয়ে এই সম্মেলনের সময় বেলগ্রেডে ছিলেন। একটি গুজরাতী দৈনিকের মালিকের পুত্র নিছক মজার জন্য 'সাংবাদিক' হিসেবেও তখন এখানে ছিলেন। মোটকথা মিঃ চোনা ছাড়া আমরা দুজন সাংবাদিকই সংবাদ সংগ্রহ করে আমাদের সংবাদপত্রে পাঠাতাম। তাইতো আমাদের দুজনকে সর্বত্রই উপস্থিত থাকতে হতো।

বেলগ্রেডে আমার একটু বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল! প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। সদস্য ছিলেন কৃষ্ণ

মেনন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল মিঃ আর. কে. নেহরু, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জগন্নাথ খোসলা ও আরো দু'তিনজন। নেহরু, কৃষ্ণ মেনন ও আর. কে. নেহরু আমাকে স্নেহ করতেন বলে অনেক সময় ওদের সঙ্গেই নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করতাম। এই রকম একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানেই কৃষ্ণ মেনন আমাকে নাসেরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দু'একটি সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পরই উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে (বেলগ্রেড) আসার পথে কী কায়রো গিয়েছিলেন?

না। আমি বেইরুট-এথেন্স হয়ে এসেছি।

ইউ মাস্ট কাম টু কায়রো অন ইওর ওয়ে ব্যাক হোম।

নিশ্চয়ই আসব। আমারও কায়রো যাবার খুব ইচ্ছা।

নাসের আমার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে একটু হেসে বললেন, মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড, আমার দেশের মানুষ নেহরু ও মেননকে আমার চাইতেও বোধহয় বেশি ভালবাসে। তাই বলছি, কায়রো না এলে খুব অন্যায় করবেন।

নাসের হয়তো একটু অতিশয়োক্তি করেছিলেন কিন্তু বুঝলাম, মিশরের মানুষ নেহরু ও মেননকে সত্যি প্রিয়জন মনে করেন। নেহরুর সঙ্গে কায়রো সফরের সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু একবার মেনন যখন কায়রোতে ছিলেন, তখন আমিও সেখানে। একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখার সময় মেনন আমাকে সঙ্গে নিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে দর্শকরা মেননকে দেখলে হৈ চৈ করবেন ও হলের সামনে অসম্ভব ভীড় জমবে বলে আমরা অনুষ্ঠান শুরু হবার বেশ কিছুক্ষণ পরেই হলে ঢুকলাম। ইন্টারভ্যালের সময় হঠাৎ কিছু দর্শক মেননকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের কী উল্লাস! না দেখলে সত্যি বিশ্বাস করা যায় না। গর্বে আনন্দে মন ভরে গেল। অনুমান করতে কষ্ট হল না নেহরুর জনপ্রিয়তা। যাই হোক মাস দেড়েক ইউরোপ ঘুরে দিল্লী ফেরার পথে ক'দিন কায়রোয় কাটিয়ে সত্যি আনন্দ পেয়েছিলাম।

কয়েক বছর পর নাসের দিল্লী এলে আবার দেখা। ওঁর আলীগড় সফরও কভার করলাম। দিল্লীতে ফিরে আবার দেখা। মাঝে মাঝে টুকটাক কথাবার্তা হয়।

এই সময় নাসেরের নামে এক বিচিত্র ও মুখরোচক গুজব ছড়ায় দিল্লীতে। দু'একটি পত্রপত্রিকায় তা ছাপাও হয় কিন্তু কেউই সাহস করে গুজবের সত্য-মিথ্যা যাচাই করছিলেন না। সাংবাদিক সম্মেলনে আমিই ওঁকে প্রশ্ন করলাম। পাশেই বসেছিলেন নেহরু। উনি আমার প্রশ্ন শুনেই রেগে লাল কিন্তু নাসের হাসি মুখেই জবাব দিলেন। ঐ প্রশ্নোত্তরের জন্যই জানা গেল গুজবটি মিথ্যা ও তার চিরসমাধি ঘটল। রাষ্ট্রপতি ভবনের রিসেপসনে নাসের আমাকে বললেন, আপনি সাহস করে ঐ প্রশ্নটি করেছিলেন বলেই আমি বলতে পারলাম, গুজবটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ওর কোন ভিত্তি নেই। আপনি প্রশ্ন না করলে গুজবটি আরো বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করত।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম, আমিও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার আমাকে ভুল বুঝলেন।

আমি আপনাকে যা বললাম, তা মিঃ নেহরুকেও বলেছি।

থ্যাঙ্ক ইউ ইওর একসেলেন্সী।

উনি আমার সঙ্গে করমর্দন করবার সময় বললেন, এবার কায়রো আসার আগে আমাকে জানাবেন।

নিশ্চয়ই জানাব।

* * *

ক্রুশ্চভ-বুলগানিনের মতই অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন প্রথম ভারত সফরকারী মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম মহানায়ক ও নাৎসী ফৌজের বিভীষিকা আইসেনহাওয়ারকে নিয়ে দিল্লীর মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। সত্তর বছরের এই 'যুবা' নেহরুর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা গভীর আলাপ-আলোচনার পর রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে এসেই অন্য মানুষ! স্কাউটস্ ও গাইডস্

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এসে তিনিও ওদেরই একজন হয়ে গেলেন। এই মানুষটিই ওয়েলেসলী রোডের ধারের গলফ ক্লাবের মাঠে নিছকই একজন পরম উৎসাহী খেলোয়াড়। প্রেস সেক্রেটারি জেমস্ হ্যাগার্টি আমাদের বললেন, ছবি আঁকা, বই পড়া ও মাছ ধরার সময়ও উনি রাষ্ট্রপতি থাকেন না। তখন উনি অন্য জাতের মানুষ। সত্যি তাই। দিল্লীর উপকণ্ঠের এক গ্রামে গিয়ে আইসেনহাওয়ারও নিছক একজন গ্রামবাসীর মতই কথাবার্তা বলেন। গরু-বাছুর চাষ-বাসের ব্যাপারে ওঁর কথাবার্তা শুনে গ্রামের লোকজন অবাক।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে তাজমহল দেখাতে নিয়ে গেলেন স্বয়ং নেহরু। সঙ্গে আইসেনহাওয়ারের পুত্রবধূ বারবারা আইসেন-হাওয়ার। সঙ্গী সাংবাদিকদের মধ্যে আমিও আছি। তাজমহলের চারপাশে ঘুরে-ফিরে দেখে ওরা উপরে আসেন। পাশেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের অসংখ্য প্রশ্ন করেন আইসেনহাওয়ার। বারবারাকে বুঝিয়ে দেন নেহরু। ভাবপ্রবণ নেহরু তাজমহল দেখে যেন একটু আনমনা হয়ে যান। আমি ছোট্ট একটা সরস মন্তব্য করি। সাংবাদিক বন্ধুরা হেসে ওঠেন কিন্তু আমার মন্তব্য বোধহয় নেহরু শুনতে পান না। কিছু বলেনও না।

তাজমহল দেখে বিদায় নিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার। ঐ একই খোলা মোটরে বসে নেহরু। আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের ধন্যবাদ জানাবার পর হঠাৎ আইসেনহাওয়ার আমাকে ডেকে আমার সঙ্গে করমর্দন করেই হাসতে হাসতে বললেন, আমি তোমার মন্তব্য শুনে খুব উপভোগ করেছি।

ওঁর কথায় আশেপাশের সব সাংবাদিক বন্ধুরা হো হো করে হেসে ওঠেন। আর আমি অবাক হয়ে ভাবি, উনি তো আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার মন্তব্য শুনলেন কী করে ?

উনি যে আইসেনহাওয়ার! চতুর্দিকে এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকলে

কি বিশ্ববরেণ্য সেনাপতি হওয়া যায় ?

সর্বনাশা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক'টা বছর কাটতে না কাটতেই পৃথিবীর দুটি বিবাদমান শক্তির সাময়িক মোকাবিলা শুরু হলো এই এশিয়ারই এক দেশে—কোরিয়ায়। ক'বছর যুদ্ধ চলার পর চুক্তি হলো উত্তর কোরিয়া থেকে রাশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সৈন্য সরিয়ে নেবে। চুক্তি হলেই যে তা রক্ষা করতে হবে, এ কথা দুটি বিবাদমান শক্তি বিশ্বাস করে না এবং তাইতো উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী হানা দিল দক্ষিণ কোরিয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ করল কিন্তু চীনের পিপলস্ ভলান্টিয়ার ফোর্স যুদ্ধ শুরু করল দক্ষিণ কোরিয়ায়। আরো কত কি ঘটল। শেষ পর্যন্ত কোরিয়ার রণাঙ্গনে যুদ্ধ থামল কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা নিয়ে নতুন করে লড়াই শুরু হলো ইন্দো-চীনে।

কোরিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে নেহরু ও কৃষ্ণ মেননের অবদান বিশ্ববাসী স্বীকার করলেও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ভারতের এই গুরুত্ব মেনে নিতে পারলেন না। তাইতো তাঁরই একগুঁয়েমির জন্য ইন্দো-চীন সংক্রান্ত জেনেভা সম্মেলনে ভারতকে আমন্ত্রণ জানান হলো না। সেটা ১৯৫৪ সালের মে মাসের কথা।

সম্মেলন শুরু হতে না হতেই দেখা দিল দ্বন্দ্ব। সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করে ডালেসের প্রতিনিধি হুমকি দিলেন নতুন সর্বাত্মক লড়াইয়ের। বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার এ্যান্থনি ইডেন একা সম্মেলনকে চালু রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করলেও কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। সম্মেলন প্রায় ভেঙে যায় আর কি! এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে রাষ্ট্রপুঞ্জে যাবার পথে 'টুরিস্ট' হিসেবে নেহরুর দূত কৃষ্ণ মেনন জেনেভায় হাজির।

জেনেভায় মেনন পৌঁছতে না পৌঁছতেই কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে শুরু হলো তাঁর নিন্দা কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেনেভা সম্মেলনে অনিমন্ত্রিত এই কৃষ্ণ মেননই অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন এবং বৃটেনের এ্যান্থনি

ইডেন, রাশিয়ার মলোটভ, চীনের চৌ এন লাই, ভিয়েতনামের ফাম ভন ডোঙ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, কলম্বিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মেননের সঙ্গে পরামর্শ করা শুরু করলেন। এই জেনেভা সম্মেলন শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হবার পিছনে মেননের অবদান পরবর্তী কালে সবাই স্বীকার করেন।

যাইহোক এই জেনেভা সম্মেলনের সময়ই চৌ এন লাই'এর সঙ্গে মেননেব গভীর হৃদ্যতা হয় এবং সেই সূত্র ধরেই দেশে ফেরার পথে দিল্লী হয়ে যাবার জন্য নেহরু চৌ এন লাইকে আমন্ত্রণ জানালেন। চৌ খুশি হয়েই সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দিল্লী এলেন। চৌ এন লাই-এর সেই প্রথম ভারত ভ্রমণ। পরের বছর বান্দুং'এ চৌ এন লাই'এর সঙ্গে নেহরু ও মেননের আবার দেখা হল এবং তারপরের বছর (১৯৫৬) চৌ এন লাই তাঁর ঐতিহাসিক ভারত সফরে এলেন।

আমি তখন ফ্রী-লান্স রিপোর্টার হলেও প্রধানতঃ কলকাতার এক বিখ্যাত দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত। চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সারা দেশ ঘোরার কথা তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি না কিন্তু এত বড় ঐতিহাসিক সফরেব কোন এক অংশও 'কভার' করব না, তাও মেনে নিতে পারি না। চিঠি লিখলাম চীনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আর. কে. নেহরুকে। উনি খবর পাঠালেন, চীনা প্রধানমন্ত্রীর সফর শুরু হবার কয়েক দিন আগে কলকাতা হয়েই দিল্লী পৌঁছব। তুমি হাকসারের বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করো।

এখানে একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা দরকার। ডক্টর কৈলাশনাথ কাটজু যখন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল, তখন একদিন রাজভবনের এক অনুষ্ঠানেই ওঁর বড় মেয়ে শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং প্রথম দর্শনেই তাঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে শুরু করি। রামকৃষ্ণ-শ্রীমা'র একনিষ্ঠ সাধিকা শ্রীমতী হাকসার কয়েক দিনের মধ্যেই আমার মাতাজী হয়ে গেলেন এবং উনিও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমাকে সন্তানের স্নেহ করতে শুরু করলেন। মিঃ

হাকসার তখন ডানলপের ডিরেক্টার ও ওঁরা তখন গুরুসদয় দত্ত রোডে থাকতেন এবং সেখানে আমার নিত্য যাতায়াত ছিল। মিঃ হাকসারের বোনের সঙ্গেই মিঃ আর. কে. নেহরুর বিয়ে হয়েছিল। এই হাকসার পরিবারের দৌলতেই আর. কে. নেহরুর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে এবং উনিও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার জীবনের চরম দুর্দিনে মাতাজীর স্নেহ-ভালবাসার কথা আমি জীবনেও ভুলব না।

যাইহোক হাকসার-গৃহে মিঃ নেহরুর সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর উনি বললেন, তুমি চিত্তরঞ্জন-সিন্ধ্রী ছাড়াও কলকাতায় প্রাইম মিনিস্টারের সফর কভার করো এবং আমি তার ব্যবস্থা করব। ফ্রী-লান্স রিপোর্টার হিসেবে সরকারী প্রেস কার্ড ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্তা প্রকাশ স্বরূপ মাথুরের সৌজন্যে চীনা প্রধানমন্ত্রীর সফর কভার করার বিশেষ প্রেস কার্ডও পেয়ে গেলাম। যে সংবাদপত্রের জন্য প্রধানতঃ কাজ করতাম, তাদের কাছে চৌ এন লাই'এর চিত্তরঞ্জন-সিন্ধ্রী সফর কভার করার প্রস্তাব করতেই ওঁরা সরাসরি প্রস্তাবটি বাতিল করে দিলেন। আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের চীফ রিপোর্টার মণীন্দ্র ভট্টাচার্য বললেন, আমরা চিত্তরঞ্জনে কোন রিপোর্টার পাঠাচ্ছি না। হ্যাঁ, তুমি চিত্তরঞ্জন ট্যুর কভার করো এবং তার জন্য আমরা তোমাকে একশ' টাকা দেব। ব্যস! আমাকে তখন কে দেখে!

যাইহোক ক'দিন ধরে চৌ এন লাই'এর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে দেখলাম, উনি বড্ড 'সিরিয়াস' প্রকৃতির মানুষ। সবকিছুই গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করা ওঁর সহজাত স্বভাব। সর্বোপরি উনি পরিপূর্ণ-ভাবে রাজনীতিবিদ্ (a total political personality)। মনে পড়ে কলকাতা রাজভবনের কাউন্সিল চেম্বারে ওঁর সাংবাদিক সম্মেলনের কথা। চৌ এন লাই চেয়ারে বসতে না বসতেই একজন মার্কিন সাংবাদিক একটা প্রশ্ন করলেন। চৌ এন লাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনারা বড্ড বেশি উদ্ধত। সব সময় সব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে ব্যস্ত। আমি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সফর করছি। সুতরাং আমি যে প্রথমে ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব

দেব, এটুকু সৌজন্যজ্ঞান আপনার থাকা উচিত।

এই একটি ছোট্ট 'সাধারণ' উত্তরের মধ্য দিয়েই চৌ এন লাই মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির তীব্র সমালোচনা করলেন এবং এ ধরনের কথা শুধু ওঁর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল।

এই সফরের শেষে আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন ভি-আই-পি'দের সঙ্গে কলকাতার সাংবাদিকরা নিয়মিত ছবি তুলতেন। চৌ এন লাই ও মার্শাল হো লুঙ ১৯৫৬ সালের দশই ডিসেম্বর সকালে দমদম থেকে স্বদেশ রওনা হন। বিমানে ওঠার প্রাক্কালে কয়েকজন রিপোর্টার-ফটোগ্রাফার চৌ এন লাইকে তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করতেই উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। আমি চীনা প্রধান-মন্ত্রীর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। এবং উনি আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরেই ছবি তুললেন। তখন আমি ফ্রী-লান্স হলেও কলকাতার যে দৈনিকের জন্য আমি প্রধানতঃ কাজ করতাম, সেই অফিসে বিকেলবেলায় যেতেই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন চীফ রিপোর্টার গর্জে উঠলেন—তুমি চৌ এন লাই'এর হাত ধরে ছবি তুলেছ কেন? তোমার এই ফাজলামির জন্য পুলিশ ক্ষেপে লাল। এখন ঠেলা সামলাও।

কথাটা শুনেই আমি ঘাবড়ে গেলাম। তবু সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কে বলল?

উনি একটি ইংরেজি পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের নাম করে বললেন, ও পুলিশের একজন অফিসারের কাছে শুনেছে।

ঐ ভদ্রলোকের নাম শুনেই মনে হলো, উনি বোধহয় ঈর্ষায় আমার নামে মিথ্যা কথা বলছেন। তবু মনে মনে একটু শঙ্কিতই রইলাম।

পরের দিন সকালেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টর অব পাবলিসিটি মিঃ মাথুরের কাছে গেলাম। উনি সব শুনেই বললেন, বাজে কথা। চাইনীজ প্রিমিয়ার যদি খুশি হয়ে তোমার হাত ধরে ছবি তোলেন, তাতে পুলিশের আপত্তি করার কী কারণ আছে? তাছাড়া আমাকে না জানিয়ে পুলিশ নিশ্চয়ই কিছু করবে না।

পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জন্য চীফ সেক্রেটারি সত্যেন রায়ের কাছে গেলাম। উনি হেসে বললেন, ঐ রিপোর্টারটি নিছক ঈর্ষায় তোমার নামে মিথ্যে কথা বলেছে। তাছাড়া আমিও তো চাইনীজ প্রিমিয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। যে ছবিতে আমি আছি, তার ব্যাপারে পুলিশ কী বলবে?

সন্ধ্যায় অফিসে গিয়েই চীফ রিপোর্টারকে সব জানালাম কিন্তু উনি কোন মন্তব্য করলেন না। বোধহয় আমাকে ভাল করে বকুনি দেবার সুযোগ না পেয়ে মনে মনে একটু আহত হলেন।

ইংরেজি দৈনিকের ঐ রিপোর্টারের বিষয়ে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। ওঁর শ্বশুরমশায়ের প্রতিষ্ঠানে আমি এককালে শিক্ষানবিশী সাংবাদিক ছিলাম বলে উনি মনে মনে আমাকেও ওঁর অধঃস্তন কর্মচারী ভাবতেন এবং আমাদের মত ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা উনি সম্মানজনক মনে করতেন না। উনি অবশ্য শ্বশুরমশায়ের দৌলতেই সাংবাদিক হন। ওঁর শ্বশুরমশায়ের প্রতিষ্ঠানটি সরকারের পাওনা লক্ষ লক্ষ টাকা না দিয়েই লালবাতি জ্বালান। কোন কর্মচারী প্রফিডেণ্ট ফাণ্ডের একটি পয়সাও পান না। শুনেছি, এই প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক বহুদিনের মাইনে ও প্রফিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাকড়ি না পাওয়ায় অভাবের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাও করেন। তবু এঁরা সমাজে বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয়।

যাইহোক সব মিলিয়ে চৌ এন লাই'এর এই সফর আমার সাংবাদিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। পরে দিল্লীতে আবার চৌ এন লাই'এর দেখা পেয়েছিলাম। ধীর, স্থির, বিচক্ষণ দেশনায়ক হিসেবে চৌ এন লাই'কে আমি চিরকাল মনে রাখব।

* * *

প্রায় পুরোপুরি বিপরীত কারণেই মনে রাখব জুলফিকার আলি ভুট্টোকে। সিন্ধু প্রদেশের লারকানার কোটিপতি জমিদার স্যার শাহনাওয়াজ ভুট্টোর এই ছেলেটি 'মরিয়াও প্রমাণ করিল, সে মরে

নাই।' স্যার শাহনাওয়াজ শুধু জমিদার ছিলেন না, তিনি বোম্বে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কিছুকাল মন্ত্রীও ছিলেন। জুলফি তখন মহানন্দে দিন কাটাচ্ছেন বোম্বেতে। খেলার সাথী স্যার হোমি মোদীর ছেলে পিলু। আলালের ঘরের দুলাল হলেও জুলফি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হবার পর অক্সফোর্ড থেকে এম. এ. পাশ করে লিঙ্কন-ইন থেকে ব্যারিস্টার হলেন। কিছুকাল বিলেতে অধ্যাপনা করার পর অধ্যাপনা আর ব্যারিস্টারী করার জন্য দেশে ফিরলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আয়ুব পাকিস্তানের তখৎ-এ-তাউস দখল করলেন। তারপর হঠাৎ একদিন জুলফি তাঁর বাণিজ্য মন্ত্রী হলেন। তখন উনি সত্যি যুবক। বয়স তিরিশের ঘরের একেবারে প্রথম দিকে। দেখতে না দেখতে জুলফিকার আলি ভুট্টো আয়ুবের দক্ষিণহস্ত ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন। এই সময়ই ভুট্টোকে আমি কয়েকবার দেখি। সর্দার শরণ সিং ভুট্টোর বার বার কথা হয় ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ মীমাংসার চেষ্টায় কিন্তু ওঁর কথাবার্তা শুনে মনে হতো, এমন ভারত-বিদ্বেষী আর জন্মাবেন না। এমন অনর্গলভাবে ভারতের সবকিছুর নিন্দা করতে আর কারুর কাছে কখনও শুনিনি। মনে হতো যেন ওঁর জিহ্বায় দুষ্টু সরস্বতী বিরাজমানা। তবে হ্যাঁ, প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন এবং জলপ্রপাতের ধারার মত সুন্দর ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেন। সর্বোপরি ছিলেন মহা অহঙ্কারী। হাজার হোক ধনী ও বিখ্যাত জমিদারের ছেলে। দেখতে সুপুরুষ ও উচ্চশিক্ষিত। তার উপর অল্পবয়সে রাজনৈতিক খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভ করে উনি বড্ড অহঙ্কারী হয়ে পড়েন। এবং প্রতিটি কথায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

প্রথমে বন্দী ও পরে ফাঁসিতে মৃত্যুর পরে এখন অনেকেই জুলফিকার আলি ভুট্টোর প্রতি সমবেদনশীল হয়েছেন এবং মনুষ্যত্বের দিক থেকে তা স্বাভাবিক ও কাম্য। তবু ইতিহাস-প্রেমিক ভুট্টোকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের জন্য ভুট্টো ব্যক্তিগতভাবে

অনেকাংশে দায়ী। সর্বোপরি বাংলাদেশে বাঙালী নিধনযজ্ঞের অন্যতম হোতাও ছিলেন এই ভুট্টো। যে কারণে নাদির শা'কে কোনদিনই শ্রদ্ধা করব না, ঠিক সেই কারণেই আমি পিলু মোদীর এই বাল্য-বন্ধুকেও চিরকাল ঘৃণা করব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সব অতীত কুকীর্তি মুছে ফেলা যায় না। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য এইরকম খামখেয়ালী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতাদের উপর বার বার দেশ শাসনের ভার পড়েছে।

পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে মোলাকাত করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে বইপত্তর পড়ে তাঁর নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে না পারলেও মানুষ জিন্নার প্রতি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধাশীল হয়েছি। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে একবারই দেখেছি। কয়েকবার দেখেছি ও সামান্য আলাপ-পরিচয় হয়েছিল পাকিস্তানের পরবর্তী এক প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলির (বগুড়া) সঙ্গে। এই মহম্মদ আলিকে নিয়েই আমার লেখক জীবনের প্রথম লেখা লিখি (রিপোর্টারের ডায়েরী : ভারতবর্ষ : পৌষ, ১৩৬৪) 'চৈতন্য' ছদ্মনামে।

মধ্যরাত্রির কিছু পরেই টেলিপ্রিণ্টারে এক 'ফ্লাস মেসেজ' এলো।

...Pakistans newly appointed Prime Minister, Mr. Mohammad Ali will pass through Calcutta early this morning on his way from Karachi to Dacca.

ইংরেজি মতে তখন ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলেছে। আর্লি দিস মর্নিং বলতে রাত একটা না দুটো, তিনটা না চারটে, তার কোন ইঙ্গিত নেই ফ্লাস মেসেজে। কোন্ বিমানে তাঁর আগমন, তারও কোন হদিশ নেই এই সংক্ষিপ্ত খবরে। মাত্র কদিন আগে নিতান্ত নাটকীয়-ভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে মহম্মদ আলি নিযুক্ত হয়েছেন। লিয়াকত আলি খানের আকস্মিক মৃত্যুর পর ঢাকার মসনদ ত্যাগ করে করাচীর তখৎ-এ-তাউস অলঙ্কৃত করে জনাব নাজিমুদ্দীন একদিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও, সেটা অচিন্তনীয় কিছু হয়নি। কিন্তু প্রৌঢ়

বয়স্ক নবীন রাজনীতিবিদ্ মহম্মদ আলির পক্ষে মার্কিনী মুলুকে দূত হওয়াই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হলেও, অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে প্রধান-মন্ত্রীপদে নিয়োগে সারা দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং দমদম বিমান বন্দরে সেই সৌভাগ্য চূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের লোভ কলকাতার সাংবাদিকরা কর্তব্য ও আগ্রহের আতিশয্যে সম্বরণ করতে পারেননি। নাইট্ ডিউটির সব রিপোর্টাররা এখানে-ওখানে-সেখানে টেলিফোন করলেন। নানান মহলে খোঁজ-খবর করে জানলেন, প্রত্যুষে পাঁচটা নাগাদ বি-ও-এ-সি-বিমানে তাঁর আগমন হচ্ছে দমদমে। বিমান ও বিমানযাত্রীরা প্রাতরাশ শেষ করে যাবেন ঢাকা।

এখনও এক সপ্তাহ হয়নি। করাচী রেলস্টেশনে নিয়মিত যাত্রীদের আগমন-নির্গমন সেদিনের মত শেষ হয়েছে। ভোরের আগে আর কোন বাষ্পীয় শকটের আবির্ভাব হবার কথা নয় করাচী স্টেশনে। হঠাৎ মধ্য-রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা ট্রেন স্টেশন প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। অভ্যাস মত কুলিরা সব ঘুম থেকে চট করে উঠে বসল। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল, এটা কোন সাধারণ যাত্রীগাড়ি নয়। আবার তারা সব গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। প্লাটফর্মে গাড়ি থামল। কর্তাব্যক্তিদের ত্বরিত গতিতে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি! সান্ত্রীদের উপস্থিতি। প্লাটফর্ম লাল কার্পেটে মুড়ে দেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন যাবেন লাহোর না রাওয়ালপিণ্ডি। তাঁরই শুভাগমন প্রত্যাশায় স্টেশন প্লাটফর্মে রেল আর পুলিশের কর্তারা সব 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' করে অপলক নেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কয়েক মিনিট বাদেই টেলিফোনের আওয়াজ। তারপর আবার কর্তাদের মন্থর গতিতে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা। সামনের লাল আলো নীল হল। নির্দিষ্ট যাত্রীকে না নিয়েই ট্রেনটা স্টেশন পরিত্যাগ করল। সান্ত্রীরা তাদের অস্ত্রাদি ঘাড়ে করে শিথিল পদক্ষেপে ফিরে গেল। পোর্টারের দল এগিয়ে এলো। লাল কার্পেট গুটিয়ে রাখা হল। করাচী স্টেশন আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

সারা শহরটাও তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু আরব

সাগর পারের করাচী বন্দর থেকে আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রশান্ত নাবিকদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় তরণীর নাবিকদেরও সে রাত্রে ঘুম হয়নি। সারা রাত্রি চলেছিল শলা-পরামর্শ আর মন্ত্রণা। ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে মুক্তি দিলেন নাজিমুদ্দীন সাহেবকে। আর সেই সোনালী সিংহাসনে বসালেন মহম্মদ আলিকে এই রাত্রিতেই।

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে কিছুকালের জন্য মহম্মদ আলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর ঐতিহাসিক রাজত্বকালে সাময়িক-ভাবে অর্থমন্ত্রীর পদে মহম্মদ আলি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে কারণে কলকাতার রিপোর্টার মহলের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধ্যরাত্রির অনেক পরে খবর পেয়েও ভোর পাঁচটায় দমদম বিমান-বন্দরে কার্পণ্য হয়নি রিপোর্টারদের উপস্থিতিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি, আর পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের জনকয়েক কর্তাব্যক্তি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য হাজির ছিলেন। আর বিশেষ কেউ ছিলেন না। ভোরের আলো তখন সবে ছড়িয়ে পড়লেও, সূর্যরশ্মি তখনও ঠিকরে পড়েনি দমদমের লম্বা রানওয়েতে। ঠিক সময় বি-ও-এ-সি বিমানটি এসে পৌঁছাল। বিমানের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে 'এয়ার হোস্টেস্' ইঙ্গিত করে জানালেন, বিমানে ভি. আই. পি. (Very Important Person) রয়েছেন। নিম্ন কর্মচারীর পরিবর্তে পদস্থ কর্মচারীরাই অধিকতর উৎসাহী হয়ে বিমানে সিঁড়ি লাগালেন। সহাস্য বদনে নেহরুজীর মত এক 'ব্যাটন' হাতে বেরিয়ে এলেন মিঃ আলি।

বিমান থেকে নেমে আলি সাহেব দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে ভি-আই-পি রুমে প্রবেশ করলেন। পিছন পিছন এলেন প্রধানমন্ত্রীর একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী। তরুণ বাঙ্গালী যুবক। আগে রাইটার্স বিল্ডিং'এ স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। আর এলেন খাকি প্যান্ট ও মোটা শোলার হ্যাট পরে পাকিস্তান সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি মিঃ

ইস্কান্দার মীর্জা। মিঃ মীর্জা আর ঘরে ঢুকলেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। উপস্থিত অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

ঘরের ভিতর মিঃ আলির সোফার চারিদিকে বসে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা রিপোর্টারের দল। একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালীকে প্রধানমন্ত্রীরূপে পেয়ে রিপোর্টারদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। প্রধানমন্ত্রী হয়েও মহম্মদ আলির মুখের হাসিকে অহেতুক গাম্ভীর্য গ্রাস করেনি। দেখে সবাই আনন্দিত। স্টেটসম্যান পত্রিকার চীফ্ রিপোর্টারের দিকে ফিরে বল্লেন, 'হাউ আর ইউ, মিঃ দাশগুপ্তা? পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অমৃতবাজারের যতীনদার (মুখার্জী) দিকে লক্ষ্য করে তাঁর কুশলবার্তা জানতে চাইলেন। কলকাতার স্মৃতি রোমন্থন করে জিজ্ঞেস করলেন, এর-ওর কথা। কাগজের অফিসের নানানজনের কথা। রাইটার্স বিল্ডিংস'এর টুকিটাকি। ডাঃ রায়ের সংবাদ। তারপর শুরু হল কাজের কথা: বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পাকিস্তানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানালেন, ভারত-পাকিস্তানের মৈত্রী বন্ধন কোনদিন কোনো কারণেই শিথিল হতে পারে না। বরং সে বন্ধন দৃঢ়তর হবে। নেহরুজীকে নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতন শ্রদ্ধা করেন জানিয়ে নিকট-ভবিষ্যতে কাশ্মীর ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অভিপ্রায়ও মিঃ আলি জানান।

আমেরিকায় পাকরাষ্ট্রদূত ছিলেন মিঃ আলি। রাষ্ট্রদূত পদ থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী। ঘোড়ার থেকে সহিস না হলেও, অনুরূপ একটা কিছু বটে। আইসেনহাওয়ার প্রভুদের কোন হাত নেই তো এই পরিবর্তনে। আমেরিকা মহম্মদ আলিকে দিয়ে কোন বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবে নাতো? সেদিন আরো পাঁচজনের সাথে সাথে কলকাতার রিপোর্টারদের কাছেও এ সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকলে যেমন তান্ত্রিক সাধনা সম্ভব নয়, তেমনি আজকের দিনে খবরের কাগজের রিপোর্টার হওয়াও অসম্ভব। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই প্রশ্ন করা হল:

'Is it not but natural that the United States would enjoy some

special favour during your Prime Ministership?' সব সন্দেহ ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। সরাসরি এ আশঙ্কা অমূলক বল্লেন। এমন দরদ দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্লেন যে, তা অবিশ্বাস্য মনে হল।

সুদীর্ঘকাল পূর্বপাকিস্তানে কলকাতার সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ। যুগান্তরের চীফ্ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্যই প্রথম সেকথা পাড়লেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন মিঃ আলি, ঢাকা যেয়েই এই সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন। দমদম ত্যাগ করে ঢাকা যাবার জন্য আবার বিমানের দিকে রওনা হলেন। বিমানে চড়বার আগে সব রিপোর্টারদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। সিঁড়ি দিয়ে বিমানে উঠে গিয়ে অনুরোধ করলেন, দমদমে গৃহীত ফটোগুলির কপিগুলো যেত তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্মতি জানালেন তারক দাস ও অন্যান্য ফটোগ্রাফারের দল।

পরদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রগুলির প্রথম ও প্রধান সংবাদরূপে দমদমে মহম্মদ আলির সঙ্গে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের বিবরণী ছাপা হল। রিপোর্টারদের সঙ্গে তাঁর ছবিও বেরুল। ঢাকা সফরের খবরও নিত্য বেশ ভালভাবেই বেরুতে লাগল। ঢাকা থেকে করাচী উড়ে যাবার পথে আবার দমদম আসবেন বলেও খবর ছাপা হল। এবার একটু বেলাতেই মিঃ আলির প্লেন দমদম এলো। দমদমের কিছু উৎসাহী লোকেরও জমায়েত হয়েছিল। 'প্রটেক্টেড্ এরিয়া' থেকে বেরিয়ে ভি-আই-পি রুমে যাচ্ছেন মিঃ আলি! পাশে ভীড়ের মধ্যে থেকে একটা আধা ময়লা হাফ্‌সার্ট পায়জামা পরা এক ছোকরা এগিয়ে এলো।

কাকা, কাকাবাবু, ছেলেটি ডাকল।

মিঃ আলি পিছন ফিরলেন। ছেলেটি সোজাসুজি সামনে এলো। চিনতে পারেননি। মিঃ আলি। ছেলেটিই উৎসাহী হয়ে নিজের কাকার নাম করল। বগুড়া বাসিন্দা। হৃদ্যতা ছিল এই দুজনের মধ্যে। ফেলে আসা দিনের বন্ধুর খোঁজখবর করলেন। জানলেন, বন্ধু এখন উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বাসিন্দা। ত্রুটি করলেন না সংসারের আরো পাঁচজনের কুশলবার্তা নিতে। ছেলেটিকে সস্নেহে কাছে টেনে

নিয়ে আদর করলেন। করাচীতে চিঠি লিখতেও বল্লেন। গদীর গুণে সারল্য বিসর্জন দেননি মহম্মদ আলি। দেখে সবাই খুশি।

দলবল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘরে ঢুকলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আতিথেয়তা রক্ষার জন্য। এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস হাতে নিয়ে সেই চেনা মোটা শোলার হ্যাট পরে ডিফেন্স সেক্রেটারি ইস্কান্দার মীর্জা বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেশ বিভাগের আগে থেকেই দেশরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদে বহাল ছিলেন মিঃ মীর্জা। লম্বা চওড়া চেহারা। মুখখানা বিশালকায়। স্যার আশুতোষকে রয়াল বেঙ্গল টাইগার বলা হত। মীর্জাকে বল্লেও অন্যায় বা অত্যুক্তি হবে না কোন দিক থেকেই! বারান্দার এককপাশে সরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সামান্য সময়ের জন্য আলাপ-আলোচনা করলাম। মুহুর্তের মধ্যে বুঝতে দেরী হল না, মিঃ মীর্জা একজন জাঁদরেল অফিসার। এঁর কাছে কেন জানি না মহম্মদ আলিকে যেন অসহায় মনে হল। পশুরাজ সিংহের সঙ্গে নেংটি ইঁদুরের খেলা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প আছে। আশঙ্কা হল ভবিষ্যতে পাকিস্তানের ইতিহাসে মীর্জা-আলি নিয়েও বোধ হয় এমনি গল্প আবার লেখা হবে।

আমাদের কৃষ্ণমেননের মতন স্বদেশী সাংবাদিক দেখলে ভ্রু কুঞ্চিত করেন না মিঃ আলি। 'প্রেস সাইনেসের' বালাই নেই মহম্মদ আলির। এবারও রিপোর্টারদের কাছে এক লম্বা-চওড়া বিবৃতি দিলেন আগের দিনের সুরে। নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম করে সুইস-মেড ছাতিটাকে স্পোর্টস্ স্টিকের মতন ঘুরাতে ঘুরাতে প্লেনের দিকে চল্লেন। সিঁড়ি দিয়ে দু'এক ধাপ উপরে উঠতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। আমরা সব কাছেই ছিলাম। আমাদের আগের দিনের আশঙ্কার মূলে কুঠারাঘাত করবার জন্য হাতের ছাতিটাকে দেখিয়ে বল্লেন:

'জেন্টলম্যান অফ্ দি প্রেস! নেভার মাইণ্ড, দিস ইজ নট অ্যান আমেরিকান রাইফেল, যাস্ট অ্যান অর্ডিনারি আমব্রেলা।'

উপস্থিত সকলের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে নিজে হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন মহম্মদ আলি।

উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার প্রায় মাঝখান দিয়ে করতোয়া নদী বয়ে গেছে। করতোয়ার পশ্চিমে শেলবর্ষ পরগণার কুন্দগ্রামের জমিদার ছিলেন নবাব আবদুল সোহবান চৌধুরী। নবাবনন্দিনী আলতাফান্নেসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নবাব আলি চৌধুরীর। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এককালে বাংলাদেশের মন্ত্রিত্ব করেছেন এই নবাব আলি চৌধুরী। এঁদেরই পুত্র হলেন মহম্মদ আলির পিতৃদেব নবাব-জাদা আলতাফ আলি চৌধুরী। এক ময়মনসিংহ দুহিতার সঙ্গে আলতাফ আলির প্রথম বিয়ে হয়। তাঁরই গর্ভের পাঁচটি পুত্রের প্রথমটি হলেন মহম্মদ আলি। আলতাফ আলি মহম্মদ আলির গর্ভধারিণীকে তালাক দিয়ে পরে সাগর পারের এক কটা সুন্দরীর পানিগ্রহণ করেন। পূর্বাতন আলতাফ বেগমও মালা জপ করে জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাননি। তিনিও এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে নিকায় বসেছিলেন এখন সে মহিলা ধরালোক ত্যাগ করেছিলেন। সাধারণভাবে ভদ্র বিনয়ী থাকলেও, আলতাফ আলি শনিবারের বারবেলায় বা রবিবারের প্রাক-গোধূলিতে খিদিরপুরের ঘোড় দৌড়ের মাঠের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে থাকতে পারেননি। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘোড়ার খুরের ধূলায় উড়িয়েছেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে হস্তান্তরের দলিলে দস্তখতের সাথে সাথে কলকাতার বহু বাড়ি চৌধুরী পরিবারের হাতছাড়া হয়েছে। 'স্লো হর্স অ্যাণ্ড ফাষ্ট উওমেনের' কৃপায় মৃত্যুকালে লক্ষাধিক টাকা দেনা রেখে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সম্ভবতঃ আরো পাঁচজন ধনীর মত সে অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। আলতাফ আলির ফিরিঙ্গি পত্নীর গর্ভের প্রথম সন্তান হলেন ওমর আলি। লেস বসানো জরি-আঁটা লক্ষ্ণৌ চিকনের পাঞ্জাবী পরে কানে আতর গুঁজে সন্ধ্যায় তানপুরা হাতে নিয়ে বসতেন ওমর আলি। পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিছুকাল। আরো পরে, নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ আলি যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তখন সুরাবর্দীর পক্ষে ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ প্রচার করে পাক-রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জন করেন।

মহম্মদ আলি করাচী থেকে দীর্ঘ পথ উড়ে নয়া দিল্লী এসেছিলেন।

আনন্দভবন-নন্দনকে দাদা বলে ডেকেছিলেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানী নরক সৃষ্টির এক ফয়সালা করার চেষ্টাও করেছিলেন। শুধু মুখের হাসি দিয়েই আবার করাচী উড়ে গিয়েছিলেন। কাজের কাজ কিছু হয়েছিল বলে মনে হয় না।

মহম্মদ আলির নিয়োগকালীন আশঙ্কার বুদবুদ শুধু মধুমাখা বিবৃতিতেই তিরোহিত হয়নি। পলাশীর আম্রকুঞ্জে যেমন একদিন ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল, মহম্মদ আলির প্রধানমন্ত্রীত্বকালেও তেমনি করাচীতে মার্কিনী আধিপত্যের বীজ বপন ও তাকে পল্লবিত করার দুর্নিবার প্রচেষ্টায় 'সিয়াটো' প্যাক্টে পাকিস্তান দস্তখত করেছিল। অনাগত ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা 'গান অ্যাণ্ড গোল্ডে'র দেশ আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের মৈত্রীকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, তা সবার অজ্ঞাত হলেও, মহম্মদ আলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। এঁরই রাজত্বকালে পাকিস্তানের উর্বরা ভূমিতে 'সিভিলিয়ান' পলিটিসিয়ানদের জন্ম হয়। খাকি পোশাক, মেজর জেনারেল উপাধি, মোটা শোলার হ্যাট আর ডিফেন্স সেক্রেটারি পদ ত্যাগ করে মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা পলিটিসিয়ানের তিলক পরে দেশ সেবার নামাবলী জড়িয়ে পূর্ব বাংলাকে সায়েস্তা করবার জন্য লাট সাহেব হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের অজুহাতে অতীতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতন গোলাম মহম্মদকে কায়েদী আজম পদে আসান দিতে হয়েছিল! মহম্মদ আলিও বেশী দিন সুখে কাল কাটাতে পারেননি। মীর্জার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য ও মুসলিম লীগের অন্তকলহ ঈশান কোণের মেঘের মতন মহম্মদ আলির সারা অন্তর নিত্য আশঙ্কিত করে তুলেছিল। পাকিস্তানী রাজনীতি সম্পর্কে আরো আশঙ্কাগুলির মতন এ আশঙ্কাও সহজে চলে যায়নি। মীর্জা গভর্নর-জেনারেল হলেন। মার্কিনী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মধুর বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হয়ে 'সিয়াটো' প্যাক্টের প্রিমিয়াম দিলেন। মহম্মদ আলি 'বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া'র মতন প্রথমা বেগমকে তালাক দিলেন। এক বিদেশিনীকে গাউন ছাড়িয়ে শাড়ি

পরিয়ে হৃদয় সঁপে দিলেন। জীবন যৌবন নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি। জীবনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘর বাড়িরও নতুন চেহারা সৃষ্টিতে মন দিলেন। সারা বাড়ি লাইমজুস কলারে ডিস্টেম্পার করা হল। ভিতরের লনে সুইমিং পুল তৈরি আরম্ভ হল। রাজমিস্ত্রীদের কাজ শেষ হতে না হতেই রাজত্বের পরিবর্তন ঘটলো। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিত্বের ধ্বজা আর একবার নড়ে উঠল। উড়ে এসে জুড়ে বসলেন সিভিলিয়ান চৌধুরী মহম্মদ আলি।

মহম্মদ আলি আবার পাক রাষ্ট্রদূত হয়ে ডালেস-তীর্থে ফিরে গেলেন।

পাকিস্তানের পরবর্তী কর্ণধার জেনারেল আয়ুব খান। পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতা রূপে তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। মহম্মদ আলি প্রধানমন্ত্রী হবার কিছুকাল পরেই (১৯৫৪) গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, সোরাবর্দীকে আইন মন্ত্রী ও জেনারেল আয়ুব খানকে দেশরক্ষা মন্ত্রী নিয়োগ করো। মহম্মদ আলি নিঃশব্দে সে হুকুম তামিল করলেন। তারপর একদিন (মার্চ ১৯৫৬) গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদকে হটিয়ে ইস্কান্দার মীর্জা তাঁর গদী দখল করলেন। দেড় বছরের মাথায় মীর্জাকে সরিয়ে স্বয়ং জেনালের আয়ুব খান নিজেই পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতা হলেন। আয়ুব খান দীর্ঘদিন পাকিস্তানের কর্ণধার ছিলেন এবং বার কয়েক এর দর্শন পেয়েছি। তবে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য মোলাকাত হয় ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি লণ্ডনে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকারী আমন্ত্রণে ভারত সরকার মনোনীত ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে আমি সে বছর সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করি। ঐ সফর শেষ করে প্রাগ ও জুরিখ ঘুরে আমি চলে যাই লণ্ডন কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্স

কভার করতে। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ও হ্যারল্ড উইলসন তখন ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন আয়ুব খান এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বোধকরি রাজনৈতিক কারণেই আয়ুব খান ও শাস্ত্রীজিকে ক্লারিজস্ হোটেলে রাখেন।

ঐতিহাসিক মার্লবোরো হাউসে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর স্বাগত ভাষণ দিয়ে এবং তার পর পরই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রেস রিসেপশন। এটাই ব্রিটিশ ট্রাডিশন। এই রিসেপশনে সাংবাদিকরা কমনওয়েলথ দেশগুলির প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি এবং তাঁদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সঙ্গে পরিচিত ও আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ পান।

মার্লবোরো হাউসের প্রাইভেট লনের প্রবেশ পথেই হ্যারল্ড উইলসন নিজে প্রত্যেক সাংবাদিককে এক একটি 'ড্রিঙ্কস' তুলে দিলেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে 'ড্রিঙ্ক' নিয়ে লনে প্রবেশ করার পর শাস্ত্রীজি আমাকে কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার মধ্যে একজন আয়ুব খান। ইস্কান্দার মীর্জার মত অহংকার বা মহম্মদ আলির মত চটুলতা লক্ষ্য করলাম না ওঁর মধ্যে। কথাবার্তা বলে মনেই হলো না উনি একজন সমরবিশারদ, বরং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ বলেই মনে হলো। অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবেই কথাবার্তা বললেন। মাঝে মাঝে একটু হাসেন। কিন্তু সব মিলিয়ে উনি সহজ সরল ও শান্তিকামী বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চান, ঠিক তা মনে হলো না। প্রতিদিন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় ক্লারিজস্ যাই শাস্ত্রীজির কাছে। ওঁর ব্যক্তিগত সচিব জগন্নাথ সহায় ও ভেঙ্কটরমনের কাছে নানা ব্যাপারে খোঁজখবর করি। মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা হয় আয়ুব খানের সঙ্গে। উনি ঠাট্টা করে বলেন, আমি প্রাইম মিনিস্টার শাস্ত্রীর সঙ্গে লড়াই করছি কিনা, তাই দেখতে এসেছেন ?

আমি হাসি।

উনি হেসে বলেন, ডু ইউ নো, উই হ্যাভ বিকাম ফ্রেণ্ডস !

পাকিস্তান রাষ্ট্রপতির এই বন্ধুত্বের দাম কি হতে পারে, তা জানি বলেই আমিও হেসে জবাব দিই, আই অ্যাম সো হ্যাপি টু নো ইট, ইওর একসেলেনসী!

এই ক্লারিজস্ হোটেলে পাকিস্তান হাই কমিশনের এক দল বাঙ্গালী কুটনীতিবিদ্ আয়ুব খানের জন্য ডিউটিতে ছিলেন এবং তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা হয়। ওঁরা মাঝে মাঝে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাঙ্গালী খানা খাইয়ে দিতেন এবং এঁদেরই কয়েক-জনের উদ্যোগে ও সাহায্যে আমি দিল্লী ফেরার পথে করাচী ঘুরে আসি। মজার কথা, পাকিস্তানের ঐ বাঙ্গালী কুটনীতিবিদ্দের সঙ্গে হৃদ্যতার ফলেই জন্ম নেয় আমার উপন্যাস 'ডিপ্লোম্যাট।' যাইহোক লণ্ডন থেকে দিল্লী ফেরার পথে দু'দিন করাচীতে কাটিয়েই বুঝেছিলাম, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আয়ুব খান পাকিস্তানের জনগণকে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করা শুরু করেছেন পুরোদমে। প্রতিটি সংবাদপত্র ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে। অনুমান করতে কষ্ট হলো না নেপথ্যে সামরিক প্রস্তুতি আরো কতদূর এগিয়েছে।

পাকিস্তানের এই সব যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনায়কদের অদূরদর্শিতার জন্যই জন্ম নেয় বাংলাদেশ। রঙের উপর রসান চড়িয়েছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ইতিহাসে সে এক অনন্য অধ্যায়।

বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে দিল্লীতে থাকি। বিকেলবেলায় কলকাতার বাংলা খবরের কাগজগুলো পড়তে পড়তে চোখের জল ফেলি মুজিব ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। ঘটনা ঘটে চলে বিদ্যুত গতিতে! ভারত-সোভিয়েট ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তি, নিক্সনের হুমকি, আণবিক অস্ত্রসজ্জিত মার্কিন সপ্তম নৌবহরের সন্দেহজনক গতিবিধি, জেনারেল ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর ছল-চাতুরি, ঢাকায় বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী নিধন। আরো কত কি! শেষ পর্যন্ত একদিন লেঃ জেনারেল

নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলেন লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে। তারপরও আরো কত কি! *একদিন আবার মুজিব ফিরে* এলেন ঢাকায় নবজাত রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে।....

দিল্লীতে বাংলাদেশের প্রথম হাই কমিশনার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (বর্তমানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব)। নিছক খবর বা সৌজন্যের জন্য ওঁর গ্রেটার কৈলাসের দপ্তরে যাই। পরবর্তী হাই কমিশনার হলেন ডক্টর এ. আর মল্লিক। ইতিহাসের যশস্বী অধ্যাপক ও কূটনীতিবিদ্ ডঃ মল্লিকের সঙ্গে খুবই হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমার বই বেরুতে না বেরুতেই উনি আর ভাবীজি পড়ে ফেলেন। ঢাকা থেকে আগত অতিথিদের পড়ান। একদিন উনিই আমার 'মেমসাহেব' ও 'ডিপ্লোম্যাট' পাঠিয়ে দিলেন শেখ সাহেবের কাছে।

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি মুজিব দিল্লী এলেন শ্রীমতী গান্ধীর আমন্ত্রণে। এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলাম। সন্ধ্যায় রিপোর্ট পাঠালাম।

পরের দিন সকালে এক বন্ধুর পরিবারের কয়েকজনের জন্য ভিসা নেবার ব্যাপারে ইরাক দূতাবাসে গেছি। হঠাৎ ঐ দূতাবাসেই আমার টেলিফোন এলো বাড়ি থেকে—রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ফোন এসেছে এখুনি মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। বাড়ি এসেই রাষ্ট্রপতি ভবনে ফোন করলাম শেখ সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে। হ্যাঁ, সত্যি আমাকে এখুনি মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। যে মানুষটির জন্য দিনের পর দিন চোখের জল ফেলেছি, যিনি লক্ষ-কোটি বাঙ্গালীর হৃদয়-সম্রাট, সেই মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলাম খানকয়েক বই হাতে নিয়ে। দীপ্তিও সঙ্গে চলল। বুঝলাম, মল্লিক সাহেব ও মেমসাহেব—ডিপ্লোম্যাটের জন্যই এই অভাবনীয় সৌভাগ্য সম্ভব হলো।

শেখ সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি বললেন, আপনার সময় পনের মিনিট বারোটা পঁয়তাল্লিশ থেকে একটা। ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইতিহাসের প্রবাদপুরুষের ঘরে ঢুকলাম। মল্লিক সাহেব

আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বই দিলাম। মহা খুশি। তারপর পাশে বসিয়ে বললেন, নিমাইবাবু, আপনি 'ডিপ্লোম্যাট' লিখে সাহিত্যিক হিসেবে একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি আপনার 'মেমসাহেব' আর 'ডিপ্লোম্যাট' পড়ে সত্যি মুগ্ধ।

আমি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানালাম।

উনি বললেন, যে বইগুলো দিলেন, তাও পড়ব তবে সময় লাগবে। এত কাজের চাপ যে পড়াশুনা করার সময় পাওয়াই মুস্কিল।

দীপ্তি মুগ্ধ হয়ে ওঁকে দেখে। আমিও বিশেষ কথা বলি না। উনি বলে যান, আমরা পলিটিসিয়ান। নানা কারণে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য কিন্তু আপনারা সাহিত্যিকরা, শিল্পীরা মুক্ত মনের মানুষ হন বলেই ইতিহাসের পাতা থেকে পলিটি-সিয়ানদের নাম মুছে গেলেও আপনাদের কেউ ভোলে না।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত ওঁর কথা শুনি।

এই যে বাংলাদেশ হলো, তা কী আমি না আওয়ামী লীগ জন্ম দিয়েছে? এর আসল জন্মদাতা কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিক আর একদল পাগল ছাত্র। ওরা সাহায্য না করলে কী আমরা ক'জন পলিটিসিয়ান দেশের মানুষকে এমনভাবে মরতে অনুপ্রাণিত করতে পারতাম?

উনি একটু থেমে বললেন, রবীন্দ্রনাথ কবে লিখেছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' আর কবে আমরা তার মর্ম উপলব্ধি করলাম?

আরো কত কথা বলার পর উনি আলতো করে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, নিমাইবাবু, ভাল করে লিখুন, সত্যি কথা লিখুন। আমরা পলিটিসিয়ানরা রাজনৈতিক কারণে চরিত্রহীন লম্পট অপদার্থ সিরাজদৌল্লাকে দেশপ্রেমিক বানিয়েছি। আমরা সত্যি কথা বলতে পারি না কিন্তু আপনাদের কী ভয়?

আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর উঠে দাঁড়ালাম। তবু কথা হয়।

তারপর উনি ডক্টর মল্লিককে বলেন, মল্লিক সাহেব, নিমাইবাবুকে তাড়াতাড়ি ঢাকা পাঠান।

ওঁকে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে বিমুগ্ধ মনে রাষ্ট্রপতি ভবনের দ্বারকা স্যুইটের ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

পূজা সংখ্যার লেখা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম বলে তখনই ঢাকা যেতে পারলাম না। গেলাম কয়েক মাস পরে ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির উৎসবে যোগ দিতে।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসান্স-এর অন্যতম জয়েন্ট সেক্রেটারি ও আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীনিবাসন হঠাৎ একদিন ফোন করে বলল, নিমাই, ইণ্ডিয়ান রাইটার্স ডেলিগেশনের মেম্বার হয়ে তোমাকে ঢাকা যেতে হবে।

আমি হেসে প্রশ্ন করি, হঠাৎ আমাকে যেতে হবে কেন?

শ্রীনিবাসনও হেসে জবাব দেয়, আমি তো ভাবতেই পারি না তুমি সাহিত্যিক হয়েছ এবং আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না, তোমাকে পাঠানো হোক। কিন্তু কী করব? ঢাকা থেকে বার বার টেলেক্স আসছে।

শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় সাহিত্যিক প্রতিনিধি দলের সব সদস্য পৌঁছবার তিন দিন পরে আমি ঢাকা পৌঁছলাম বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক রাত্রে শহীদ স্তম্ভে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে মাল্য অর্পণ করতে গেলাম আমি আর সুশীলদা (রায়)। ঐ অনুষ্ঠানে শহীদ স্তম্ভে প্রথম মাল্য অর্পণ করলেন মুজিব, তারপর বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালিকা নীলিমাদি (ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম) এবং তারপরই আমরা। সেখানে মুজিবকে দেখে চমকে উঠলাম! গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রনায়কের জন্য এত স্টেনগানধারী দেহরক্ষী! বুঝলাম দেশের মানুষকেই দেশনায়ক বোধহয় বিশ্বাস করেন না। মনে মনে হাসি আর ভাবি, এইসব দেশনায়করা কী মনে করেন ক'জন সঙ্গীনধারীই তাঁদের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য ভরসা? পৃথিবীর কোন দেশের

কোন রাষ্ট্রনায়ক শুধু সঙ্গীনধারীদের উপর নির্ভর করে চিরকাল গদী আঁকড়ে থাকতে পেরেছেন? কেউ না। ওঁরা কী ইতিহাসের এই সরল সত্যটিকেও ভুলে যান?

আমি সেই ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির মাঝরাতেই ঈশান কোণে প্রথম ঘন কালো মেঘের ইঙ্গিত পাই।